# শব্দতত্ত্ব

শ্রীরবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ
এম, এ ( প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার ) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক, মহারাজ-বীরবিক্রম-কলেজ ; আগরতলা, ত্রিপুরা ।



প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স—
৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ

১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

মূল্য —১৫৲

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

১। শব্দার্থতত্ত্ব ( পি, আর, এস্ থিসিস্ ) ৫৲

২। বেদ ও কোরানের সাদৃশ্য ১৲

৩। জাতিভেদ ১৲

৪। নিত্যপূজা কল্পদ্রুম ১৲

৫। Essentials of Sanskrit Grammar ( প্রকাশিতব্য )

মুদ্রক—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, দি নিউ প্রেস, ১ রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫।

প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স-এর পক্ষে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি-এ
৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺রাম রতন ভট্টাচার্য্য

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণোদ্দেশে—

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥

পিতঃ! ভুলি নাই সেদিনের কথা—যখন মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য কোথাও আমার থাকার সুবিধা হইল না। দরিদ্রের ছেলেকে সকল আত্মীয়ই সেদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অতি দরিদ্র আপনার পক্ষে আমাকে বোর্ডিং এ রাখিয়া পড়ানো কল্পনারও অতীত ছিল। সেদিন পড়া বন্ধ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া যখন আমি কাঁদিতেছিলাম, তখন আপনারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে আমার অন্তরে নূতন উৎসাহ সঞ্চারের জন্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামনীষিগণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপনি যে আমাকে সংস্কৃত পড়িবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

স্নেহময় পিতঃ! সেদিন হইতে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করিয়া আমি যে সংস্কৃতের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলাম এবং সর্ব্ববিধ সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলাম, সর্ব্বোপরি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম·এ পরীক্ষায় এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রতিযোগিতায়ও শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা আপনারই আশীর্ব্বাদের ফল।

আজও আপনার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে আমি এই গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিলাম। যদিও আমার কিশোর বয়সেই আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তথাপি আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ আমাকে ত্যাগ করে নাই। অতএব আশা করিব—দিব্যধামস্থিত আপনার অলৌকিক আশীর্ব্বাদে এবারও আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে।

আমার রচিত এই 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অঞ্জলি আপনারই শ্রীচরণের উদ্দেশে অর্পণ করিলাম। অধম পুত্রের এই ভক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করুন।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

সেবকাধম
রবীন্দ্র

# ভূমিকা

শব্দের তত্ত্ব বা শব্দ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বহুমুখী এবং বিরাট্। সাধারণ লোকের কাছে শব্দের এই সকল তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিলেও জিজ্ঞাসু গবেষকগণের নিকট ইহারা একেবারে অজ্ঞাত নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে শব্দের এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিভিন্ন প্রকার মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হই—খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-গর্ব্বিত মানব বিবিধ নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে, শব্দের যে স্বরূপ নির্ভুলভাবে অবগত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কোন কোন মনীষী কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং মনীষার বলে কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাহা জানিতে পারিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

শব্দ নিত্য না অনিত্য—এই সম্বন্ধেও ভারতের চিন্তারাজ্যে বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রের যুক্তি ও প্রমাণ-সমূহ বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বেদাদি শাস্ত্রে শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে; বাস্তব নিত্যতা বা সম্পূর্ণ অনিত্যতা নহে।

শব্দতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে স্ফোটবাদকে ছাড়িয়া যাওয়া চলে না; তাই বর্ত্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে স্ফোটবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। স্ফোটের স্বরূপ এবং বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, তাহাদের বিশ্লেষণ ক্রমে ঐ সকল মতের যথাসম্ভব সমন্বয়-সাধনের জন্যও চেষ্টা করিয়াছি। স্ফোটের বিভাগে যে কারণে আমি পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই, তাহাও যুক্তি এবং উদাহরণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে শব্দব্রহ্মবাদের আলোচনাকালে পূর্ব্বাচার্য্যগণের পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের সমন্বয়-সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, শব্দের সহিত অর্থের কি প্রকার সম্বন্ধ আছে, তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। এই বিষয়েও পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মতসমূহ বিদ্যমান। আমরা যথাসম্ভব ঐ সকল মতের আলোচনাক্রমে স্বকীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়—নাদতত্ত্ব। শব্দ, নাদ ও ধ্বনির পার্থক্য-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে ইহাদের প্রত্যেকের, বিশেষতঃ নাদের স্বরূপ নির্ণয়েই অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বস্তুতঃ নাদের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বিচারের বিষয় নহে; ইহারা অনুভূতির বিষয়। তথাপি বিচারের সাহায্যে তাহাদের আংশিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে অতঃপর সাধনাবলে নাদতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইবে—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এই দুরূহ নাদতত্ত্বসম্বন্ধেও কথা বলিতে সাহস করিয়াছি। পূর্ব্বাচার্য্যগণ নাদতত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহাদের যে সকল সাধনালব্ধ অনুভূতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অতি প্রয়োজনীয় অংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসু মানবের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা আংশিক পূরণে প্রয়াসী হইয়াছি।

সতর্কতা সত্ত্বেও বহিখানিতে কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষরগুলিও কোন কোন স্থলে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। স্থ এর সঙ্গে হ্রস্ব উকার এবং দীর্ঘ উকার যোগে যে দুইটি সংযুক্ত অক্ষর আছে, তাহাতে উকার এবং উকারের মধ্যে পার্থক্য এত অল্প যে প্রুফ দেখিবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই এই পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে না। অন্যান্য কোন কোন অক্ষরের ক্ষেত্রেও এইরূপ অসুবিধা বোধ করিয়াছি। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ এই সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ওঁ শিবমস্তু।

আশ্রব

গ্রন্থকার—

# শব্দতত্ত্ব

## সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

### উপক্রমণিকা—



### প্রথম অধ্যায়

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## তৃতীয় অধ্যায়

## চতুর্থ অধ্যায়

## পঞ্চম অধ্যায়

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# আলোচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নাম


**(ক) বেদ ও উপনিষৎ**

১। অথর্ব্ববেদ-সংহিতা
। ঐ সায়ণভাষ্য
৩। ঋগ্বেদ-সংহিতা
৪। ঐ সায়ণভাষ্য
৫। কঠোপনিষৎ
৬। কেনোপনিষৎ
৭। ছান্দোগ্যোপনিষৎ
৮। ঐ শাঙ্করভাষ্য
৯। জাবাল-দর্শনোপনিষৎ
১০। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ
১১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক
১২। " উপনিষৎ
১৩। " ব্রাহ্মণ
১৪। " সংহিতা
১৫। নাদবিন্দূপনিষৎ
১৬। ঐ—দীপিকা টীকা (নারায়ণকৃত)
১৭। নিরুক্ত (যাস্ক)
১৮। প্রশ্নোপনিষৎ
১৯। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
০। মুণ্ডক উপনিষৎ
১। মৈত্রায়ণী "
। যোগবিদ্যাশ্রুতি
৩। যোগশিখোপনিষৎ
৪। বরাহশ্রুতি
৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
২৬। ঐ—শাঙ্করভাষ্য
২৭। ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ
২৮। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

**(খ) স্মৃতি**

২৯। মনুসংহিতা
৩০। ঐ—কুল্লুকভট্ট-টীকা
৩১। ঐ—মেধাতিথি-টীকা
৩২। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা
৩৩। বৃহস্পতি-স্মৃতি

**(গ) পুরাণ ও ইতিহাস**

৩৪। কাশীখণ্ডম্
৩৫। ভাগবতম্
৩৬। ভারত-ভাবদীপঃ (মহাভারতের নীলকণ্ঠ টীকা)
৩৭। মহাভারতম্
৩৮। মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্
৩৯। রাজতরঙ্গিণী
৪০। রামায়ণম্
৪১। লিঙ্গ-পুরাণম্
৪২। বায়ু "
৪৩। বিষ্ণু "
৪৪। বৃহদ্ধর্ম্ম "
৪৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত "
৪৬। শিব "
৪৭। স্কন্দ "
৪৮। Arctic Home in the Vedas (By B. G. Tilak)

৪৯। Aryan Trail in Iran and India ( by N. N. Ghose )

### ( ঘ ) তন্ত্র

৫০। কামধেনু-তন্ত্র

৫১। কুব্জিকা ,,

৫২। কুলার্ণব ,,

৫৩। ক্রিয়াসার ,,

৫৪। গোরক্ষ সংহিতা

৫৫। জীবতত্ত্ববিবেক

৫৬। জ্ঞান-প্রদীপ

৫৭। নাদলীলামৃত

৫৮। নির্ব্বাণতন্ত্র

৫৯। পদার্থাদর্শ ( রাঘবভট্ট-কৃত সারদাতিলকের টীকা )

৬০। পরাত্রিংশিকা

৬১। ঐ টীকা (অভিনবগুপ্ত)

৬২। পরাত্রিংশিকা-তাৎপর্য্যদীপিকা

৬৩। প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্

৬৪। প্রপঞ্চসার

৬৫। প্রয়োগসার

৬৬। প্রাণতোষণী-তন্ত্র

৬৭। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

৬৮। ঐ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (জগন্মোহন তর্কালঙ্কার)

৬৯। মহার্থমঞ্জরী (মহেশ্বরানন্দ)

৭০। মৃগেন্দ্রাগম

৭১। ঐ টীকা (নারায়ণকণ্ঠ)

৭২। লয়যোগ-সংহিতা

৭৩। বরিবস্যা-রহস্যম্ (ভাস্কর রায়)

৭৪। বিজ্ঞান-ভৈরবম্

৭৫। ঐ —ক্ষেমেন্দ্র টীকা

৭৬। ঐ—বিবৃতি (শিবোপাধ্যায়)

৭৭। বিশ্বসার-তন্ত্র

৭৮। শাক্তবিজ্ঞানম্ ( সোমানন্দ )

৭৯। শিবদৃষ্টি ( সোমানন্দ নাথ )

৮০। ঐ—বৃত্তি ( উৎপল-দেব )

৮১। শিবসূত্র

৮২। শিবসংহিতা

৮৩। সারদা-তিলক

৮৪। সিদ্ধযোগ

### ( ঙ ) মীমাংসা দর্শন

৮৫। জৈমিনিসূত্র

৮৬। তন্ত্রবার্ত্তিক ( কুমারিল )

৮৭। ন্যায়রত্নাকর (পার্থসারথিমিশ্র)

৮৮। পরিমল ( টীকা )

৮৯। প্রভা (বৈদ্যনাথ শাস্ত্রীর টীকা)

৯০। বিধিবিবেক ( মণ্ডন মিশ্র )

৯১। ভামতী

৯২। মানকিরণাবলী

৯৩। মানমেয়োদয় (নারায়ণ পণ্ডিত)

৯৪। মীমাংসাদর্শন ( ইংরাজী অনুবাদ ; গঙ্গানাথ ঝা কৃত )

৯৫। ঐ (বঙ্গানুবাদ ভূতনাথসপ্ততীর্থ)

৯৬। মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক ( কুমারিল ভট্ট )

৯৭। শাবরভাষ্য

৯৮। শাস্ত্রদীপিকা (পার্থসারথিমিশ্র)

### ( চ ) ন্যায়দর্শন

৯৯। গৌতম-সূত্র

১০০। ঐ বাৎস্যায়ন-ভাষ্য
১০১। ঐ—তাৎপর্য্যটীকা (বাচস্পতি মিশ্র)
১০২। তর্কামৃতম্ (জগদীশ ভট্টাচার্য্য)
১০৩। ঐ—টীকা (রামচন্দ্র মিশ্র)
১০৪। তত্ত্ববিন্দু (বাচস্পতি মিশ্র)
১০৫। ন্যায়দর্শন ( মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ )
১০৬। ন্যায়প্রকাশিকা ( শ্রীজীবন কৃষ্ণ তর্কতীর্থ )
১০৭। ঐ—বঙ্গানুবাদ ( ঐ )
১০৮। ন্যায়প্রকাশিকা-বিবৃতি ( ঐ )
১০৯। ন্যায়মঞ্জরী ( জয়ন্ত ভট্ট )
১১০। ন্যায়লীলাবতী ( বল্লভাচার্য্য )
১১১। ন্যায়লীলাবতী-কণ্ঠাভরণম্ ( শঙ্কর মিশ্র )
১১২। পদার্থ-খণ্ডনম্ ( রঘুনাথ শিরোমণি )
১১৩। ভাষাপরিচ্ছেদ ( বিশ্বনাথ )
১১৪। মুক্তাবলী-সংগ্রহ (পঞ্চাননশাস্ত্রী)
১১৫। ঐ—বঙ্গানুবাদ ( ঐ )
১১৬। শক্তিবাদ ( গদাধর ভট্টাচার্য্য )
১১৭। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা (জগদীশ ভট্টাচার্য্য)
১১৮। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ( বিশ্বনাথ )

## (ছ) বৈশেষিক-দর্শন

১১৯। উপস্কার ( শঙ্করমিশ্র )
১২০। কণাদ সূত্র
১২১। ঐ—প্রশস্তপাদ-ভাষ্য
১২২। ঐ—ভাষ্যবিবরণম্ (দুণ্ডীরাজ)
১২৩। ন্যায়কন্দলী ( শ্রীধর ভট্ট )

## (জ) সাঙ্খ্যদর্শন

১২৪। অনিরুদ্ধ-বৃত্তি
১২৫। কপিল-সূত্র
১২৬। মাঠর-বৃত্তি
১২৭। যুক্তিদীপিকা (বাচস্পতি মিশ্র)
১২৮। সারবোধিনী ( সাঙ্খ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর টীকা )
১২৯। সাঙ্খ্যকারিকা ( ঈশ্বরকৃষ্ণ )
১৩০। সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী ( বাচস্পতি-মিশ্র )
১৩১। সাঙ্খ্যদর্শন ( কালীবর বেদান্ত বাগীশ )
১৩২। সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য (বিজ্ঞানভিক্ষু)

## (ঝ) বেদান্ত দর্শন

১৩৩। বেদান্তদর্শন (কালীবর বেদান্ত-বাগীশ )
১৩৪। ঐ (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির)
১৩৫। বেদান্ত-পরিভাষা
১৩৬। বেদান্তসার
১৩৭। বেদান্তসার-প্রকরণম্ (সদানন্দ)
১৩৮। বেদান্ত-সূত্র
১৩৯। ঐ—শাঙ্করভাষ্য
১৪০। ঐ—শ্রীভাষ্য ( রামানুজ )

## (ঞ) পাতঞ্জল-দর্শন

১৪১। পাতঞ্জল-দর্শন ( কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় )
১৪২। যোগসূত্র
১৪৩। ঐ—ব্যাসভাষ্য
১৪৪। ঐ—ভোজবৃত্তি

১৯৪। নাট্যশাস্ত্র-প্রদীপ

১৯৫। নিত্যপূজা-কল্পদ্রুম

১৯৬। ভট্টিকাব্যম্

১৯৭। ভাষার ইতিবৃত্ত (ডাঃ সুকুমার সেন)

১৯৮। রঘুবংশম্ ( কালিদাস )

১৯৯। বিশ্বকোষ

২০০। শব্দকল্পদ্রুম

২০১। শব্দার্থতত্ত্ব (বর্ত্তমান গ্রন্থকারের)

২০২। সঙ্গীত দামোদর

২০৩। সঙ্গীত রত্নাকর

২০৪। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ (মাধবাচার্য্য)

২০৫। সংগ্রহ ( প্রাচীন গ্রন্থ )

২০৬। হিউ-এন্-চাঙ্ ( সত্যেন্দ্র নাথ বসু )

২০৭। Gospel of St John

২০৮। Hand Book of Wireless Telegraphy (Admiralty)

২০৯। Introduction to the Atharvaveda (R. T. H. Griffith )

২১০। Loudness, Pitch, and Timber of Musical Tones and their Relation to the Intensity, the Frequency and the Overtone Structure ( Harvey Fletcher )

২১১। Radio-Engineering ( Frederick )

২১২। Role of Sanskrit in the Cultural Unification of India ( Dr. Satkari) Mookherjee )

২১৩। Speech and Hearing ( Harvey Fletcher )

২১৪। Swedenborg ( Frank Sewall )

২১৫। The Message ( ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র )

## ( গ ) অন্যান্য গ্রন্থকার

২১৬। আর, জি, ভাণ্ডারকর

২১৭। উপবর্ষ

২১৮। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১৯। গঙ্গাধর শাস্ত্রী

২২০। মঃ মঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

২২১। গোপীনাথ তর্কাচার্য্য

২২২। গোল্ডষ্টাকার (Goldstucker)

২২৩। জগদীশ চন্দ্র বসু

২২৪। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

২২৫। দয়াল মহারাজ

২২৬। মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ত-তীর্থ

২২৭। ধর্ম্মমেঘ আরণ্য

২২৮। নলিনীনাথ রায়

২২৯। যজ্ঞেশ্বর ঘোষ

২৩০। রাঘব ভট্ট

২৩১। বিন্ধ্যবাসী

২৩২। বোপদেব

২৩৩। ব্যাড়ি

২৩৪। স্ফোটায়ন

২৩৫। হরিহরানন্দ আরণ্য

২৩৬। Whitney

এবং আরও অনেক

# শব্দতত্ত্ব

## উপক্রমণিকা

ভারতীয় ঋষিগণের অতিসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা মানবের মননশীলতার প্রতিটি বিভাগে এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অলোকসামান্য প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতেই দিয়াছে এক অপূর্ব্ব রূপ ; তাহাকেই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে লোকাতীত মননশীলতা-দ্বারা। সাধারণ মানুষ যাহাতে কোন বৈচিত্র্য দেখিতে পান না, কবির সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি তাহার মধ্যেও নানাভঙ্গীতে নানাবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সাধারণ কবির চিন্তা অনেক সময়ে ভুল পথেও চলিয়া থাকে ; কিন্তু ঋষি কবির চিন্তা কখনও ভুল পথে চলে না ; বরং অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণসমূহদ্বারা সেই চিন্তার ফলসমূহকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে সূর্য্যালোকে পরিদৃশ্যমান বাস্তব দ্রব্যসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তোলে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এইভাবে যে চিন্তাধারা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও দর্শনসমূহের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, আজও তাহা তেমনি অব্যাহত গতিতেই প্রবাহিত হইতেছে।

ঋষি-কবির বৈশিষ্ট্য

আমরা প্রতিনিয়ত কত বিভিন্ন প্রকারের শব্দ শুনিতে পাই ; কিন্তু কয়জন মানুষ সেই শব্দের পশ্চাতে স্থিত বিপুল দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন ? আর্য্য ঋষিরা এই শব্দের স্বরূপ এবং তাহার অন্যান্য গুণাগুণ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিয়া তাঁহাদের চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তায় প্রবৃত্ত বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক বিভিন্নপ্রকার অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাহারও মতে বায়ুই শব্দরূপে পরিণত হয়। অন্যদের মতে শব্দ আকাশ-স্বরূপ। আবার অপরের মতে শব্দ উপাদান-রহিত নিত্য পদার্থ। কাহারও মতে শব্দ তরঙ্গময় এবং অন্যদের মতে তরঙ্গ-বিশেষ শব্দের বাহকমাত্র।

চিন্তার বিভিন্নতা

কেবল শব্দের স্বরূপ-সম্বন্ধেই নহে, তাহার অন্যান্য তত্ত্বসম্বন্ধেও আর্য্য ঋষিগণ গভীর গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন—একটি মানবশিশু বা পশুশাবক জন্মিয়াই কাঁদিতে থাকে। এই ক্রন্দনধ্বনি ও

সাধারণতঃ এক এক শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এক এক প্রকারই দেখা যায়। সকল মনুষ্যশিশুর ক্রন্দনই একপ্রকার। প্রত্যেক গোবৎস একই প্রকার শব্দ করে। অশ্বশাবকগুলির শব্দও সর্ব্বত্রই প্রায় একপ্রকার। অন্যান্য প্রাণীর বেলাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ঋষির অন্তরে প্রশ্ন জাগিল—এই ক্রন্দনের শব্দের আদিসৃষ্টি কখন? কোন্ মনুষ্যশিশু প্রথম ক্রন্দন করিয়াছিল? কোন্ পশু-শিশুই বা প্রথম ক্রন্দন করিল? সাক্ষী কেহ নাই; কাযেই এই বিষয়ে আদি-নির্ণয় অসম্ভব। বেদের ঋষি প্রশ্ন করিলেন—

চিন্তার গভীরতা

'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্?'* অর্থাৎ প্রথমজাত প্রাণীকে কে দেখিয়াছে? চক্ষুর্দ্বারা তো কেহ দেখে নাই। অনুমানের সাহায্যে জানিতে পারিলেও সেই জানা নির্ভুল নাও হইতে পারে। মিথ্যাজ্ঞান-সম্ভূত অনুমান অনেক সময়ে বহ্নিহীন পর্ব্বতাদিকেও বহ্নিমানরূপে প্রতীয়মান করে। কাযেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে।

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল—মনুষ্য, গো, অশ্ব, বৃক্ষ, জল, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে বুঝায়, তাহার কারণ কি? সাধারণতঃ কোন জ্ঞানী লোকের মুখের কথা শুনিয়াই শিশুরা ঐ সকল শব্দ ও তাহাদের অর্থ অবগত হইয়া থাকে; কিন্তু, সর্ব্বপ্রথম কে ঐ সকল শব্দ ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিলেন এবং কেনই বা করিলেন? এই বিষয়েও সাক্ষী কেহ নাই; কাযেই নিঃসন্দেহে কিছু বলা শক্ত।

দুইটি দ্রব্যের সংযোগ অথবা বিভাগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সংযোগ ও বিভাগের আদি সৃষ্টি কখন—ইহার কোন প্রমাণ নাই।

এইভাবে চিন্তা করিয়া আর্য্য ঋষিগণ স্থির করিলেন যে, সকল শব্দই অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ, যদিও বা ইহাদের কোন আদি থাকে, তথাপি তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই কারণে আর্য্য ঋষিগণ ইহাকে ব্যাবহারিক অনাদি হিসাবে গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল—শব্দের অনাদিত্ব না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু ইহা (শব্দ) কি বিনষ্ট হয় না? যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও থাকিতে দেখা যায়। যে উৎপন্ন হয়, সেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহার বিনাশ কি সম্ভব? ঋষিদের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এই জটিল প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়া দিল। তাঁহারা স্থির করিলেন—শব্দের

*ঋগ্বেদ-সংহিতা ॥১।১৬৪।৪॥

বিনাশও নাই। যে যুক্তিতে শব্দের ব্যাবহারিক অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেই যুক্তিতেই তাহার ব্যাবহারিক অবিনাশিভাবও স্বীকৃত হইল। অর্থাৎ রাম, শ্যাম, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি শব্দ অনাদিকাল হইতে যেমন একই ভাবে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে, তেমনি অনন্তকাল তাহারা একই ভাবে উচ্চারিত হইতে থাকিবে।

কখন আর কেহ রাম, বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিবে না?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—যখন আর ঐ সকল শব্দ উচ্চারণ করিবার মত কোন মানুষ থাকিবে না। কিন্তু সেই দিন কখন আসিবে, তাহা কি কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন? প্রলয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বা প্রমাণ কি? আর একই সঙ্গে সমুদয় জগৎই বা ধ্বংস হইবে কেন? এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ উঠিয়া গেলেও অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তো তাহারা থাকিতে পারে?

কেবল মনুষ্যের উচ্চারিত শব্দের বেলাই নহে; ইতর প্রাণীর উচ্চারিত কিংবা জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত শব্দ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। যেদিন সর্ব্বপ্রথম বিড়াল জন্ম লাভ করিয়াছিল, সেইদিনও সে 'ম্যাও' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষ বিড়ালটিও এইরূপ শব্দই উচ্চারণ করিবে। গরু প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীর বেলাও এই নিয়ম। কিন্তু আদি বিড়াল বা আদি গরুর সৃষ্টি-কালের কোন সাক্ষী নাই এবং শেষ বিড়াল বা শেষ গরুর অন্তিম সময় কখন ঘটিবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। অতএব, যদিও 'ম্যাও' 'হাম্বা' প্রভৃতি শব্দের আদি এবং অন্ত থাকে, তথাপি, তাহার সময় নির্ণয়ে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ নাই। জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত মেঘগর্জ্জন প্রভৃতি শব্দের আদি-অন্তও নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আর্য্য ঋষিগণ শব্দ মাত্রেরই ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতা

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বাস্তব পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা আশ্রয় দেখা যায়। শব্দ যদি বাস্তব পদার্থ হয়, তাহা হইলে শব্দেরও আশ্রয় একটা কিছু অবশ্যই থাকিবে। শব্দ আমরা প্রত্যহ কাণে শুনি এবং শব্দদ্বারা অর্থ বুঝিয়া থাকি। যে কোন মানসিক ভাব বুঝাইবার জন্য মানুষ শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং শব্দকে বাস্তব পদার্থ বলিয়াই বা স্বীকার করা না হইবে কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া ঋষিগণ শব্দের একটা

শব্দের আশ্রয়

আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। নানাদিক্ বিচার। করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন—আকাশই শব্দের আশ্রয়।

আকাশ তো সর্ব্বব্যাপী; তবে কি শব্দও সর্ব্বব্যাপী? শব্দ সর্ব্বব্যাপী হইলে সকল সময়ে সকল শব্দ শোনা যায় না কেন? আর শব্দ যদি সর্ব্বব্যাপী না হয়, তাহা হইলে যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার শব্দের উচ্চারণই বা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন—শব্দ সূক্ষ্মভাবে আকাশে অবস্থান করে। কিন্তু আকাশে হস্ত-সঞ্চালনাদিদ্বারা তো শব্দের উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শব্দের উচ্চারণে দুইটি পদার্থের সংযোগ বা বিভাগ আবশ্যক। আমরা যখন কথা বলি, তখন আমাদের জিহ্বা, তালু প্রভৃতির সংযোগ ও বিভাগ হইতে থাকে। দুইটি পদার্থের, সঙ্ঘর্ষণে শব্দ উৎপন্ন হয়; আবার গাছের ডাল ভাঙ্গিলেও শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিলেন—শব্দকে সংযোগজ বা বিভাগজ বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া 'শব্দজ শব্দ' হিসাবে শব্দের আর একটি অবস্থাও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন।

শব্দের বিভিন্নতা

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল—শব্দ যদি আকাশাশ্রিতই হইবে, তাহা হইলে, অনেক সময়ে জিহ্বা, তালু প্রভৃতির স্পর্শ সত্ত্বেও শব্দ শোনা যায় না কেন? আর মনুষ্যাদির মুখ হইতেই বা সে বাহির হয় কি করিয়া? ঋষিগণের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এই সংশয়ের ও সমাধান করিয়া দিল। তাঁহারা স্থির করিলেন—আকাশাশ্রিত সূক্ষ্ম শব্দকে শ্রবণযোগ্য করিতে হইলে, সংযোগ অথবা বিভাগ আবশ্যক। মানুষের উচ্চারিত শব্দের ক্ষেত্রে উহার উচ্চারণের জন্য উচ্চারণকারীর ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। কোন একটা বস্তু বা ভাব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলেই দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম শব্দ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া সেই ব্যক্তির বদনপথে নির্গত হইয়া অপরের শ্রুতিগোচর হয়। মনুষ্যাদির মুখ হইতে উচ্চারিত শব্দের উচ্চারণেই এই নিয়ম খাটে। মানুষ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ বা বিভাগের দ্বারা যে সকল শব্দ সৃষ্টি করে, তাহা কিন্তু তাহার উচ্চারণ নহে।

উচ্চারণের হেতু

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের গভীর চিন্তার ফলে, শব্দ তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট ব্রহ্ম-রূপেও প্রতিভাত হইয়াছিল। অনেকে উপাদান-রহিত, নিত্য, সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের যাবতীয় গুণ

শব্দব্রহ্ম

শব্দে আরোপিত করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত কোন কোন ঋষিকর্ত্তৃক স্ফোটবাদ নামে একটি নূতন চিন্তাধারাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

স্ফোট

কাহারও কাহারও মতে শব্দ এবং অর্থ অভিন্ন। অন্যদের মতে ইহারা অভিন্ন নহে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কোন কোন ঋষি আবার শব্দ, অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধেরও নিত্যতা কল্পনা করিয়াছেন।

সম্বন্ধবাদ

ভারতীয় ঋষিগণ নাদ, শব্দ, ধ্বনি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উচ্চারিত শব্দ সমূহকে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ এই নাদ, শব্দ এবং ধ্বনিকে পৃথক্ পৃথগ্ ভাবেও কল্পনা করিয়াছেন।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উপায়ে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, আকাশে উৎপন্ন তরঙ্গ-বিশেষই শব্দ। এই তরঙ্গ কর্ণ-শষ্কুলিতে আহত হইলেই আমাদের শব্দের শ্রবণ হয়। উক্ত তত্ত্ব অবগত হওয়ার ফলে আধুনিক জড়-বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ গ্রামোফোন প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে শব্দ-বিশেষকে ধরিয়া রাখিয়া পরে নিজের ইচ্ছামত পুনরায় উহার প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই তত্ত্ব অবগত হওয়ার ফলেই বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে দূরদেশে শব্দ প্রেরণ এবং মাইক বা শব্দ-সম্প্রসারণ-যন্ত্রের সাহায্যে মৃদু শব্দকে উচ্চ করা সম্ভব হইতেছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতাভিমানী বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে যে তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন কোন কোন ভারতীয় ঋষি এইরূপ তত্ত্বই উপলব্ধির সাহায্যে জানিতে পারিয়া বিভিন্ন যুক্তি-সহায়ে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ শব্দের ধারণ, সম্প্রসারণ, উচ্চীকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রাচীন-ভারতীয় ঋষিগণের আবিষ্কারের একটি বৃহত্তর সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি চিন্তাধারা সম্বন্ধেই বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হইবে। ইহা হইতে পাঠকগণ আর্য্য ঋষিদের লোকাতীত মননশীলতার পরিচয় পাইবেন।

# প্রথম অধ্যায়

## শব্দের স্বরূপ

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে শব্দতত্ত্ব ও শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ অথর্ব্ববেদ-সংহিতার ৭।১।১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শব্দ-উচ্চারণে প্রবৃত্ত মানুষের প্রথমে হয় উচ্চারণের ইচ্ছা; সেই ইচ্ছা হইতে হয় প্রযত্নের উৎপত্তি; উক্ত প্রযত্ন হইতে মূলাধারে প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দ জন্মে এবং এইরূপ পরিস্পন্দের ফলেই মূলাধারে সূক্ষ্মা পরা বাকের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় (১)। অথর্ব্ববেদভাষ্যে আচার্য্য সায়ণ এই ভাবেই উল্লিখিত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন—শব্দতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় চিন্তা কত প্রাচীন!

অথর্ব্ববেদের মত

সাধারণতঃ ঋগ্বেদকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা হইয়া থাকে; অথচ আমরা অথর্ব্ববেদকে প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিলাম—এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

ঋগ্বেদের নানা স্থানে পূর্ব্বাচার্য্য বা পিতৃপুরুষ হিসাবে অথর্ব্ববেদ-প্রবক্তা অথর্ব্বা ঋষির উল্লেখ দেখা যায় (২)। তাহা ছাড়া মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমেই লিখিত আছে—"দেবতাদের মধ্যে সকলের আদিতে ছিলেন ব্রহ্মা, তিনিই সমগ্র বিশ্বের পোষক ও রক্ষক' উক্ত ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা প্রাচীনকালে অথর্ব্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন, অথর্ব্বা তাহা অঙ্গিরা ঋষির নিকট বলিয়াছিলেন। অঙ্গিরা সত্যবাহ ভারদ্বাজের নিকট এবং ভারদ্বাজ অঙ্গিরার শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের নিকট এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ

অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্ব

---

(১) ধীতী বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেঽবদন্নৃতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েনামন্বত নাম ধেনোঃ ॥
—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা ৭।১।১ ॥

(২) ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥
— ঋগ্বেদ ৬।১৬।১৩

দেন" (৩)। এখানে পরিষ্কার ভাষায়ই অথর্ব্বাকে আদি-ব্রহ্মবিদ্যা প্রবক্তারূপে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য বেদেও অথর্ব্ববেদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মহামনীষীও বেদের বাক্যসমূহ উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিবার সময়ে প্রথমেই অথর্ব্ববেদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (৪)। যদিও কোন কোন ব্যাখ্যাকার উল্লিখিত উদাহরণ-প্রদর্শনে মহাভাষ্যকারের অন্যপ্রকার অভিপ্রায় কল্পনা করিয়াছেন; তথাপি আমাদের মনে হয়, অথর্ব্ববেদের প্রাচীনতমত্বের জন্যই মহাভাষ্যকার কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম তাহার বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহাত্মা ভর্ত্তৃহরি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। উক্ত মহাত্মাও তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে চারিবেদের নামোল্লেখের সময়ে প্রথমেই অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৫)। ইহা হইতে বুঝা যায়, ভর্ত্তৃহরিও অথর্ব্ববেদকেই প্রাচীনতম বেদ বলিয়া মনে করিতেন।

কাশ্মীরপ্রদেশীয় মহামনীষী জয়ন্তভট্ট খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—বেদ-সমূহের মধ্যে অথর্ব্ব বেদই সর্ব্বপ্রথম (প্রাচীনতম) (৬)।

---

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা, অথর্ব্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥ —ঋগ্বেদ ১০৷১৪৷৬॥

(৩) ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যং প্রাবদত ব্রহ্মা, অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরসে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ, ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রথম মুণ্ডক॥

(৪) বৈদিকাঃ খল্বপি। শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে। ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা। অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। অগ্ন আয়াহি বীতয় ইতি। —পস্পশা।

(৫) অথর্ব্বণামাঙ্গিরসাং সাম্নামৃগ্‌যজুষস্য চ।
যস্মিন্নুচ্চাবচা বর্ণাঃ পৃথক্‌স্থিতপরিগ্রহাঃ॥ —বাক্যপদীয়ম্। ব্রহ্মকাণ্ড। ২১ শ্লোক।

(৬) তচ্চ চতুর্দ্দশবিধং যানি বিদ্বাংসশ্চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানান্যাচক্ষতে। তত্র বেদাশ্চত্বারঃ। প্রথমোঽথর্ব্ববেদঃ, দ্বিতীয়ঃ ঋগ্বেদঃ, তৃতীয়ো যজুর্ব্বেদঃ, চতুর্থঃ সামবেদঃ।
—ন্যায়মঞ্জরী (চৌখাম্বা) প্রমাণ প্রকরণ। পৃষ্ঠা-২

বিশ্বকোষ অভিধানেও অথর্ব্বা ঋষির প্রাচীনতমত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। অথর্ব্বন্ শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তথায় বলা হইয়াছে—"ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, অথর্ব্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এবং আর্য্যদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করেন।"

অথর্ব্ব বা অথর্ব্বন্ শব্দের অর্থ "অতি প্রাচীন"। বার্দ্ধক্যবশতঃ কোন ব্যক্তি যখন চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়েন, তখন আমরা বলি—তিনি একেবারে অথর্ব্ব হইয়া গিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের এই অর্থদ্বারাও তাহার প্রাচীনতমত্বই প্রমাণিত হয়।

নিরুক্তকার যাস্ক অথর্ব্ব শব্দের যে ব্যুৎপত্ত্যর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদ্বারাও উক্ত শব্দের চলচ্ছক্তিহীনরূপ অর্থই স্বীকৃত হইয়াছে (৭)।

ইউরোপীয় মনীষিগণের মধ্যেও অনেকে অথর্ব্ববেদের অন্ততঃ অংশ-বিশেষকে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রখ্যাত মনীষী R. T. H. Griffith তাঁহার অথর্ব্ববেদের ভূমিকায় উক্ত বেদের অংশবিশেষের প্রাচীনতমত্ব স্বীকার করিয়া ইহার সমর্থনে অন্যান্য মনীষিগণের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮)।

অধ্যাপক Whitney অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষকে অর্ব্বাচীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ইহার মৌলিক অংশ যে ঋগ্বেদ-প্রণয়নের সময় বিদ্যমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন (৯)।

অথর্ব্ববেদের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে হয় তো কিছু অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এই কারণে সমগ্র অথর্ব্ববেদখানিকেই অর্ব্বাচীন বলা কিছুতেই সমীচীন নহে। অথর্ব্ববেদের যে সকল মন্ত্র প্রাচীনতম পদ্ধতিতে রচিত,

---

(৭) থর্ব্বতিরত্র গতিকর্ম্মা। ন থর্ব্বতি ন চলতীতি অথর্ব্বঃ। —নিরুক্তম্।

(৮) Introduction to the Atharvaveda—R. T. H Griffith.

(৯) The greater portion of the hymns are plainly shown both by their language and internal character, to be of much later date, than the general contents of the other historical veda·········however would not imply that the main body of the compilation of the Atharva hymns were not already in existence, when the compilation of the Rik took place.

—Griffith এর ভূমিকায় ধৃত।

তাহাদের প্রাচীনতমত্ব স্বীকার করাই আমরা সর্ব্বথা সঙ্গত মনে করি (১০)।

ঋগ্বেদ সংহিতাতে শব্দের চারিটি অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত চারিটি অবস্থার মধ্যে তিনটি অবস্থাকে সূক্ষ্মরূপে এবং একটিকে স্থূলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটিকে মানুষ প্রকাশ করিতে পারে না; কেবলমাত্র চতুর্থ স্থূল অবস্থাটি মানুষের উচ্চারণদ্বারা প্রকাশিত হয় (১১)। ঋগ্বেদোক্ত এই সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটিকে পরবর্ত্তীকালের আচার্য্যগণ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম ভেদে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা পরে করিব।

ঋগ্বেদ

ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের সূত্রগুলিও অতি প্রাচীন। এই সকল অতিপ্রাচীন সূত্রে এবং মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। মীমাংসাদর্শনে শব্দের নিত্যতা এবং ন্যায়দর্শনে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্যই নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে; এবং কেবলমাত্র এই প্রসঙ্গে শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক, ততটুকুমাত্র বলিয়াই সূত্রকারগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনে শব্দের ধ্বনি-স্বরূপতাই স্বীকৃত হইয়াছে।

ন্যায় ও মীমাংসা

সাঙ্খ্যদর্শনের ৫।৫৭ সূত্রে স্ফোটাত্মক শব্দের উল্লেখ ক্রমে শব্দের স্ফোটস্বরূপ অস্বীকার করা হইয়াছে (১২)। উক্ত গ্রন্থেরই ৫।৫৮ সূত্রে সূত্রকার শব্দনিত্যতার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন

সাঙ্খ্য

---

(১০) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য প্রবাসী পত্রিকায় ( অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ) মৎপ্রণীত "আদি বেদ কোন্‌টি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১১) চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি, তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥

—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৫ ॥

বাক্ বাচঃ কৃৎস্নায়াঃ পদানি চত্বারি পরিমিতা পরিমিতানি। লোকে যা বাগস্তি সা চতুর্ব্বিধা বিভক্তেত্যর্থঃ। তেষাং মধ্যে ত্রীণি গুহা গুহায়াং নিহিতা স্থাপিতানি, নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে ন প্রকাশন্তে ইত্যর্থঃ। বাচঃ তুরীয়ং পদং মনুষ্যা অজ্ঞাস্তজ্জ্ঞাশ্চ বদন্তি ব্যক্তমুচ্চারয়ন্তি ব্যবহরন্তি। —ঐ, সায়ণভাষ্য।

(১২) প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ। —সাংখ্যদর্শন ৫।৫৭ ॥

করিয়াছেন (১৩)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাঙ্খ্যসূত্র প্রণয়নের সময়েও শব্দতত্ত্ব এবং স্ফোটবাদ সম্বন্ধে অন্ততঃ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত প্রচলিত ছিল। মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। তিনি আদিরাজ মনুর দৌহিত্র ছিলেন। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনের প্রবর্ত্তকগণ সকলেই কপিলের পরবর্ত্তী। তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত সাঙ্খ্যসূত্র মহর্ষি কপিলের রচিত কি না, এই সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অনেকে ইহাকে পরবর্ত্তী কালের রচনা মনে করেন। এই কারণেই আমরা ন্যায় ও বৈশেষিক মতের উল্লেখের পর সাঙ্খ্যমতের উল্লেখ করিলাম।

বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনিরও আবির্ভাবের বহু পূর্বে মহর্ষি স্ফোটায়ন 'স্ফোটবাদ' সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য্য নাগেশের রচিত 'স্ফোটবাদ' নামক গ্রন্থ হইতে আমরা এই সংবাদ জানিতে পারি (১৪)।

স্ফোটায়ন

স্ফোটায়ন ঋষির রচিত উক্ত পুস্তকখানা এখন আর পাওয়া যায় না। নাগেশ ভট্টের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ঋষি স্ফোটায়ন তাঁহার গ্রন্থে শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র স্ফোটের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আলোচনাই করিয়াছিলেন।

ঋষি স্ফোটায়ন যে পাণিনিরও বহু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, পাণিনি-প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের "অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" (৬।১।১২৩) সূত্রটিই তাহার প্রমাণ। এই সূত্রে পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবে স্ফোটায়নের নামোল্লেখ করায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাণিনির সময়ে ব্যাকরণশাস্ত্রে স্ফোটায়নের মত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ কোন গ্রন্থকারের দেহত্যাগের বহু পরেই তাঁহার মত প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঋষি স্ফোটায়নের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আর যাহা কিছুই বলা হউক না কেন, তিনি যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

শব্দের স্বরূপ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা যে সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আমাদের জানামতে মহর্ষি উপবর্ষের রচিত গ্রন্থই তন্মধ্যে প্রাচীনতম।

---

(১৩) ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতা-প্রতীতেঃ। ঐ ৫।৫৮॥

(১৪) বৈয়াকরণ-নাগেশঃ স্ফোটায়ন-ঋষের্মতম্।
পরিষ্কৃত্যোক্তবাংস্তেন প্রীয়তাং জগদীশ্বরঃ॥

—স্ফোটবাদঃ (আড্যার লাইব্রেরী)। পৃষ্ঠা—১০২

উপবর্ষ

উপবর্ষ সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনির গুরু বর্ষের ভ্রাতা ছিলেন। কেহ কেহ উপবর্ষকেও পাণিনির গুরু মনে করেন। উপবর্ষ পাণিনির গুরু বা গুরুভ্রাতা যাহাই হউন না কেন, তিনি যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এই সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই।

পাণিনির সময়

পাণিনির সময় সম্বন্ধে যদিও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে, তথাপি কেহই তাঁহাকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিতে পারেন নাই। আর, জি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ভারতীয় এবং গোল্ডষ্টাকার (Goldstucker) প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণের মতে পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের মতে, পাণিনিকে কিছুতেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ-শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলা চলে না (১৫)। আমাদের মনে হয়, পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন; তবে এই সম্বন্ধে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

উপবর্ষের গ্রন্থ

মহর্ষি উপবর্ষ মীমাংসা প্রভৃতি কয়েকখানা দর্শনশাস্ত্রেরও বিস্তৃত টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসার ব্যাখ্যাগ্রন্থ দুইখানাই সমধিক প্রসিদ্ধ। উপবর্ষের রচিত গ্রন্থগুলিও এখন আর পাওয়া যায় না। শব্দের স্বরূপ-সংক্রান্ত আলোচনাকালে মহাত্মা শবরস্বামী তাঁহার মীমাংসা-ভাষ্যে এবং আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যে প্রমাণ হিসাবে উপবর্ষের মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপবর্ষের মত

উপবর্ষের মতে বর্ণগুলিই শব্দ (১৬)। 'গৌঃ' পদটি উচ্চারণ করিবার সময়ে প্রথমে 'গ' এই বর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহার পর 'ঔ' এবং অতঃপর বিসর্গের (ঃ) উচ্চারণ হইয়া থাকে। এই কারণে মহাত্মা উপবর্ষ 'গ' প্রভৃতি বর্ণগুলিকেই শব্দ নামে অভিহিত করেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, কর্ণ যাহা গ্রহণ করে, তাহাই শব্দ। 'গৌঃ' বলিতে 'গ' প্রভৃতি বর্ণগুলিকেই কর্ণ গ্রহণ করে বলিয়া তিনি মনে করেন।

(১৫) The Role of Sanskrit in the Cultural Unification of India. by. Dr. Satkari Mookherjee M. A. Ph. D. (Page—3)

(১৬) বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ।—শাঙ্করভাষ্য (বেদান্তসূত্র ১।৩।২৮।)

গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবানুপবর্ষঃ।—শাবর ভাষ্য (মীমাংসাসূত্র ১।১।৫)

প্রাচীনকালের মীমাংসক এবং বৈদান্তিকগণও উপবর্ষের এই মতটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট বলিয়া কিছুই নাই। শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্যে এবং আচার্য্য শঙ্করের বেদান্তভাষ্যে স্পষ্টই এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় ও তাঁহার সম্পাদিত 'মীমাংসাদর্শন' নামক বঙ্গভাষীয় গ্রন্থে উপবর্ষ, মীমাংসক এবং আচার্য্য শঙ্করের উল্লিখিত মতের কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।(১)

**মীমাংসা ও বেদান্তের মত**

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার রচিত পাণিনির মহাভাষ্যে শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি এই সম্বন্ধে নানাবিধ সংশয়ের উল্লেখক্রমে ঐগুলি খণ্ডন করিয়া শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন কোন ব্যক্তি যখন 'গৌঃ' এইরূপ একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে, তখন আমরা শব্দ বলিতে কি বুঝি? ইহার উত্তরস্বরূপে প্রথমে ক্রমশঃ চারিটি পক্ষের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত চারিটি উত্তরের মধ্যে একটিও ঠিক নহে। উক্ত চারিটি উত্তর; যথা—

**পতঞ্জলির মত**

(ক) সাস্না(গলকম্বল), লাঙ্গুল, ককুদ, খুর, শৃঙ্গ প্রভৃতিযুক্ত জন্তুটিই শব্দ।

(খ) উক্ত জন্তুর ইঙ্গিত, চলাফেরা, নিমেষ প্রভৃতিই শব্দ।

(গ) উক্ত জন্তুর মধ্যে শুক্ল, নীল, কপিল প্রভৃতি বর্ণ দেখা যায়, তাহাই শব্দ।

(ঘ) গোজাতীয় একটি বিশেষ জন্তু চলিলে, ফিরিলে বা তাহার কোনরূপ আওয়াজ দিইলে বলিলেও যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই শব্দ।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন উক্ত উত্তর চারিটির মধ্যে প্রথমটিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা গোব্যক্তিরূপ দ্রব্যবিশেষকে বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় উত্তরের দ্বারা যাহা বুঝানো হইয়াছে, তাহা ক্রিয়া। এইরূপে তৃতীয় উত্তরের দ্বারা গুণ এবং চতুর্থ উত্তরের দ্বারা জাতিকে বুঝানো হইয়াছে।

(১) মীমাংসাদর্শন (বঙ্গানুবাদসংবলিত) প্রস্তাবনা, পৃষ্ঠা [illegible]

'কৈশ্চিৎ' প্রভৃতি বহুবচনযুক্ত পদসমূহ ব্যবহার করিয়া ভর্ত্তৃহরি জানাইয়াছেন যে, এইরূপ সমালোচকের সংখ্যা অল্প নহে। সুতরাং ভর্ত্তৃহরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য ছাড়াও শব্দতত্ত্ব এবং স্ফোটবাদ সম্বন্ধে আরও বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউ-এন-চাঙ্' (২২) খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এদেশ হইতে শব্দবিদ্যাশাস্ত্রের ১৩ খানা গ্রন্থও স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে (২৩)। যদিও এই ১৩ খানা গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানিতে পারি নাই, তথাপি অনুমান করা যাইতে পারে যে, আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি শব্দতত্ত্ব ও স্ফোটবাদ সম্বন্ধে যে সকল পূর্ব্বাচার্য্যের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত কোন কোন গ্রন্থ চৈনিক পরিব্রাজক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

শব্দবিদ্যার প্রাচীন গ্রন্থ

হিউ-এন-চাঙ্ যদি মূল গ্রন্থগুলি না নিয়া তাহাদের প্রতিলিপি নিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পরবর্ত্তী যুগে মুসলমান শাসকগণকর্ত্তৃক ঐ সকল মূল গ্রন্থ বিনষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের ধ্বংস সাধনে মুসলমান শাসকগণ যেরূপ বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণী নামক ইতিহাস গ্রন্থ হইতে আমরা তাহার বিবরণ জানিতে পারি। যদি সৌভাগ্যবশতঃ কখনও চীনদেশ বা ভারতের যে কোন স্থান হইতে ঐসকল গ্রন্থের পুনঃপ্রচার হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় হইবে।

যাঁহারা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণের স্মৃতি-সংবলিত চরম-বর্ণোচ্চারণকে স্ফোটনামে অভিহিত করিয়া স্ফোটবাদী নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে শব্দের স্বরূপ-সম্বন্ধে উপবর্ষের উল্লিখিত মত ঠিক নহে; কারণ, 'গৌঃ' পদ উচ্চারণের সময়ে একই সঙ্গে

স্ফোটবাদীদের মত

---

(২২) এই চৈনিক পরিব্রাজকের নামটি নানাভাবে বানান করা হইয়া থাকে, কেহ কেহ 'হিউ এনথ সাঙ্' কেহ বা 'ইউ এন চোয়াঙ্' এইরূপ বানান এবং উচ্চারণ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বসু তাঁহার 'হিউ এন চাঙ্' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে বানান এবং উচ্চারণের বিশুদ্ধতার কথা বলিয়াছেন, আমরাও তাহাকেই বিশুদ্ধ মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম।

(২৩) সত্যেন্দ্র কুমার বসু প্রণীত "হিউ এন চাঙ্" পৃষ্ঠা—১৩৭॥

গ, ঔ এবং বিসর্গ এই প্রত্যেকটি বর্ণই শ্রুত হয় না। 'গ' বর্ণটি উচ্চারিত হইলে পরই 'ঔ' বর্ণ উচ্চারিত হয়, এবং তাহার পর বিসর্গ উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'গৌঃ' এই সমগ্র পদটি হইতেই অর্থবোধ হয়, কেবল 'গ' প্রভৃতি যে কোন একটি বর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, উপবর্ষের মত স্বীকার করিলে বর্ণাত্মক শব্দের অর্থ-প্রতিপাদন-ক্ষমতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই প্রকার যুক্তি দেখাইয়া স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, 'গ' প্রভৃতি এক একটি বর্ণের উচ্চারণের পর ঐ সকল বর্ণের একটি স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেকটি বর্ণের স্মৃতির সহিত সর্ব্বশেষ বর্ণের উচ্চারণই শব্দ। এইরূপ শব্দকেই উক্ত বৈয়াকরণেরা স্ফোটনামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্ফোটের স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। স্ফোটবাদ প্রকরণে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শবরস্বামী প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ উল্লিখিত স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন: মীমাংসকগণের মতে, পরবর্ত্তী বর্ণের

মীমাংসকদের যুক্তি

উচ্চারণকালে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের স্মৃতি থাকিতে পারে না; কারণ স্মৃতিমাত্রেই ক্ষণস্থায়ী। এইরূপে মীমাংসকেরা দেখাইয়াছেন যে, স্ফোটবাদিগণ যে যুক্তিতে উপবর্ষের মতের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, সেই যুক্তিতেই তাঁহাদের স্বীকৃত স্ফোটাত্মক শব্দও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

শবরস্বামী বলেন—শব্দস্থিত পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুলির উচ্চারণের পর তাহাদের একটি সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উক্ত সংস্কারদ্বারা পুষ্ট হইয়া চরম বর্ণটি অর্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় (২৪)। গ প্রভৃতি বর্ণ হইতে 'গৌঃ' শব্দটিকে পৃথগ্‌ভাবে শ্রবণ করা যায় না; অতএব 'শব্দ বর্ণাত্মক নহে' এইরূপ মনে করা অসঙ্গত। মহাত্মা কুমারিলভট্ট মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক নামক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়াছেন—বর্ণ-ব্যতিরিক্ত স্ফোট বলিয়া এমন কিছু নাই, যাহাদ্বারা অর্থের প্রতীতি হইতে পারে (২৫)। মহামতি পার্থসারথিমিশ্রও শাস্ত্রদীপিকা নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণ-ব্যতিরিক্ত

---

(২৪) পূর্ব্ববর্ণ-জনিত-সংস্কারসহিতোঽন্ত্যো বর্ণো বাচকঃ। শাবরভাষ্য ১।১।১ ॥

(২৫) নার্থস্য বাচকঃ স্ফোটো বর্ণেভ্যো ব্যতিরেকতঃ।

মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক, স্ফোটবাদ, শ্লোক—১৩৩ ॥

শব্দের অবস্থিতি অস্বীকার করিয়াছেন (২৬)। এইরূপে মীমাংসক আচার্য্যগণ বর্ণগুলিকেই শব্দরূপে স্বীকার করিয়া তাদৃশ শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ মীমাংসকদের এই যুক্তির বিপক্ষেও বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—মীমাংসকেরা ভাবপদার্থমাত্রেরই নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন; সংস্কারও ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং এই যুক্তিতে শব্দ এবং অর্থের ন্যায় সংস্কারও নিত্য হইয়া পড়ে। যদি সংস্কার নিত্য হইত, তাহা হইলে সকল সময়ে সকল বস্তুর জ্ঞান হইত। কিন্তু এইরূপ হয় না; অতএব, এইরূপ সংস্কার অর্থের প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। যদি বলা হয় যে, সংস্কার ভাবপদার্থ নহে, তাহা হইলে অর্থের সহিত শব্দের নিত্যসম্বন্ধ অসম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং সম্বন্ধনিত্যতাবাদী মীমাংসক এই কথা বলিতে পারেন না (২৭)। এইরূপে বৌদ্ধাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অন্যাপোহ (অন্যনিবর্ত্তন)ই শব্দ। বৌদ্ধমতে শব্দ এবং অর্থ উভয়েই অন্যাপোহস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, গো শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে একমাত্র এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, ইহা গো শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে; অতএব তাঁহাদের মতে এই অন্যাপোহই শব্দের স্বরূপ। বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্ব-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে এবং টীকাকার কমলশীল তাঁহার ভাষ্যে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের মত স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা অন্যান্য আচার্য্যগণের মতেরও উল্লেখক্রমে উহাদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের যুক্তি

অপোহবাদ

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের বিকারই শব্দ। জৈন আচার্য্যগণের মতে শাব্দ-পরমাণুসমষ্টি শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈশেষিক-মতে শব্দ আকাশের গুণ। বৈয়াকরণাচার্য্য পতঞ্জলির মতে পদার্থ-প্রতিপাদক ধ্বনিই শব্দ। শিক্ষাসূত্রকার

অন্যান্য মত

---

(২৬) তস্মাদ্ ব্যঞ্জক-ধ্বনীনাং ক্রমেণ ব্যঙ্গ্যেষু বর্ণেষু সমারোপিতেন তৎক্রমেণ স্মর্য্যমাণা বর্ণা বাচকাঃ, নান্যঃ শব্দোঽস্তি। শাস্ত্রদীপিকা ১।১।৫॥

(২৭) ভাবাচ্চাব্যতিরিক্তত্বান্নিত্যত্বং সংস্কৃতেরপি।
প্রাপ্নোতি, তেন বস্তূনাং বিজ্ঞানং সর্ব্বদা ভবেৎ॥
ব্যতিরেকে তু তস্যেতি সম্বন্ধো নোপপদ্যতে।
তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক—২৫১৪—১৫॥

বলেন, বায়বীয় পরমাণু শব্দরূপে পরিণত হয়। ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণদের মতে, শব্দ স্ফোটাত্মক। আচার্য্য বিন্ধ্যবাসীর মতে শব্দ সাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছু নহে; অর্থাৎ একটি শব্দের অনুকরণে অন্য শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিত তাঁহার 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের ২৩১০ এবং ২৩১১ সংখ্যক শ্লোকে শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের উল্লিখিত মতগুলির উল্লেখক্রমে উহাদের খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; এবং টীকাকার কমলশীল ঐসকল শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শান্তরক্ষিতের অভিপ্রায় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন (২৮)। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটির বিকারের ফলেই যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বক্রমে সূক্ষ্ম শব্দতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, ইহা সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ কি না, এই সম্বন্ধে সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

সাঙ্খ্যমত

মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যদর্শনের ১।৬১ সূত্রে বলিয়াছেন—সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটিই সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ঐ সময়ে জগতে কোনরূপ সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই ছিল না। তারপর উক্ত তিনটির মধ্যে বিকৃতি ঘটিলে, সময়বিশেষে তাহাদের এক একটি প্রবল হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহারই ফলে সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হইতে লাগিল। প্রথমে মহত্তত্ত্ব এবং তারপর অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টির পরই যে শব্দতন্মাত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও উক্ত সূত্রে

(২৮) বক্তব্যং চৈষ কঃ শব্দো বিনাশিত্বেন সাধ্যতে।
ত্রিগুণঃ পৌদ্গলো বায়ুমাকাশস্যাথবা গুণঃ॥
বর্ণাদন্যোঽথ নাদাত্মা বায়ুরূপমবাচকম্।
পদবাক্যাত্মকঃ স্ফোটঃ সারূপ্যান্যনিবর্ত্তনে॥
—তত্ত্বসংগ্রহ; শ্লোক—২৩১০—১১॥

সিদ্ধান্তভেদেন শব্দগতান্ বিকল্পানাহ—তত্র সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাবত্বাৎ ত্রিগুণঃ সাঙ্খ্যৈরিষ্টঃ শব্দঃ। পৌদ্গলো দিগম্বরৈঃ। পুদ্গলাঃ পরমাণব উচ্যন্তে। তেষাময়ং পৌদ্গলঃ, তদাত্মক ইতি যাবৎ। আকাশগুণঃ কাণাদৈরিষ্টঃ। বর্ণব্যতিরিক্তো নাদাত্মা লৌকিকৈঃ। যথোক্তং পাতঞ্জলে ভাষ্যে—"অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ" ইতি। বায়ুরূপমবাচকং শিক্ষাকারৈঃ। যথাহুঃ—"বায়ুরাপদ্যতে শব্দতাম্" ইতি। পদস্ফোটাত্মকো বাক্যস্ফোটাত্মকশ্চ বৈয়াকরণৈরিষ্টঃ। তদ্ যথাহুঃ—"নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ। আবৃত্তি-পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্য্যতে," ইতি। সারূপ্যং সাদৃশ্যং বিন্ধ্যবাসীষ্টম্। বৌদ্ধৈরন্যনিবর্ত্তনমন্যাপোহো বাচকত্বেন ষ ইষ্টঃ।—ঐ টীকা (কমলশীলকৃত)

বলা হইয়াছে (২৯)। কিন্তু উল্লিখিত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ কি না, তাহা সূত্রকার স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

সাঙ্খ্য-মতে কার্য্য এবং কারণ উভয়েই বাস্তব পদার্থ ; সুতরাং বাস্তব পদার্থ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ বিকৃত হইয়া পরম্পরাক্রমে যখন তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল, তখন বলিতে হয় যে, তন্মাত্রগুলি সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই পরিণাম। একটি বাস্তব পদার্থ যখন আর একটি বাস্তব পদার্থের রূপ ধারণ করে, তখন তাহার দ্বিতীয় রূপটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপের পরিণাম বলা হয়। শব্দ যখন সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করে, তখন তাহাকে শব্দ-তন্মাত্র বলা হয়। অতএব, শব্দ-তন্মাত্র বা সূক্ষ্মশব্দ সত্ত্বপ্রভৃতিরই পরিণত অবস্থা। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার সাঙ্খ্যকারিকা গ্রন্থের ১৬শ কারিকায় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটির গুণত্ব স্বীকার করিয়া ইহা হইতেই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (৩০)। উক্ত পুস্তকের সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে আচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রও সত্ত্বাদির গুণত্বই স্বীকার করিয়াছেন (৩১)। পণ্ডিত শিব-নারায়ণ শাস্ত্রীও তাঁহার সারবোধিনী নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন (৩২)।

সাঙ্খ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটির গুণত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ইহারা দ্রব্য (৩৩)। কি কারণে বিজ্ঞানভিক্ষু সত্ত্ব প্রভৃতিকে গুণ না বলিয়া দ্রব্য বলিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সত্ত্ব,

(২৯) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ; প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি।

"—সাঙ্খ্যদর্শন, ১ম অধ্যায়, ৬১ সূত্র।

(৩০) কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি-প্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ॥

—সাঙ্খ্যকারিকা। ১৬শ কারিকা।

(৩১) প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণত ইতি—প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বং রজস্তমশ্চ সদৃশ-পরিণামানি ভবন্তি। পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে, তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজো রজোগুণতয়া তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ত্ততে, তদিদমুক্তং—ত্রিগুণত ইতি।

—সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী (১৬শ কারিকার ব্যাখ্যা)

(৩২) ত্রিগুণত ইতি—পরস্পরামিলিতগুণত্রয়াদিত্যর্থঃ।—সারবোধিনী (ঐ ব্যাখ্যা).

(৩৩) সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ, লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাচ্চ।—সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য ১।৬১॥

রজঃ এবং তমঃ এই তিনটির বিকারের ফলে মহাভূত প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিয়া সাঙ্খ্যদর্শনের ১।৬১ সূত্রে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; অথচ, গুণ হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না। এই কথা চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সত্ত্ব প্রভৃতির দ্রব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

গুণ ও দ্রব্য

এই প্রসঙ্গে গুণ-শব্দের দুইটি পৃথক অর্থও লক্ষ্য করিবার মত। গুণ শব্দের একটি অর্থ 'অপ্রধান'। এই অর্থেই গুণ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া লক্ষণাকে গৌণীবৃত্তি নামে অভিহিত করা হয়। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটির কার্য্য-কলাপ দ্বারাই যাবতীয় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহারা মোটেই অপ্রধান নহে। ইহারা প্রধান বলিয়াই সাঙ্খ্যশাস্ত্রে ইহাদিগকে প্রধান নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। এই অর্থে গুণ শব্দটিকে গ্রহণ করিলে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃকে গুণ বলা চলে না।

গুণ শব্দের ব্যুৎপত্তি

গুণশব্দের অপর অর্থ 'রজ্জু'। রজ্জুদ্বারা যেমন গতিশীল বস্তুগুলিকেও বন্ধন করিয়া নিয়মিত করা হয়; সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো দ্বারাও তেমনি সমগ্র বিশ্ব নিয়মিত আছে। এই অর্থে গুণ শব্দটিকে গ্রহণ করিলে সত্ত্ব প্রভৃতিকে গুণ বলা যাইতে পারে। বন্ধনরজ্জু বস্তুতঃ দ্রব্য পদার্থ; অতএব এই দ্বিতীয় অর্থে গুণ শব্দটিকে গ্রহণ করিলে সত্ত্বপ্রকৃতিকে দ্রব্যও বলা চলে। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় অর্থে সত্ত্ব প্রভৃতিকে গুণ অথবা দ্রব্য বলিলে তাদৃশ গুণ ও দ্রব্য শব্দ উভয়েই ঔপচারিক হইবে; বাস্তব হইবে না।

পুরাণাদি শাস্ত্রে, অন্যান্য দর্শনে এবং সাঙ্খ্যশাস্ত্রেরও বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে সত্ত্ব প্রভৃতি তিনটির গুণত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এবং বিভিন্ন পুরাণে সত্ত্ব প্রভৃতিকে আন্তরগুণবিশেষরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে যেমন দ্রব্য বলা চলে না, আন্তরগুণ সত্ত্ব প্রভৃতিকেও তেমনি দ্রব্য বলা চলিবে না। মানুষের অন্তরে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটিলে তাহার চিন্তা ও কর্ম্মধারা এক প্রকারের হয়, আবার রজঃ অথবা তমঃ গুণের প্রাবল্যে একই ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম্মধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ উল্লিখিত সত্ত্বাদি তিনটির মধ্যে এক একটির প্রাধান্যেও

সত্ত্বাদির গুণত্ব

তেমনি এক এক প্রকার সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হইতে থাকে; সুতরাং সত্ত্ব প্রভৃতিকে গুণহিসাবে কল্পনা করিলে তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল—বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ এই গুণত্রয় কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিলে উক্ত গুণগুলি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সাঙ্খ্যসূত্রকার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১৷৯০) সূত্রটিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা সত্ত্ব প্রভৃতির দ্রব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সত্ত্ব প্রভৃতি যদি দ্রব্য হয়, তাহা হইলে আর তাহাদের আশ্রয় খুঁজিবার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ কোন কোন সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনের ৩৷৫৫ সূত্রে "ঈদৃশেশ্বরাসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" বলিয়া সূত্রকার জানাইয়াছেন যে, ন্যায়সম্মত ঈশ্বর স্বীকারেই তাঁহার আপত্তি; আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া তাদৃশ ইশ্বর স্বীকারে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। মহাত্মা অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার 'বৃত্তি' নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছেন। মহাত্মা বাচস্পতি মিশ্র যুক্তিদীপিকা নামে সাঙ্খ্যকারিকার যে ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পাতঞ্জল-দর্শন বস্তুতঃ সাঙ্খ্যশাস্ত্রেরই অঙ্গবিশেষ। উক্ত পাতঞ্জল সূত্রেও "ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর" সূত্রটিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বর স্বীকার করিলে তাঁহাকেই গুণত্রয়ের আশ্রয়রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। যদিও এই ঈশ্বর বেদান্তের ব্রহ্ম-পদার্থের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তথাপি তাঁহাকে গুণাতীতরূপে বর্ণনা করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, গুণসমূহ তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে না বলিয়াই তিনি গুণাতীত।

সাঙ্খ্যের ঈশ্বর

এতদ্ব্যতীত সাঙ্খ্যমতে পুরুষ নামক পঞ্চবিংশ তত্ত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। যে সকল সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও এই পুরুষরূপ তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। মূল প্রকৃতি যেমন নিত্য, সাঙ্খ্যসম্মত এই পুরুষও তেমনি নিত্য। অতএব, এই নিত্য পুরুষকে গুণত্রয়ের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণ "ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" (কারিকা—৩) এই কারিকাংশ দ্বারা পুরুষকে প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে ভিন্ন

পুরুষ

বলিয়া জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির আশ্রয়ত্ব নিষেধ করেন নাই। ১৭শ কারিকায় তিনি এই পুরুষকে ভোক্তা বলিয়াছেন। যে ভোক্তা, নিশ্চয়ই অপরের আশ্রয় হওয়ার মত যোগ্যতাও তাহাতে থাকাই স্বাভাবিক। "মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্" ( সাঙ্খ্যসূত্র ১।৬৫ ) এই সূত্রেও মূল প্রকৃতি সত্ত্বাদির অন্য কোন উৎপাদক কারণই অস্বীকৃত হইয়াছে; আশ্রয় অস্বীকার করা হয় নাই। সত্ত্বাদি গুণত্রয় এই পুরুষরূপ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, মনে করিলে তাহাদিগকে গুণ নামে অভিহিত করা আর দূষণীয় হয় না।

সাধারণতঃ যদিও গুণগুলি কোন আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়; তথাপি মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় ব্যতিরেকেই স্থিতি সম্ভব বলিয়া কোন কোন আচার্য্য মনে করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সাধারণ গুণ বা দ্রব্য কোনটিকেই আশ্রয়-ব্যতিরেকে থাকিতে দেখা যায় না; অথচ, ঈশ্বর বা ব্রহ্মের কোন আশ্রয় থাকা যে সম্ভব নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ঈশ্বর যদি আশ্রয়-ব্যতিরেকেই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই বা আশ্রয়-ব্যতিরেকে থাকিতে পারিবে না কেন? সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের এই যুক্তিটি উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আশ্রয়হীন গুণ

সকল কারণেরও যিনি কারণ (সর্ব্বকারণকারণম্) সেই মূলকারণই তো ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামে শাস্ত্রান্তরে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। জগতে যত নাম ও রূপ আছে, সবকিছুই তাঁহার—এইরূপ মতও উপনিষদাদি-শাস্ত্রসম্মত। ভারতীয় আর্য্যগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ঐরূপ অন্য কোন নামে স্মরণ করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা আল্লা নামে, এবং খ্রীষ্টানেরা God নামে তাঁহাকেই স্মরণ করেন। সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ যদি সেই আদি কারণকে গুণ নামে অভিহিত করিতে চাহেন, তবে তাহাতেই বা দোষ কি?

সাঙ্খ্যমত স্বীকার করিয়া গুণত্রয়ের বিকারকেই শব্দ বলিলে ইহাদ্বারা বস্তুতঃ শব্দের লক্ষণ করা হয় না; কারণ, সমুদয় পদার্থই গুণত্রয়ের বিকারের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া সাঙ্খ্যাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব, "গুণত্রয়ের বিকারই শব্দ" ইহাকে শব্দের লক্ষণ বলিলে এই লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়।

সাঙ্খ্যমত খণ্ডন

সাঙ্খ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লিখিত মত (গুণত্রয়ের বিকাররূপে শব্দের

উৎপত্তি-ধর্ম্মকতা) স্বীকার করিলে সিদ্ধসাধ্যতা নামক দোষ হয় বলিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ মনে করেন (৩৪)। সিদ্ধ শব্দের অর্থ 'প্রসিদ্ধ'। আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্রে প্রসিদ্ধ অর্থে সিদ্ধ শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন (৩৫) এবং উহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য দুর্গসিংহ কর্ত্তৃক সিদ্ধশব্দের অর্থগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছে (৩৬)। সাধ্য-শব্দের অর্থ 'সাধনীয়'। পূর্ব্ব হইতেই যাহার প্রসিদ্ধি আছে, তাহার সাধনের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিলে সিদ্ধসাধ্যতা নামক দোষ হয়।

সিদ্ধ-সাধ্যতা

উক্ত সিদ্ধসাধ্যতাদোষ কিভাবে হয়, একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। বৌদ্ধাচার্য্যগণ মনে করেন—সাঙ্খ্যদর্শনের ১।৬১ সূত্রে গুণত্রয়ের বিকাররূপ শব্দের উৎপত্তির উল্লেখ থাকায় তাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে; অথচ ৫।৫৮ (ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ) সূত্রে পুনরায় তাহার অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য সাঙ্খ্যসূত্রকার যত্ন করিয়াছেন। অতএব, বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের এইরূপ প্রচেষ্টাদ্বারা সিদ্ধসাধ্যতা দোষ উপজাত হইয়াছে।

আমরা এই বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যগণের সহিত একমত নহি। ১।৬১ সূত্রে শব্দতন্মাত্রকে সত্ত্ব প্রভৃতির পরিণামরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত সত্ত্ব প্রভৃতিকে মূলকারণ বলিয়া সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। মূলকারণ নিত্য হওয়াই স্বাভাবিক। আবার শব্দতন্মাত্রকে বলা হইয়াছে—সত্ত্ব প্রভৃতির পরিণাম। ফলে, মূল কারণের পরিণামরূপী শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এই সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়। এইরূপ সংশয়ের নিরসনের জন্যই সাঙ্খ্যসূত্রকার ৫।৫৮ সূত্রটি প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বস্তুতঃ সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের উক্তিতে সিদ্ধসাধ্যতা দোষ ঘটে নাই।

সিদ্ধসাধ্যতা খণ্ডন

বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীল 'সাঙ্খ্যাদি, (৩৭) শব্দে একটি আদি শব্দ যোগ

---

(৩৪) তত্র যদ্যেবং সাঙ্খ্যাদীষ্টানামনিত্যত্বং সাধ্যতে, তদা সিদ্ধসাধ্যতা পক্ষদোষঃ।
—তত্ত্বসংগ্রহ (২৩১২ শ্লোকের) টীকা।

(৩৫). সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ।—কাতন্ত্রব্যাকরণম্। ১ম সূত্র।

(৩৬) সিদ্ধশব্দোঽত্র নিত্যার্থো নিষ্পন্নার্থঃ প্রসিদ্ধার্থো বা। যথা সিদ্ধমাকাশং সিদ্ধমন্নং কাম্পিল্যঃ সিদ্ধঃ ইতি।
দুর্গসিংহটীকা (কলাপব্যাকরণম্; ১ম সূত্র)।

(৩৭) পাদটীকা ৩৪ দ্রষ্টব্য।

করায় বুঝা যায়, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতের উপরও তাঁহারা অনুরূপ দোষ স্থাপন করিতে চাহেন। বস্তুতঃ একই প্রকার যুক্তিদ্বারাই বৌদ্ধদের এই মতও খণ্ডন করা যায়।

জৈন আচার্য্যগণ মনে করেন—জলীয় পরমাণুসমষ্টি যেমন সম্মিলিত হইয়া মেঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে, শাব্দ পরমাণু-সমষ্টিও তেমনি সম্মিলিত হইয়া শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে (৩৮)। আচার্য্য ভর্তৃহরিও তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে এইরূপ যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন (৩৯)।

জৈন মত

বস্তুতঃ মেঘের সঙ্গে শব্দের তুলনা হইতে পারে না। জলীয় পরমাণু-সমষ্টি মেঘরূপে পরিণত হয় সত্য; কিন্তু একবার সে এইরূপ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইলে দীর্ঘকাল স্থূলরূপেই অবস্থান করে। পরিশেষে স্থূলাকারেই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিজের স্থূলতার প্রমাণ দেয়। শব্দ এইরূপ নহে। শ্রবণযোগ্য শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই আর তাহার কোনরূপ অবস্থিতি উপলব্ধ হয় না। অধিকন্তু, বর্ত্তমান প্রবন্ধেই আমরা দেখাইব যে, শব্দ বস্তুতঃ আকাশস্থ তরঙ্গবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং কোনরূপ জলীয় পদার্থের সঙ্গে যদি শব্দের তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে জলতরঙ্গের সঙ্গেই তাহার তুলনা করা উচিত। জলতরঙ্গ যেমন জল হইতে অভিন্ন, শব্দতরঙ্গকেও যদি তেমনি আকাশ হইতে অভিন্ন মনে করা যায়, তাহা হইতে আকাশের দ্রব্যত্বহেতু শব্দেরও দ্রব্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ, শব্দ দ্রব্য নহে; সুতরাং সে আকাশে থাকিয়াও আকাশ হইতে ভিন্ন।

জলতরঙ্গ জলীয় পরমাণুসমূহের সমষ্টি বটে; কিন্তু আমরা যে লোচনেন্দ্রিয় দ্বারা জলতরঙ্গকে দেখি, তাহাদ্বারাই তরঙ্গ-রহিত জলকেও দেখিয়া থাকি। শব্দের বেলা কিন্তু এইরূপ নহে। শাব্দ পরমাণুর সমষ্টি যদি শব্দ হইত, তাহা হইলে তরঙ্গহীন অবস্থায় যখন শব্দ আকাশে স্থিরভাবে অবস্থান করে, তখনও আমরা তাহাকে শুনিতে পাইতাম। কিন্তু, তাদৃশ অবস্থায় কদাপি আমরা শব্দ শুনিতে পাই না। অতএব, শব্দের মধ্যে কোনরূপ পরমাণু কল্পনা করা আমরা অসঙ্গত মনে করি।

জৈনমত খণ্ডন

স্পর্শ যেমন বায়ুর গুণ, বস্তুতঃ শব্দও তেমনি আকাশের গুণ। বৈশেষিক

(৩৮) পাদটীকা ২৮।

(৩৯) অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ।—ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক—১১২

প্রভৃতি দর্শনে এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসও তাঁহার রঘুবংশ মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে শব্দকে আকাশের গুণরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন (৪০)। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরাও আলোচনাদ্বারা ইহাই প্রদর্শন করিব। এইরূপ গুণের মধ্যে কোনরূপ পরমাণু থাকা প্রমাণসিদ্ধ নহে। স্পর্শের মধ্যে কোনরূপ পরমাণু থাকে বলিয়া আমরা অনুভব করি না। বায়বীয় পরমাণু-সমষ্টির আঘাতের ফলে স্পর্শের অনুভব হয় বটে; কিন্তু স্পর্শ ও বায়বীয় পরমাণু সম্পূর্ণ ভিন্ন। জলের পরমাণু আছে বটে; কিন্তু শীতলতা বা উষ্ণতার কোন পরমাণু নাই। ঠিক এইভাবে আকাশের গুণ শব্দের মধ্যেও কোনরূপ পরমাণু থাকা সম্ভব নহে বলিয়াই আমরা মনে করি।

শব্দ যে আকাশের গুণ—এই বিষয়ে বৈশেষিকদের সহিত আমরা একমত। "পদার্থ-প্রতিপাদক ধ্বনিই শব্দ" এই (পতঞ্জলির) মত হইতে আমাদের মতের পার্থক্য এই যে, আমরা ধ্বনিমাত্রেরই শব্দত্ব স্বীকার করি। শিক্ষাসূত্রকারের মত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, শব্দের ত্বাচপ্রত্যক্ষ না হওয়াই শব্দের বায়বীয়তার বিপক্ষে দৃঢ়তম প্রমাণ। শব্দ স্ফোটাত্মক কি না, এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

**অন্যান্য মতের আলোচনা**

আচার্য্য বিন্ধ্যবাসী যে শব্দের স্বরূপকে সাদৃশ্যমাত্র মনে করেন বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থের ২৩১১ সংখ্যক শ্লোকে এবং আচার্য্য কমলশীল উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন (৪১)।

আচার্য্য বিন্ধ্যবাসী মনে করেন—একজনের নৃত্য দেখিয়া যেমন আর একজন লোক নৃত্য শিক্ষা করে, ঠিক তেমনি একজনের মুখে একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অন্য লোক তাদৃশ শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে। এই যুক্তিতে তিনি পরবর্ত্তী শব্দগুলিকে পূর্ব্ববর্ত্তী একরূপ শব্দের সদৃশ বা অনুকরণরূপ মনে করেন।

**সাদৃশ্যবাদ**

বস্তুতঃ শব্দমাত্রেই অপরের সদৃশ বা অনুকরণরূপ হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথম যে ব্যক্তি নৃত্য করিতে শিখিয়াছিল, সে যেমন অন্যের নিকট

---

(৪০) অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ॥

রঘুবংশম্ ১৩।১

(৪১) পাদটীকা – ২৪।

হইতে ইহার অনুকরণ করে নাই, ঠিক তেমনি প্রথমোচ্চারিত শব্দকেও অন্য শব্দের সদৃশ বা অনুকরণরূপ বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথম যখন কোন মানুষ বৃক্ষকে বৃক্ষ নামে বা গরুকে গরু নামে অভিহিত করিয়াছিল, তখন সে কেবলমাত্র একটি মানসিক প্রেরণাবশেই এইরূপ করিয়াছিল; অন্য কোন অনুরূপ শব্দ সে তখন শুনিতে পায় নাই। অতএব, আমরা আচার্য্য বিন্ধ্যবাসীর এই মতটিকে অব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট মনে করি।

সাদৃশ্যবাদ খণ্ডন

বৈয়াকরণেরা যে একটি বর্ণের উচ্চারণের পরও তাহার স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। স্মৃতি বলিতে সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞানকে বুঝায়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ"। মীমাংসকশ্রেষ্ঠ পার্থসারথিমিশ্র তাঁহার শাস্ত্রদীপিকা নামক গ্রন্থে স্মৃতির উল্লিখিত লক্ষণের সঙ্গে একটি মাত্র শব্দ যোগ করিয়া বলিয়াছেন—"স্মৃতিশ্চ সংস্কারমাত্রজং জ্ঞানমভিধীয়তে" (৫ম সূত্রের ব্যাখ্যা)। শাব্দিক আচার্য্যগণও স্মৃতির লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতার্থ-বিষয়জ্ঞানমুচ্যতে" নৈয়ায়িক-চূড়ামণি বিশ্বনাথ পঞ্চানন তাঁহার কারিকাবলী নামক গ্রন্থে-অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধির দুইটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন (৪২)। পণ্ডিতপ্রবর জগদীশ ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'তর্কামৃতম্' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বানুভব সংস্কারদ্বারা স্মরণ বা স্মৃতি উৎপাদন করে (৪৩)। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ও তাঁহার ন্যায়প্রকাশিকা নামক স্বরচিত কারিকাময় গ্রন্থের ব্যাখ্যায় স্মৃতিকে সংস্কার-মাত্রজন্য জ্ঞান বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন (৪৪)।

স্মৃতি ও সংস্কার

একবার একটি বস্তু দেখিলে বা কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিলে, পরে আমরা ইচ্ছা করিলেই ঐ বস্তুটির আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি স্মরণ করিতে পারি। সুতরাং 'গৌঃ' বলিতে 'গ' উচ্চারিত হওয়ার পর যখন 'ঔ' উচ্চারিত

---

(৪২) ...বুদ্ধিস্তু মতা দ্বিবিধা। অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ...॥ কারিকা ৫১।

(৪৩) পূর্ব্বানুভবঃ সংস্কারদ্বারা স্মরণং জনয়তি।
—তর্কামৃতম্ (চৌখাম্বা), পৃষ্ঠা ২৭।

(৪৪) স্মৃতিস্তু সংস্কারমাত্রজন্যজ্ঞানত্বম্।
—ন্যায়প্রকাশিকাবিবৃতিঃ (৯৩ তম কারিকার ব্যাখ্যা)।

হয়, তখন গ এবং ঔ এর সংস্কারজন্য জ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া বিসর্গ অর্থ-প্রতিপাদন করিতেছে বলিলে অন্যায় হয় না। বৈয়াকরণেরা 'গৌঃ' পদদ্বারা এইরূপ সমগ্র জ্ঞানকেই বুঝিয়াছেন।

কি কারণে আমরা স্মৃতিকে 'সংস্কারজন্য জ্ঞান' না বলিয়া 'সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞান' বলিলাম, তৎসম্পর্কে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ভাষা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি গ্রন্থে যে বুদ্ধির দ্বিবিধ বিভাগ স্বীকার করিয়া অনুভূতিকে স্মৃতি হইতে পৃথগ্‌রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সংস্কারজন্য জ্ঞানকে স্মৃতি বলিলে অনুভূতিও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। অনুভূতি চারিপ্রকার যথা—(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমিতি (৩) উপমিতি এবং (৪) শব্দ।

কোন ব্যক্তি যখন বনে গিয়া একটি হরিণ দেখে, তখন ঐ হরিণের আকৃতি সম্বন্ধে একটি সংস্কার তাহার মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে চিড়িয়াখানায় গিয়া ঐরূপ একটি জন্তু দেখিলেই তাহার মনে পূর্ব্বদৃষ্ট হরিণের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তারপর "এই জন্তুটিও পূর্ব্বদৃষ্ট হরিণের সমান আকৃতিবিশিষ্ট; অতএব ইহাও একটি হরিণ" এইরূপ জ্ঞানের সাহায্যে সে উক্ত জন্তুটিকে হরিণ বলিয়া চিনিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং উপমিতির সঙ্গে সংস্কারও জ্ঞানোৎপাদনে সাহায্য করে বটে; কিন্তু এইরূপ (প্রত্যক্ষ ও উপমিতি সমন্বয়ে সংস্কারজন্য) জ্ঞানকে স্মৃতি বলা হয় না। স্মৃতিকে 'সংস্কারজন্য জ্ঞান' বলিলে এইরূপ জ্ঞানও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্মৃতির লক্ষণে একটি 'মাত্র' শব্দ যোগ করিয়াছেন। ইহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া আমরাও স্মৃতিকে 'সংস্কারজন্য-জ্ঞান' না বলিয়া 'সংস্কার-মাত্রজন্য জ্ঞান'ই বলিলাম।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—সংস্কারমাত্রদ্বারা যাহার উদ্ভব হয়, তাহাই স্মৃতি (সংস্কারমাত্রজন্যত্বং স্মৃতিত্বম্) এইরূপ বলিলেই তো চলিতে পারে; লক্ষণে আবার 'জ্ঞান' শব্দটি নিবেশের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, লক্ষণে জ্ঞানশব্দ নিবেশেরও প্রয়োজন আছে। সংস্কারের নাশও সংস্কার-মাত্রদ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাকে আমরা স্মৃতি বলি না। লক্ষণে 'জ্ঞান' শব্দটি না রাখিলে সংস্কারনাশও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

মীমাংসকেরা বৈয়াকরণাচার্য্যগণের উল্লিখিত মতের বিপক্ষে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা বলিয়াছেন—

জ্ঞানমাত্রেই ক্ষণস্থায়ী ; স্মৃতিও একটি জ্ঞান ; অতএব ইহাও ক্ষণস্থায়ীই হইবে। সুতরাং মীমাংসকমতে গকার উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। বস্তুতঃ আমরা যখন একটি কবিতা মুখস্থ করি, তখন যতবার খুসী তাহাকে স্মরণ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারি। এই কবিতার স্মৃতি একবার বিনষ্ট হইলেও যেমন পুনরায় ইচ্ছামাত্রই আসিয়া উপস্থিত হয়, গকারাদিবর্ণের স্মৃতিও তেমনি বক্তা বা শ্রোতার ইচ্ছামাত্রই তাহার মনে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম 'সংস্কারজন্য জ্ঞান'। মীমাংসকেরা বলিয়াছেন—পূর্ব্বে উচ্চারিত 'গ' প্রভৃতি বর্ণের স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে না; কিন্তু সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, সংস্কার থাকিলে তাহার জ্ঞানও অবশ্যই থাকিবে। দৃষ্টপদার্থের পুনরনুভব এবং মুখস্থ কবিতার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দেখিয়া আমরা ইহার প্রমাণ পাই।

মীমাংসামত খণ্ডন

বস্তুতঃ, জ্ঞানের ক্ষণমাত্র-স্থায়িত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। নৈয়ায়িকেরা জ্ঞানের দ্বিক্ষণস্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থের ২৭ শ কারিকায় 'ক্ষণিক-বিশেষ-গুণবত্ত্ব'কে আত্মার স্বাধর্ম্ম্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ-সমূহে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে যাহার বিনাশ ঘটে, তাহাকেই এখানে ক্ষণিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৪৫)। ইহাদ্বারা জ্ঞানের দ্বিক্ষণস্থায়িত্ব এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংসই স্বীকৃত হইল।

আচার্য্য রামচন্দ্র মিশ্র 'তর্কামৃতম্' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কোন কোন জ্ঞানের ত্রিক্ষণ-স্থায়িত্বও স্বীকার করিয়াছেন (৪৬)। আমাদের বিবেচনায় জ্ঞান যেমন ক্ষণিক নহে, তেমনি তাহাকে দ্বিক্ষণস্থায়ী বা ত্রিক্ষণস্থায়ীও বলা চলে না। বস্তুতঃ যতক্ষণ

জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী নহে

---

(৪৫) .........অথাকাশ-শরীরিণাম্।
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইষ্যতে ॥—ভাষাপরিচ্ছেদ। কারিকা—২৭।
ক্ষণিকত্বঞ্চ তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্।—ঐ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।
স্বোৎপত্তি-তৃতীয়ক্ষণে বৃত্তির্যস্য এবংবিধো যো ধ্বংসস্তৎপ্রতিযোগিত্বমেব ক্ষণিকত্বম্। মুক্তাবলী সংগ্রহঃ (পঞ্চাননশাস্ত্রি-কৃত)।

(৪৬) জ্ঞানস্য ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বেন কালান্তরভাবি-সংস্কারং প্রতি নিমিত্তং মধ্যস্থিত-সংস্কারদ্বারা জন্যতে ইতি ভাবঃ।—তর্কামৃতম্ (চৌখাম্বা), পৃষ্ঠা—২৭॥

পর্য্যন্ত অন্য কোন নূতন জ্ঞান আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে চাপা না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমরা জ্ঞানের স্থায়িত্ব অনুভব করিয়া থাকি। আচার্য্য শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ও তাঁহার 'ন্যায়-প্রকাশিকা' গ্রন্থের ৯২ তম কারিকায় একটি উপমার সাহায্যে বুদ্ধির (জ্ঞানের) অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং উঁহার বঙ্গানুবাদে স্বকীয় অভিপ্রায় স্পষ্টভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন (৪৭)।

মীমাংসকেরা বলিলেন—সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; আর স্ফোটবাদীরা বলিলেন—স্মৃতি বা সংস্কার-জন্য-জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। এই উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকেরা স্মৃতি ও সংস্কারের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের ৩২ এবং ৩৩ সংখ্যক কারিকায় আত্মার চতুর্দ্দশ গুণের মধ্যে বুদ্ধি এবং ভাবনা উভয়েরই উল্লেখ থাকায় ভাবনা যে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। স্মৃতি বুদ্ধিরই প্রকারভেদ; কারণ, উক্ত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থেই অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধির দ্বৈবিধ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ১৫৮ সংখ্যক কারিকায় ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে ভাবনা-নামক সংস্কার যে অন্যতম তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। ১৬০ এবং ১৬১ সংখ্যক কারিকায় স্পষ্টরূপেই ভাবনা নামক সংস্কারকে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার কারণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত শেষোক্ত কারিকার ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার সংস্কার নামের কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে হেতু ইহা স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা উৎপাদন করে, এই কারণেই ইহার নাম সংস্কার (৪৮)। ন্যায়-বৈশেষিক মতে এই

আলোচনা

(৪৭) বুদ্ধির্ন প্রত্যভিজ্ঞাত্রী নাপি তস্যাশ্চ নিত্যতা।
কিন্তুত্তবুদ্ধিনাশ্যত্বং শব্দস্য শব্দতো যথা॥
—ন্যায়প্রকাশিকা কারিকা—৯২॥

জীবাত্মার বুদ্ধি নিত্য নহে, কিন্তু যেমন প্রথমক্ষণে উৎপন্ন শব্দের দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন শব্দদ্বারা তৃতীয়ক্ষণে নাশ হয়, তেমন প্রথমক্ষণে উৎপন্ন বুদ্ধির দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন বুদ্ধিদ্বারা তৃতীয়ক্ষণে নাশ হয়। —ঐ বঙ্গানুবাদ

মন্তব্য—আমাদের বিবেচনায় তৃতীয়ক্ষণেই বুদ্ধির নাশ হয় না; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপর বুদ্ধি আসিয়া তাহাকে চাপা না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বর্ত্তমান থাকে।

(৪৮) যতঃ স্মরণং প্রত্যভিজ্ঞানঞ্চ জনয়তি, অতঃ সংস্কারঃ কথ্যতে।
—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

সংস্কার আত্মাতে অবস্থান করে (৪৯)। সাঙ্খ্য-মতে ইহা আমাদের মানসপটে চিত্রিত হয়। আবার পশ্চিমদেশীয় মনীষিগণের মতে উক্ত সংস্কার আমাদের মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার 'সংস্কার' নামের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়—সংস্কার থাকিলেই তাহার একটি স্মৃতি থাকে—ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। বস্তুতঃ ইহাদ্বারা উল্লিখিত আচার্য্য নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। সাঙ্খ্যাচার্য্যগণও ইহার বিপক্ষে কিছু বলেন নাই।

মীমাংসকেরা বলিয়াছেন—স্মৃতি বিনষ্ট হয়; কিন্তু সংস্কার বিনষ্ট হয় না। আমরা মীমাংসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—স্মৃতিহীন সংস্কার কেমন করিয়া অর্থবোধ জন্মাইবে?

সংস্কার যদি নিত্য হয়, তাহা হইতে স্বীকার করিতে হইবে যে. ১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে কবিতাটি মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহার সংস্কার আমার মধ্যে এখনও আছে। কিন্তু দীর্ঘ ১০ বৎসরের অনালোচনার ফলে সেই কবিতাটি আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছি। শতবার ইচ্ছা করিলেও এখন আর সেই কবিতা মুখস্থ বলা কিংবা তাহার অর্থ স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। গতকল্য যে কবিতাটি আমি উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়াছি, ইচ্ছা করিলে এখনই তাহার আবৃত্তি করিতে পারি বটে; কিন্তু যতক্ষণ সেই কবিতা আমার স্মরণে না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অর্থও তো আমার স্মরণে আসে না। যখন আমি একমনে গীতা পাঠ করি, তখন তো কালিদাস, মিলটন বা রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অর্থই আমার মনে উদিত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্মৃতিহীন সংস্কারের পক্ষে অর্থপ্রতিপাদন করা সম্ভব নহে।

অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণকালে যদি পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুলির সংস্কারমাত্রই অবশিষ্ট থাকিত; তাহাদের কোন স্মৃতি থাকিত না; তাহা হইলে এই অন্ত্যবর্ণের পক্ষেও অর্থপ্রতিপাদন করা সম্ভব হইত না। অতএব, স্বীকার করা আবশ্যক যে, অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণকালে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুলির একটি স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহারই সহায়তায় অন্ত্যবর্ণটি অর্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়।

---

(৪৯) ভাবনাখ্যস্তু সংস্কারো জীববৃত্তিরতীন্দ্রিয়ঃ।—ভাষাপরিচ্ছেদ; কারিকা—১৬০।

পশ্চিমদেশীয় মনীষিগণ বলেন—কোন মানুষ যখন যে কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে; তখন ঐ বস্তু বা বিষয়ের একটা চিত্র তাহার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হওয়ার ফলেই সে উহার জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে; সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই অন্য বিষয়ের জ্ঞান আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটিকে চাপা দিয়া থাকে। কিন্তু যখনই উক্ত অনুভবকারী ব্যক্তিটি পুনরায় পূর্ব্বানুভূত বস্তু বা বিষয়টিকে স্মরণ করিতে চান, তখনই তাঁহার মস্তিষ্কস্থিত পূর্ব্বাঙ্কিত চিত্রটি তাঁহার মানসপটে ঐ জ্ঞানটিকে আনিয়া উপস্থিত করে। উল্লিখিত মস্তিষ্কে অঙ্কিত চিত্রটিকেই সংস্কার বলা হয়; এবং তাহার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, উহাকে বলা হয় 'স্মৃতি'। অতএব এই মতটি স্বীকার করিলে, সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যখনই কোন বস্তুর সংস্কার থাকিবে, অন্য জ্ঞানদ্বারা প্রতিবন্ধ না হইলে তখনই সেই সংস্কারের জ্ঞানও থাকিতে বাধ্য।

**উপবর্ষ ও স্ফোটবাদ**

উপবর্ষের মত এবং স্ফোটবাদিগণের মতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপবর্ষের মতে গ, ঔ এবং বিসর্গ এই তিনটি বর্ণ পর পর উচ্চারিত হইয়া একযোগে অর্থ-প্রতিপাদন করে; আর স্ফোটবাদীরা বলেন—উল্লিখিত এক একটি বর্ণ উচ্চারিত হওয়ার পর তাহাদের একটি স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে; এবং ঐ সকল বর্ণের স্মৃতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অন্ত্যবর্ণটি অর্থ প্রতিপাদন করে। আমরা এই বিষয়ে স্ফোটবাদীদের সহিত একমত যে, দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণকালে প্রথমোচ্চারিত বর্ণের অবস্থিতি থাকা সম্ভব নহে; কেবলমাত্র তাহার একটি স্মৃতি থাকাই সম্ভব। সুতরাং উপবর্ষের মত খণ্ডনের জন্য স্ফোটবাদীদের প্রদর্শিত যুক্তিটিকে আমরা বিচারসহ এবং অনুভব-সিদ্ধ বলিয়াই মনে করি।

উপবর্ষের উল্লিখিত মত সমর্থন করিয়া মীমাংসকেরা বলিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগুলির উচ্চারণের পর তাহাদের একটি সংস্কার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; এবং ইহা অন্ত্যবর্ণটিকে অর্থ প্রতিপাদনে সহায়তা করে। বস্তুতঃ ইহাই যদি উপবর্ষের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি বর্ণগুলিকেই শব্দ না বলিয়া 'পূর্ব্ববর্ণসংস্কারসংবলিত-অন্ত্যবর্ণ ই শব্দ' এইরূপ বলিতেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্ববর্ণের সংস্কার থাকিলে, তাহার ফলে উক্ত বর্ণের একটি স্মৃতিও থাকা স্বাভাবিক। স্মৃতিহীন সংস্কারের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাদৃশ সংস্কার যে অর্থবোধ জন্মাইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

এখানে এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে যে, ঔকারের জ্ঞানদ্বারা গকারের জ্ঞান প্রতিবদ্ধ হয়, এবং ফলে তখন আর গকারের স্মৃতি থাকে না। কিন্তু বস্তুতঃ ঔকারের জ্ঞানদ্বারা গকারের জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রতিবদ্ধ হয় না। গকারের সংস্কারজন্য জ্ঞানের সহিতই ঔকারের জ্ঞান হইয়া থাকে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা স্পষ্ট করিতেছি। আমরা একটি বৃক্ষ দেখিবার সময়ে তাহার মূল, শাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতিকে পর পরই দেখিয়া থাকি; কিন্তু যখন উহার সংস্কাররূপ চিত্র আমাদের আত্মাতে (ন্যায়বৈশেষিক মতে), মানসপটে (সাঙ্খ্যমতে) বা মস্তিষ্কে (পাশ্চাত্ত্যমতে) অঙ্কিত হয়, তখন আমরা সেই সংস্কারের দ্বারা শাখা-পল্লবাদি-বিশিষ্ট সমগ্র বৃক্ষটিকেই স্মরণ করিয়া থাকি। ঠিক এইভাবে 'গৌঃ' শব্দের উচ্চারণে গ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ পৃথক্ পৃথগ্ হইলেও তাহাদের স্মরণ একসঙ্গে হইতে পারে। সুতরাং স্ফোটবাদীরা অযৌক্তিক কথা বলেন নাই।

সংশয়-নিরসন

নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ যে সংস্কারের আত্মাতে অবস্থিতির কথা বলিয়াছেন, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ আত্মা নিত্য পদার্থ এবং ইহা সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত। উপনিষৎসমূহে আত্মাকে অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কোন বাহ্য পদার্থই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অনিত্য বাহ্য পদার্থ সংস্কার নিত্য নির্লিপ্ত আত্মাতে কেমন করিয়া আশ্রয় লাভ করিবে? মন অতি সূক্ষ্ম; সুতরাং ইহার পক্ষেও সংস্কারের আশ্রয় হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অন্যাশ্রিত সংস্কার সাময়িক-ভাবে ক্ষুদ্রায়তন মনে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া মনকেই সংস্কারের আশ্রয় বলা যুক্তি সঙ্গত হইবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণের এতৎ-সংক্রান্ত মতটিকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি। অর্থাৎ সংস্কার যে মনুষ্য প্রভৃতির মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়, এই কথাটি আমরাও স্বীকার করি।

ন্যায়মত খণ্ডন

সাঙ্খ্যমত খণ্ডন

বিজ্ঞানমত সমর্থন

মীমাংসকদের যুক্তির বিপক্ষে বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। মীমাংসকেরা ভাবপদার্থের নিত্যতা

বৌদ্ধযুক্তি খণ্ডন

স্বীকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে অর্থে উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থে নহে। মীমাংসক-মতে জাতিমাত্রেই নিত্য, সুতরাং সংস্কাররূপ জাতির নিত্যতা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু; এই কারণে সংস্কাররূপ দ্রব্যের নিত্যতা স্বীকার করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন।

বস্তুবিশেষের সংস্কার ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কে চিত্রিত হয়; সুতরাং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে যখন তাহার মস্তিষ্ক বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উল্লিখিত সংস্কারবিশেষও বিনষ্ট হইতে বাধ্য। কিন্তু মীমাংসকমতে সংস্কার-জাতির বিনাশ নাই। রামের মস্তিষ্কগত বৃক্ষের সংস্কার বিনষ্ট হইলেও শ্যাম বা যদুর মস্তিষ্কে তখনও তাহা বিরাজ করে; অতএব জাতি হিসাবে তাহা নিত্য—ইহাই মীমাংসকদের অভিপ্রায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধেরা যে ভাবে মনে করিয়াছেন, মীমাংসকেরা সেইভাবে সংস্কার-মাত্রের নিত্যতা স্বীকার করেন নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সংস্কার যদি মনুষ্যের মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয় এবং দেহ ও মস্তিষ্কের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারেরও বিনাশ ঘটে,

জাতিস্মরত্বের হেতু

তাহা হইলে জাতিস্মর লোকেরা পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কেমন করিয়া বলিতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব—কোটি কোটি লোকের মধ্যে কদাচিৎ একজনকে জাতিস্মর হইতে দেখা যায়। সুতরাং জাতিস্মরত্ব লাভ করা যে একটী অলৌকিক ব্যাপার, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। যোগীরা যেমন যোগবলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব কিছুই জানিতে পারেন, জাতিস্মরেরাও তেমনি তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত লোকাতীত পুণ্যের বলে এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। দেহবিনাশের পর যখন তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ অপর দেহকে আশ্রয় করে, তখন ঐ সূক্ষ্মদেহাশ্রিত সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের মধ্যে সংস্কারও সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে; এবং দেহান্তর প্রবেশ কালে সেই সূক্ষ্মদেহাশ্রিত সূক্ষ্ম সংস্কারও নূতন দেহের মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয়। ইহা একমাত্র অলৌকিক পুণ্যপ্রভাবেরই ফল; সাধারণ নিয়ম নহে। ইহা যদি সাধারণ নিয়ম হইত, তাহা হইলে প্রাণিমাত্রেই জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিত।

মীমাংসক-মতে সংস্কার ভাবপদার্থই বটে, এবং তাহার ব্যাবহারিক নিত্যতাও মীমাংসক-সম্মত; সুতরাং মীমাংসক-মতে শব্দ ও অর্থের

ব্যাবহারিক নিত্য-সম্বন্ধ স্বীকার করার পক্ষেও কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে না।

বৌদ্ধেরা যে অন্যাপোহকে শব্দের স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিবেচনায় অযৌক্তিক। ইহাদ্বারা বস্তুতঃ শব্দের স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে না। যে ছেলে কোনদিন গরু দেখে নাই, তাহার কাছে গরুর পরিচয় দিতে গিয়া যদি কেহ বলে—ইহা গরু ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইলে বস্তুতঃ ছেলেটি কিছুই বুঝিবে না। কিন্তু যদি শৃঙ্গ, লাঙ্গুল, খুর, গলকম্বলাদিযুক্ত চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ—ইত্যাদিরূপে গরুর একটি নির্ভুল বর্ণনা তাহার কাছে দেওয়া হয়, তবে ছেলেটি উক্ত বর্ণনা হইতে একটি সংস্কার লাভ করিবে; এবং পরে গরু দেখিলেই তাহাকে চিনিতে পারিবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় 'অন্যাপোহ' কথাটি শব্দের স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম।

অপোহবাদ খণ্ডন

অপোহ যে শব্দ বা অর্থের স্বরূপ হইতে পারে না, পরবর্ত্তীকালের মীমাংসক আচার্য্যগণও ইহার প্রতিপাদনের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অপোহ বস্তুতঃ অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঘট বলিতে আমরা যেমন একটি বস্তুকে বুঝিতে পারি, কোন অভাব পদার্থদ্বারা এইভাবে কোন পদার্থের জ্ঞান হয় না। সুতরাং ইহা লক্ষণ হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, ঘটের অভাব বলিলে আমরা যেমন একটি অর্থ বুঝিতে পারি, এখানেও সেইভাবেই অর্থবোধ হইবে; তাহা হইলেও মীমাংসকেরা ইহার বিপক্ষে যুক্তি দেখাইতে সমর্থ। অপোহরূপ অভাবের আশ্রয় নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে তাহাদ্বারা কোন জ্ঞানই হয় না। যদি বলা হয় যে, শব্দই তাহার আশ্রয়, তাহা হইলেও মারাত্মক দোষ ঘটিবে; কারণ, সেই শব্দের স্বরূপ প্রকাশেই তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী নামক গ্রন্থে মীমাংসকগণের এই সকল যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন (৫০)।

অপোহকে যে ভাবপদার্থও বলা যায় না, তাহাও আচার্য্য জয়ন্ত-ভট্ট যুক্তিদ্বারা

---

(৫০) নম্বপোহশব্দার্থপক্ষে মহতীং কৃপাণবৃষ্টিমুৎসসর্জ্জ ভট্টঃ। তথা হি অপোহো নাম ব্যাবৃত্তিরভাব ইষ্যতে। ন চাভাবঃ স্বতন্ত্রতয়া ঘটবদবগম্যতে। তদয়মন্যাশ্রিতো বক্তব্যঃ; কশ্চ তদাশ্রয় ইতি চিন্ত্যম্। ন তাবদ্ ভোঃ স্বলক্ষণমাশ্রয়ঃ, তস্য বিকল্পভূমিত্বাভাবাৎ।

—ন্যায়মঞ্জরী; প্রমাণ প্রকরণ; পৃষ্ঠা—২৭৭।

প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অপোহ যদি ভাব-পদার্থ হইত, তাহা হইলে বহিঃস্থিত অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আমরা তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম; কিন্তু কেহই এইভাবে অপোহকে প্রত্যক্ষ করেন না। যদি বলা হয় যে, অপোহ আন্তর-জ্ঞানবিশেষ; তাহা হইলেও সেই জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহাদের কোনটিই সম্ভব না হওয়ায় অপোহকে বাহ্যজ্ঞান বা আন্তরজ্ঞান কিছুই বলা চলে না। বস্তুতঃ ইহা জ্ঞান এবং অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভাব পদার্থই বটে (৫১)। অন্যাপোহ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত "শব্দার্থতত্ত্ব" * নামক গ্রন্থে করিয়াছি; সুতরাং এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

স্ফোট বা পদার্থ-প্রতিপাদক ধ্বনিকে শব্দ বলিলেও নিরর্থক শব্দে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়; কারণ মেঘগর্জ্জন, ভেরীনিনাদ প্রভৃতি নিরর্থক ধ্বনিকেও আমরা শব্দই বলিয়া থাকি।

বিভিন্ন দর্শনে এবং পাতঞ্জল-মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে যে ধ্বনিকেই শব্দ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণও শব্দ এবং ধ্বনিকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার রচিত "ভাষার ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে ভাষার লক্ষণ করিয়াছেন—"কণ্ঠোদ্‌গীর্ণ অর্থবান্ ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা" (৫২)। শব্দসমষ্টি বা পদসমষ্টিই যে ভাষা, ইহা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং আচার্য্য সেনের উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শব্দ এবং ধ্বনিকে অভিন্ন মনে করেন।

ভাষাতত্ত্ব

কোন কোন আচার্য্য শব্দের দ্রব্যত্বও স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের ২।২।২৩ সূত্রদ্বারা (৫৩) শব্দের দ্রব্যত্ব খণ্ডন

---

(৫১) অপোহো যদি ভাবাত্মা বহিরভ্যুপগম্যতে।
ততো ভবতি ভাবংকঃ বাগ্‌জালং ন ভসৌ তথা॥

কিন্নু খল্বয়মান্তরো জ্ঞানাত্মা সৌগতানামপোহঃ সম্মতঃ; তথাভ্যুপগমে কেয়মপোহবাচোযুক্তিঃ? স্বাংশবিষয়ং পদার্থজ্ঞানমিত্যেতদেব বক্তুমুচিতম্; এতদপি নাস্তি। নায়মান্তরো ন বাহ্যোঽপোহঃ কিন্তু জ্ঞানার্থাভ্যামন্য এব।

—ন্যায়মঞ্জরী; প্রমাণপ্রকরণ; পৃষ্ঠা—২৭৯॥

* এই গ্রন্থ লিখিয়া লেখক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

(৫২) ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা—১॥

(৫৩) একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্।—কণাদসূত্র ২।২।২৩

করিয়াছেন এবং উহার উপস্কার নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করমিশ্র মহর্ষির অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন—শব্দ একটি দ্রব্যে (আকাশে) সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থান করে। কোন দ্রব্যের পক্ষে এইভাবে দ্রব্যান্তরকে আশ্রয় করিয়া সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করা সম্ভব নহে; অতএব বুঝা যায় যে, শব্দ দ্রব্য নহে (৫৪)।

শব্দদ্রব্যতাবাদ

বৈশেষিকদের যুক্তি

বৈশেষিকদের এই যুক্তির বিপক্ষে সংশয় জন্মিতে পারে যে, কপালরূপ দ্রব্যে ঘটরূপ দ্রব্যের সমবায় সম্বন্ধ তো স্বীকৃত হইয়াছে; তবে কোন দ্রব্যই দ্রব্যান্তরকে আশ্রয় করিয়া সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে না বলিয়া কেন স্বীকার করিব? ইহার উত্তর অতি স্পষ্ট। কপাল ও ঘট পৃথক্ দ্রব্য নহে। কপাল ঘটের অবয়ব মাত্র। অপর পক্ষে শব্দ এবং আকাশের মধ্যে এইরূপ অবয়বাবয়বী সম্বন্ধ নাই। আকাশরূপ দ্রব্য শব্দরূপ গুণের আশ্রয়মাত্র। অতএব বৈশেষিকদের যুক্তি ঠিকই আছে।

মহর্ষি প্রশস্তপাদও তাঁহার ভাষ্যে পরিষ্কার ভাষায় শব্দকে আকাশের গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৫৫)। এতদ্ব্যতীত নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকদের লিখিত অন্যান্য বহু গ্রন্থেও শব্দের গুণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাষাপরিচ্ছেদ (৫৬) প্রভৃতি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আচার্য্য বল্লভ তাঁহার 'ন্যায়-লীলাবতী' নামক গ্রন্থে শব্দদ্রব্যতাবাদীদের মতের উল্লেখক্রমে নৈয়ায়িকসুলভ যুক্তিসমূহের দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। শব্দদ্রব্যতাবাদিগণ নিজেদের মতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তন্মধ্যে দুইটিই প্রধান। তাঁহাদের প্রথম যুক্তি এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধই শব্দ-জ্ঞানের হেতু; অতএব শব্দ দ্রব্য (৫৭)। গুণ এইভাবে কোন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধদ্বারা জানা যায় না। গুণ কোন দ্রব্যকে আশ্রয়

বল্লভাচার্য্যের যুক্তি

---

(৫৪) একং দ্রব্যং সমবায়ি যস্য তদেকদ্রব্যম্; দ্রব্যঞ্চ কিমপ্যেকদ্রব্যসমবায়িকারণকং ন ভবতীতি দ্রব্যবৈধর্ম্ম্যাম্লায়ং শব্দো দ্রব্যমিত্যর্থঃ।—ঐ উপস্কার।

(৫৫) শব্দোঽম্বরগুণঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ ক্ষণিকঃ ... ।—প্রশস্তপাদভাষ্যম্।

(৫৬) আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।—ভাষাপরিচ্ছেদ; কারিকা—৪৪॥

(৫৭) শব্দো দ্রব্যং সাক্ষাদিন্দ্রিয়সম্বন্ধবেদ্যত্বাদ্ ঘটবৎ। শ্রোত্রং চ দ্রব্যগ্রাহকং নিরবয়বেন্দ্রিয়ত্বান্মনোবৎ। —ন্যায়লীলাবতী (চৌখাম্বা), পৃষ্ঠ—৬৬৫॥

করিয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় ও গুণের সংযোগ সেই দ্রব্যের মাধ্যমেই হয়; সাক্ষাৎভাবে নহে।

এই যুক্তির বিপক্ষে আচার্য্য বল্লভ স্বকীয় যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া প্রথমে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দ্বারা শব্দের গ্রহণ হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের মতে শব্দ স্পর্শ-গুণযুক্ত, না স্পর্শ-গুণহীন? শব্দকে স্পর্শগুণযুক্ত বলা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে আমরা চর্ম্মদ্বারা শব্দের অনুভব করিতাম। শব্দকে স্পর্শগুণহীন দ্রব্য বলিয়াও অভিহিত করা চলে না; কারণ স্পর্শগুণহীন দ্রব্যমাত্রেই অতীন্দ্রিয়। শব্দ যে দ্রব্য নহে, মনুষ্যের অনুভবও এই বিষয়ের সাক্ষী। সংযুক্ত-সমবায়ই হউক আর সমবায়ই হউক, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের একটি সম্বন্ধ হওয়ার ফলে আমরা কর্ণদ্বারা শব্দ শুনিতে পাই। শব্দ এইরূপে শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়ায় তাহাকে অতীন্দ্রিয় বলা চলে না। এইরূপ যুক্তিদ্বারা আচার্য্য বল্লভ শব্দের দ্রব্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য বল্লভ একটু কঠিন ভাষায় এই কথাগুলি বলিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর মিশ্র তাঁহার 'ন্যায়লীলাবতী-কণ্ঠাভরণম্' নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত আচার্য্যের উল্লিখিত অভিপ্রায় স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৮)।

শব্দদ্রব্যতাবাদীদিগের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, শব্দের মধ্যে সংখ্যা, বেগ প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান। ঐ সকল গুণের আশ্রয় বলিয়া শব্দকে দ্রব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ গুণসমূহ কেবলমাত্র কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকিতে পারে (৫৯)।

উল্লিখিত দ্বিতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরা বলেন—সংখ্যা, বেগ প্রভৃতি শব্দের ধর্ম্ম নহে; কারণ, গুণ শব্দের মধ্যে অন্য কোনরূপ গুণ থাকা

---

(৫৮) সাক্ষাদিন্দ্রিয়সম্বন্ধবেদ্যত্বং হি যাবৎ-প্রসক্ত-পারিশেষ্যাদ্ বা নিশ্চীয়তে একদেশ-পারিশেষ্যাদ্ বা? নাদ্যঃ। তত এবাদ্রব্যত্বনিরূপণেন লিঙ্গগ্রাহকমানবাধাৎ। নেতরঃ, কর্ম্মত্বাদেরপ্রতিষেধে সংযুক্তসমবায়াদিবেদ্যত্বশঙ্কায়াং হেতোরসিদ্ধতাপত্তিঃ।

—ন্যায়লীলাবতী (চৌখাম্বা), পৃষ্ঠা—৬৬৭—৬৬৮॥

দ্রব্যং ভবৎ স্পর্শবন্নিস্পর্শং বা স্যাৎ? আদ্যে ত্বগিন্দ্রিয়বেদ্যত্বাপত্তিরন্ত্যেঽতীন্দ্রিয়ত্বাপত্তিরিতি পরিশেষাদ্ দ্রব্যত্বসিদ্ধৌ বাধ ইত্যর্থঃ। —ন্যায়লীলাবতী কণ্ঠাভরণম্। পৃষ্ঠা-ঐ।

(৫৯) গুণবত্ত্বাচ্চ দ্রব্যম্। সংখ্যাবেগাদয়োঽপি শব্দধর্ম্মা অনুভূয়ন্তে।

—ন্যায়লীলাবতী (চৌখাম্বা), পৃষ্ঠা—৬৬৬॥

অসম্ভব। নৈয়ায়িকদের মতে, ভিন্ন ভিন্ন শব্দের পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ হইতে আমাদের ঐ সকল শব্দের দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যার জ্ঞান জন্মে, আর শব্দের তারত্ব, মন্দত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন শব্দতরঙ্গের একদা উপস্থিতির ফলে কর্ণশষ্কুলির উত্তেজনা প্রভৃতিই কারণ। নৈয়ায়িকদের এই কথা স্বীকার করিলে আর শব্দকে সংখ্যা, বেগ প্রভৃতির আশ্রয়রূপে কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শব্দ দ্রব্য নহে

এইভাবে শব্দের দ্রব্যত্ব খণ্ডন করিয়া আচার্য্য বল্লভ স্পষ্ট ভাষায়ই জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মতে শব্দ আকাশের গুণ। তিনি বলেন—ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যেভাবে গন্ধরূপ গুণের প্রত্যক্ষ করি, শব্দরূপ গুণের প্রত্যক্ষও তেমনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা করিয়া থাকি। শব্দকে কোন অবস্থায়ই দ্রব্য বলা যায় না। দ্রব্য দুই প্রকার—সাবয়ব এবং নিরবয়ব।

শব্দকে সাবয়ব দ্রব্য বলা চলে না; কারণ, শব্দের যে কোন অবয়ব নাই, তাহা অনুভবসিদ্ধ। শব্দকে নিরবয়ব দ্রব্যও বলা যায় না; কারণ, নিরবয়ব দ্রব্য কিছুতেই বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। আত্মা একটি নিরবয়ব দ্রব্য, এবং কোন সিদ্ধ ঋষিও তাহাকে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। অতএব শব্দকে দ্রব্য না বলিয়া গুণই বলিতে হইবে। অন্যান্য নৈয়ায়িকদের ন্যায় আচার্য্য বল্লভও শব্দকে অনিত্য মনে করেন (৬০)।

আলোচনা

দ্রব্য এবং দ্রব্যাশ্রিত গুণ—এই দুইটির মধ্যে কোনটির জ্ঞান পূর্ব্বে হয়, এই সম্বন্ধেও চিন্তানায়কগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে গুণের জ্ঞানই প্রথমে হয়; দ্রব্যের জ্ঞান তাহার পরে হইয়া থাকে। এই পক্ষ মনে করেন—আমরা যখন লাল, নীল বা অন্য বর্ণের পুষ্প প্রভৃতি দেখি, তখন উল্লিখিত দ্রব্যস্থিত রক্তিমা প্রভৃতি গুণই আমাদের লোচনেন্দ্রিয় দ্বারা প্রথমে গৃহীত হয়। গুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের জ্ঞান তাহার পরে হইয়া থাকে। নীলোৎপলের অন্তর্গত

---

(৬০) শব্দো গুণো জাতিমত্ত্বে সতি অস্মদাদি-বাহ্যাচাক্ষুষ প্রত্যক্ষত্বাদ্ গন্ধবৎ। যদি তু নিরবয়বদ্রব্যং স্যাদ্ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ন স্যাৎ। —ন্যায় লীলাবতী; পৃষ্ঠা—২৭৪ – ২৭৫॥

প্রমাণান্তরবেদ্যং পৌর্বাপর্য্যং বা ক্রম ইতি স্থিতং শব্দো গুণোঽনিত্যশ্চেতি।

—ঐ, পৃষ্ঠা—৬৭৩॥

নীল বর্ণটিই সর্ব্বপ্রথম আমাদের নয়নকে আকৃষ্ট করে। অবশেষে সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত উক্ত নীল বর্ণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পর তাহার আশ্রয় দ্রব্যটিকে আমরা সম্যগ্‌রূপে দেখিতে পাই। এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্বীকার করা উচিত যে, লোচনেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দ্বারা শব্দরূপ গুণেরও গ্রহণ হইয়া থাকে।

দ্রব্যাশ্রিত নীলাদি গুণই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া একটি মত যে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, কলাপ-ব্যাকরণের টীকাকারগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। নীলোৎপল বলিতে নীল এবং উৎপল শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনটা বিশেষ্য এবং কোনটা বিশেষণ, এই সম্বন্ধে তাঁহারা নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণা করতঃ বহু আলোচনা করিয়াছেন (৬১)।

আমরা যখন দূর হইতে কোন বস্তু দেখি, তখন তাহার বর্ণটিই আমাদেব দৃষ্টিকে প্রথম আকৃষ্ট করে। প্রায়ই লোককে বলিতে শোনা যায় "দূরে ঐ লাল কি দেখা যাচ্ছে মশায়?" ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, দ্রব্যাশ্রিত রক্তিমাদি গুণটিকেই লোকে প্রথমে অবলোকন করে। মহাত্মা কুমারিল ভট্টও তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিক নামক গ্রন্থে—

"পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দং চ শৃণ্বতঃ।
খুরবিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতাশ্বো ধাবতীতি ধীঃ॥ (৬২)

এই শ্লোকটিদ্বারা উক্তপ্রকার মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে দূর হইতে পরিদৃশ্যমান শ্বেত বর্ণ দর্শন এবং হ্রেষা ও খুরবিক্ষেপ শব্দ শ্রবণ করিবার পরই "শ্বেতবর্ণ অশ্ব ধাবিত হইতেছে"—এইরূপ জ্ঞান হয়। শ্লোকস্থ 'শ্বেতিমন্' এবং 'আরূপ' এই দুইটি শব্দকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করেন বটে; কিন্তু

---

(৬১) তথাহি সামান্যনীলগুণবাচকস্য নীলশব্দস্যার্থ উৎপলশব্দেনোৎপলত্বাবচ্ছেদেনোপস্থাপ্যত ইতি উৎপলস্য বিশেষণত্বম্। এবমুৎপলশব্দজনিত বিশেষবুদ্ধি-বিষয়ত্বাৎ নীলস্যাপি বিশেষ্যত্বং বোধ্যম্। তর্হি কথং নীলং বিশেষণম্ উৎপলং বিশেষ্যমিত্যুক্তম্—উক্তরূপেণোভয়োরেব বিশেষণত্ব-বিশেষ্যত্বলাভাৎ? সত্যং যদ্যপি অর্থদ্বারা উভয়োর্বিশেষণত্ব-বিশেষ্যত্বয়োঃ সাম্যস্তথাপি গুণ-দ্রব্যয়োঃ সমাসে সতি দ্রব্যশব্দস্যৈব বিশেষ্যত্বং লোকপ্রসিদ্ধমিতি যুক্তমুক্তং পঞ্জ্যাম্।

—কবিরাজ টীকা ("পদেতুল্যাধিকরণে..." সূত্রের ব্যাখ্যা)।

(৬২) মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক; বাক্যাধিকরণ; শ্লোক—৩৫৭

আমাদের বিবেচনায় 'শ্বেতিমন্' শব্দের অর্থ—উক্ত শ্বেতবর্ণেরই অস্পষ্ট আকার।

শ্বেতবর্ণটি যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই দ্রব্যটি গোল, লম্বা কিম্বা অন্যপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, তাহা বুঝা যাইতেছে না—এইরূপ অভিপ্রায়ই উক্ত 'আরূপ' শব্দটি দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। "আমি নীল (রূপ) বর্ণ দেখিতেছি"—এইরূপ বাক্যে যেমন পরিদৃশ্যমান বর্ণের একটি রূপ কল্পনা করা হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি শ্বেতিমা বা শ্বেতবর্ণের একটি আকার কল্পনা করা হইয়াছে।

আকাশে যখন আমরা চন্দ্র বা তারাগুলিকে দেখি তখনও তাহাদের বর্ণই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর এই বর্ণের অবস্থিতি-স্থান দেখিয়া তাহার আশ্রয় সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিতে পারি। নীলাকাশের নীলবর্ণই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। আকাশে বারিকণাসমূহ যখন বাষ্পাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না; কিন্তু যখনই তাহারা ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া একটি বর্ণ ধারণ করে, তখনই তাহাদের সেই বর্ণটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, দ্রব্যাশ্রিত ঘনীভূত বর্ণই সর্ব্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, এবং উক্ত বর্ণের সহায়েই আমরা দ্রব্যটিকে বুঝিতে পারি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন না কোন সম্বন্ধরূপ ব্যাপারই যে বিষয়জ্ঞানের কারণ হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ; এবং গুণ কোন দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া যে থাকিতে পারে না, ইহাও আমরা অনুভব করিয়া থাকি। গুণ নীলাদির সহিত যদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হয়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই গুণের জ্ঞান দ্রব্যজ্ঞানের পূর্ব্বে জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক আচার্য্যগণ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র দ্রব্যের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে; দ্রব্যাশ্রিত গুণের সহিত তাহার সংযুক্তসমবায়রূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ না হইয়া দ্রব্যাশ্রিত নীলাদি গুণের সহিত তাহার সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধ হইতে পারে না। অতএব, দ্রব্যজ্ঞানের পূর্ব্বে গুণের জ্ঞান হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত নহেন?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব—উৎপলাদি দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে নীল প্রভৃতি যে সকল গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের জ্ঞান যদিও সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ দ্বারাই

উৎপন্ন হয় এবং এই সম্বন্ধটি দ্রব্যেন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধের পরেই জাত হইয়া থাকে, তথাপি, উৎপলাদি দ্রব্যের সহিত লোচনেন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধটি অনেক ক্ষেত্রে এতই অস্পষ্ট থাকে যে, তাহার জ্ঞান আমরা বস্তুতঃ উপলব্ধি করিতে পারি না। সুতরাং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে গুণের জ্ঞান দ্রব্যজ্ঞানের পরে উৎপন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে অনেক সময়ে গুণজ্ঞানই আমাদের অন্তরে প্রথমে জন্মে বলিয়া মনে হয়। যে সকল আচার্য্য গুণের জ্ঞান দ্রব্যজ্ঞানের পূর্ব্বেই জন্মে বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ লৌকিক দৃষ্টিতেই বিচার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের কথাও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

কোন কোন আচার্য্যের মতে উচ্চারিত শব্দ আকাশের গুণ বটে, কিন্তু উচ্চারণের পূর্ব্বাবস্থায় শব্দ যখন স্ফোটরূপে অবস্থান করে, তখন সে আকাশের গুণ হয় না। বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এই মতের বিপক্ষেও নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্ম স্ফোটাত্মক শব্দগুলিও আকাশের গুণই বটে, এবং ইহারা সূক্ষ্মভাবে আকাশেই অবস্থান করে।

শব্দের দ্রব্যত্বের বিপক্ষে যেমন নানাবিধ যুক্তি দেখানো যায়, তেমনি তাহার গুণত্বের বিপক্ষেও যুক্তি দেখানো যাইতে পারে। ন্যায়মতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোনপ্রকার সম্বন্ধ না হইয়া কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। নৈয়ায়িকেরা এই সম্বন্ধকে ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যাপার মুখ্যতঃ দুই প্রকার; যথা—(১) লৌকিক এবং (২) অলৌকিক। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লৌকিক ব্যাপারের সাহায্যে এবং পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অলৌকিক ব্যাপারের সাহায্যে হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যাপার আবার ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা—

শব্দ গুণ কি না?

ব্যাপার

(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৪) সমবেত-সমবায়, এবং (৬) বিশেষণতা।

(১) সংযোগ — — দ্রব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ঐ দ্রব্যের সহিত চক্ষুঃ বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের ফলেই জন্মিয়া থাকে। একটি গরু বা ঘোড়া দেখিলেই আমরা তাহাকে জানিতে পারি। চক্ষুর সহিত উক্ত গরু বা ঘোড়ার সংযোগই ঈদৃশ জ্ঞানের প্রতি কারণ। অন্ধকার গৃহে কোন বস্তু

হাতড়াইয়াও আমরা উহার স্বরূপ অবগত হইয়া থাকি। এই ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যের সহিত আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধই ঐরূপ জ্ঞানের কারণ।

(২) সংযুক্ত-সমবায় —— গুণের প্রত্যক্ষের সময়ে সাক্ষাৎভাবে উহার সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না বলিয়া নৈয়ায়িকগণ মনে করেন। একটি টেবিল গোল অথবা চতুষ্কোণ, ইহা অবগত হইবার সময়ে প্রথমে উক্ত টেবিলের সহিত আমাদের নয়নেন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হওয়ার পর 'ইহা টেবিল' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। অতঃপর টেবিলের আকৃতি-সংক্রান্ত জ্ঞান জন্মিবার সময়ে টেবিলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়-রূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ টেবিল জ্ঞানের পরই তাহার আকারাদির জ্ঞান টেবিল জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জন্মিয়া থাকে। দ্রব্যাশ্রিত যে কোন গুণের প্রত্যক্ষ কালে এইরূপ সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধই তাদৃশ গুণের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় —— ইহাই নৈয়ায়িকদের মত।

(৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় —— চতুষ্কোণ টেবিলের চারিকোণে, কিংবা গোলাকার টেবিলের চারিদিক্ বেড়িয়া যদি কোন চিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ চিত্রাদির জ্ঞান জন্মে — চতুষ্কোণত্ব বা গোলত্বরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরে। ন্যায়মতে, এইরূপ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ — সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়রূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ, টেবিলের সহিত চক্ষুর সংযোগের পর টেবিল জ্ঞান জন্মিলে, অতঃপর সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধ দ্বারা টেবিলের চতুষ্কোণত্বাদি জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর, তাদৃশ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া এতাদৃশ চিত্রবিশিষ্টত্বাদির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

(৪) সমবায় — — যে স্থলে উল্লিখিত ত্রিবিধ ব্যাপার থাকে না, তাদৃশ স্থলেও কখন কখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে দেখা যায়। আমরা যেমন নিজের দেখা কোন বস্তুর অবস্থিতি সম্বন্ধে কাহাকেও সংশয়ান্বিত হইতে দেখিলে দৃঢ়তার সহিত বলি—"আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি" তেমনি নিজের কাণে শোনা কোন শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তখনও ঐ ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকি—"আমি ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি।" অতএব, দেখা বস্তুর অবস্থিতি সম্বন্ধে যেমন আমাদের দৃঢ় জ্ঞান জন্মে; শোনা শব্দের বেলাও ঠিক তেমনি দৃঢ় প্রত্যয় অবশ্য স্বীকার্য্য।

শব্দ দ্রব্য নহে ; সুতরাং কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বা

সংযোগ হওয়া অসম্ভব। শব্দ আকাশাশ্রিত গুণ বটে, কিন্তু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের সহিত আমাদের কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে পারে না; সুতরাং সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধও এখানে কার্য্যকরী নহে। এইরূপে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় রূপ ব্যাপার দ্বারাও শব্দের প্রত্যক্ষ হওয়া সর্ব্বথা অনুভব-বিরুদ্ধ; কারণ সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ না হইয়া সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন—শব্দ প্রত্যক্ষের সময়ে কেবলমাত্র সমবায়-সম্বন্ধই কার্য্যকরী হয় (৬৩)। অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সমবায়-সম্বন্ধের ফলেই আমরা শব্দ শুনিয়া থাকি।

সমবায়-সম্বন্ধ কোথায় কাহার কিভাবে হয়—এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—ঘট প্রভৃতি দ্রব্যের সমবায়-সম্বন্ধ হয় কপালাদিতে; গুণ এবং কর্ম্মের সমবায়-সম্বন্ধ হয় দ্রব্য-সমূহে; এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির সমবায়-সম্বন্ধ হইয়া থাকে (৬৪)। ন্যায় মতে সমবায় অর্থ 'নিত্য-সম্বন্ধ' (নিত্যসম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বম্)। যতক্ষণ কপাল (ঘটের অবয়ব) থাকে, ততক্ষণই ঘট থাকিতে পারে; কপাল বিনষ্ট হইলে, ঘটও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং কপালের সহিত ঘটের নিত্য-সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। ক্ষিতিতে গন্ধ, জলে শীতলতা, মাধুর্য্য ও তরলতা এবং অগ্নিতে উত্তাপ রূপ গুণ সমবায় সম্বন্ধেই থাকে। যতক্ষণ ক্ষিতি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাতে গন্ধ থাকিবেই। জল থাকিলে শীতলতা প্রভৃতি গুণ এবং অগ্নি থাকিলে উত্তাপরূপ গুণও অবশ্যই থাকিবে।

অতিরিক্ত শৈত্য প্রয়োগে জলকে জমাট বাঁধাইয়া এবং অগ্নিতে উত্তাপ-নিবারক মণিবিশেষ প্রবেশ করাইয়া যথাক্রমে তাহাদের তরলতা ও উষ্ণতা নষ্ট করা যায় বলিয়া আমরা আপাততঃ মনে করি বটে; কিন্তু বস্তুতঃ উক্ত গুণ দুইটি ঐ রকম সময়ে নষ্ট না হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে মাত্র। তাহাদের বাধক শৈত্যাধিক্য ও মণিবিশেষ অপসারিত হইলেই আবার তাহারা স্ব-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

দ্রব্যে কর্ম্মের অবস্থিতিও এই ভাবে সমবায়-সম্বন্ধদ্বারাই অনুভূত হয়। জীবিত প্রাণীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সমবায়-সম্বন্ধদ্বারাই প্রতীত হয়।

---

(৬৩) ... ..শব্দস্য সমবায়তঃ। —ভাষা পরিচ্ছেদ, কারিকা—৬০॥

(৬৪) ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণ-কর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
—ভাষাপরিচ্ছেদ; কারিকা—১১॥

যতক্ষণ সে জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া অবশ্যই চলিবে। গবাদি দ্রব্যে গোত্বরূপ জাতির, প্রতি-দ্রব্যাশ্রিত নীল বর্ণে নীলত্বরূপ জাতির এবং প্রতিটি কর্ম্মে কর্ম্মত্বরূপ জাতির অস্তিত্বও এই ভাবে সমবায়-সম্বন্ধদ্বারাই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকদের মতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়-সমবায়-সম্বন্ধদ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। আকাশস্থ শব্দাত্মক তরঙ্গ যখন আমাদের কর্ণশষ্কুলিতে প্রতিহত হয়, তখন বাধির্য্যাদি-দোষ-দুষ্ট না হইলে আমরা শব্দের শ্রবণ করিয়া থাকি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কর্ণশষ্কুলি তো চর্ম্মই; তবে ইহার ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হয়, বলিলেই তো চলে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব—কর্ণশষ্কুলি এবং চর্ম্মের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। শব্দের যদি ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে আমাদের দেহের যে কোন স্থানের চর্ম্মদ্বারাই আমরা শব্দ অনুভব করিতে পারিতাম। বায়ুর অনুভব আমরা এই ভাবে চর্ম্মদ্বারাই করিয়া থাকি; এবং তাহার ত্বাচ-প্রত্যক্ষও স্বীকার করি; কিন্তু শব্দের প্রত্যয় এই ভাবে হয় না। এমন একটি বিশেষ উপাদান দ্বারা কর্ণপটহ রচিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র তাহাতেই শব্দতরঙ্গ ধৃত এবং অনুভূত হইয়া থাকে। কর্ণশষ্কুলির কোন বিশেষ অংশে ইহার অনুভব হয় না; কিন্তু সমগ্র কর্ণশষ্কুলিই শব্দগ্রহণে কার্য্য করিয়া থাকে। যতক্ষণ শব্দগ্রহণযোগ্য এই কর্ণশষ্কুলি থাকিবে, ততক্ষণই শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার গ্রহণ হইবে; সুতরাং শব্দের সহিত এই কর্ণশষ্কুলিরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ এক হিসাবে নিত্যই বটে। এই কারণেই নৈয়ায়িকগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মা, আকাশ প্রভৃতি নিরবয়ব সূক্ষ্ম দ্রব্যের জ্ঞান কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগের ফলে হয় না; কিন্তু এই কারণে নৈয়ায়িকেরা আত্মা বা আকাশের দ্রব্যত্ব অস্বীকার করেন নাই। নিরবয়ব-দ্রব্যাশ্রিত সূক্ষ্ম গুণ শব্দের জ্ঞানও সংযুক্ত-সমবায়রূপ ব্যাপার দ্বারা জন্মিতে পারে না; কিন্তু এই কারণে শব্দের গুণত্ব স্বীকারের কোন হানি হয় না। শব্দ সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব বলিয়াই তাহার জ্ঞান ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। আত্মা বা আকাশের জ্ঞান যেমন অনুভূতির বিষয়, শব্দের জ্ঞানও তেমনি।

শব্দের শ্রবণের প্রতি কারণ অলৌকিক ব্যাপার নহে। অলৌকিক

ব্যাপারের সাহায্যে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমিতি-জ্ঞান। অনুমিতি জ্ঞানে পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু এই তিনটি বিষয়ের অবস্থিতি অত্যাবশ্যক। লিঙ্গ দেখিয়া লিঙ্গীর জ্ঞান হইলেই তাহাকে অনুমিতি জ্ঞান বলা হয়। শব্দের শ্রবণে কোনরূপ পক্ষ, সাধ্য বা হেতুজ্ঞান যেমন নাই, তেমনি কোনরূপ লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধও নাই। অতএব, শব্দের জ্ঞান লৌকিক ব্যাপারের সাহায্যেই হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। শব্দার্থনির্ণয়ে যে অনুমান কার্য্যকরী হয় না, মৎপ্রণীত "ধ্বনিবিচারঃ" নামক সংস্কৃত-ভাষাময় (অপ্রকাশিত) গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

কোন ব্যক্তি যখন একস্থানে দাড়াইয়া শব্দ উচ্চারণ করে, তখন শত হস্ত ব্যবধানে স্থিত অপর ব্যক্তি কেমন করিয়া সেই শব্দ শুনিতে পায়—এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ দুইটি পৃথক্ চিন্তাধারা প্রদর্শন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ পঞ্চানন তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থের ১৬৬ সংখ্যক কারিকায় উক্ত দ্বিবিধ চিন্তা-ধারার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নৈয়ায়িকগণও উক্ত দ্বিবিধ চিন্তাধারার বিশ্লেষণে বহু কথা বলিয়াছেন। উল্লিখিত দ্বিবিধ মত নিম্নে সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি; যথা—

(১) জলের মধ্যে আঘাত পড়িলে যেমন সেই আহত স্থানের চারিদিক্ বেড়িয়া একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং উক্ত তরঙ্গের চাপে তাহার পরেও ক্রমশঃ এক এক নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে থাকে; শব্দের উচ্চারণের বেলাও ঠিক তেমনি। প্রথমোচ্চারিত শব্দ তাহার দশদিক্ বেড়িয়া একটি নূতন শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতঃ স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর উক্ত তরঙ্গটি তাহার দশদিক্ বেড়িয়া আর একটি নূতন তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সম্প্রসরমাণ শব্দতরঙ্গ দশদিকে ধাবিত হইতে থাকে। যখন এই শব্দতরঙ্গ দূরবর্ত্তী ব্যক্তির কর্ণ পর্য্যন্ত পৌছে তখনই উল্লিখিত দূরবর্ত্তী ব্যক্তিটি সেই শব্দ শুনিতে পায়। জলতরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ মৃদু হইয়া অবশেষে একেবারে বিলোপপ্রাপ্ত হয়, শব্দতরঙ্গও তেমনি উচ্চারণ-কালীন বেগ অনুসারে তীব্রতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকে এবং দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই অধিক দূরে স্থিত ব্যক্তির কর্ণ পর্য্যন্ত কোন শব্দই স্বাভাবিক ভাবে পৌছে না। জলতরঙ্গের

বীচিতরঙ্গ ন্যায়

উৎপত্তি ও প্রসারের সঙ্গে শব্দতরঙ্গের উৎপত্তি ও বিস্তারের এই উপমাটি 'বীচিতরঙ্গ-ন্যায়' নামে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে বিখ্যাত।

(২) প্রথমোচ্চারিত শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার পরক্ষণেই তাহার ১০ দিকে ১০টি নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর উক্ত নবজাত শব্দগুলি তাহাদের প্রত্যেকের ১০ দিকে ১০টি করিয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করে এবং এইভাবে নবজাত শব্দগুলি ১০ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ একটি শব্দ দূরবর্ত্তী ব্যক্তির কর্ণে পৌছিলেই তাহার শব্দের শ্রবণ হয়। শব্দের উৎপত্তি ও বিস্তার সংক্রান্ত এই দ্বিতীয় যুক্তিটি 'কদম্বগোলক ন্যায়' নামে বিখ্যাত।

কদম্বগোলক ন্যায়

বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ উল্লিখিত মতদ্বয়ের মধ্যে প্রথম মতটিরই যুক্তিমত্তা স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় মতটিকে তাঁহারা গৌরবদোষে দুষ্ট মনে করেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় মত স্বীকার করিলে অনন্ত শব্দ স্বীকাররূপ কল্পনাগৌরব হয়। প্রথমোক্ত মতটী এইরূপ দোষে দুষ্ট নহে বলিযাই তাঁহারা মনে করেন (৬৫)। আমরাও যুক্তি এবং অনুভবের সাহায্যে উল্লিখিত প্রথমোক্ত বীচিতরঙ্গ-ন্যায়টীকেই সঙ্গত ও নির্ভরযোগ্য মনে করি। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষকগণও শব্দের তরঙ্গস্বরূপতা স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন।

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য মহর্ষি প্রশস্তপাদ তাঁহার ভাষ্যে বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ানুসারেই শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য ঢুণ্ডিরাজ

---

(৬৫) সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে॥
বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বগোলকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে॥
—ভাষাপরিচ্ছেদ; কারিকা—১৬৫—১৬৬॥

নমু মৃদঙ্গাদ্যবচ্ছেদেনোৎপন্নে শব্দে শ্রোত্রে কথমুৎপত্তিরত আহ—বীচীতি। আদ্যশব্দস্ত বহির্দ্দিশদিগবচ্ছিন্নোঽন্যঃ শব্দস্তেনৈব শব্দেন জন্যতে, তেন চাপরস্তদ্ব্যাপকঃ। এবং ক্রমেণ শ্রোত্রোৎপন্নো গৃহ্যত ইতি। কদম্বেতি—আদ্যশব্দাদ্ দশ দিক্ষু দশ শব্দা উৎপদ্যন্তে। ততশ্চান্যে দশ শব্দা উৎপদ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অস্মিন্ মতে কল্পনাগৌরবাদুক্তং কস্যচিন্মতে ইতি।
—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (ঐ ব্যাখ্যা)।

শাস্ত্রীও 'প্রশস্তপাদ-ভাষ্য-বিবরণম্' নামক গ্রন্থে মহর্ষির অনুরূপ অভিপ্রায়ের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন (৬৬)।

আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা শুনিতে পাই, তাহাকেই শব্দ বলিয়া থাকি। সকল মানুষের শ্রবণশক্তি সমান থাকে না। যে মৃদুশব্দ রাম নামক লোকটী তাহার শ্রবণশক্তির অল্পতাহেতু শুনিতে পায় না; শ্যাম নামক লোকটী তাহার শ্রবণশক্তির আধিক্য নিবন্ধন তাহা শুনিতে পায়। আবার নরেশ ইহার চেয়েও অধিকতর মৃদু শব্দ শুনিতে পারে; কারণ তাহার শ্রবণশক্তি আরও অধিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক ব্যক্তির কাছে যে শব্দ শ্রুত হয়, অন্য ব্যক্তির কাছে তাহাই অশ্রুত থাকে। অতএব, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কোন মানুষই যাহা শুনিতে পায় না, এমন শব্দও আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও দেখা যায়, তেমনি যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে অতি মৃদু শব্দকেও শ্রবণ করা যাইতে পারে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় মনীষিগণ এই শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া বহু সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমাদের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শব্দের বিভাগ

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ গভীর ধ্যান ও আধ্যাত্মিক গবেষণার সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমরা যে সকল শব্দ শুনিতে পাই, তাহার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম রূপে আরও তিনটি অবস্থা আছে। শব্দের এই অবস্থা চতুষ্টয়ের কথা যে অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরবর্ত্তীকালে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ শব্দের উল্লিখিত চারিটি অবস্থার মধ্যে সূক্ষ্ম অবস্থাটিকে স্ফোট নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণ বলেন যে, ইচ্ছাশক্তিপ্রেরিত দেহাভ্যন্তরস্থ কৌষ্ঠ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া আন্তর জ্ঞান বাক্ সংজ্ঞা লাভ

---

(৬৬) বেণুপর্ব্ববিভাগাদ্ বেম্বাকাশবিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ সংযোগ বিভাগ-নিষ্পন্নাদ্ বীচিসন্তানবচ্ছব্দসন্তান ইত্যেবং সন্তানেন শ্রোত্রপ্রদেশমাগতস্য গ্রহণং নাস্তি, পরিশেষাৎ সন্তানসিদ্ধিরিতি। —প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (শব্দপ্রকরণম্)

ন শ্রোত্রং শব্দদেশং গচ্ছতি নাপি শব্দঃ শ্রোত্রং তয়োর্নিষ্ক্রিয়ত্বাদপ্রাপ্তস্য চ গ্রহণং ন স্যাদিন্দ্রিয়াণাং প্রাপ্যকারিত্বনিয়মাৎ, অন্যথা তূপলব্ধির্ন স্যাদিতি বীচিতরঙ্গন্যায়েন শব্দসন্তান-কল্পনাবশ্যকীতার্থঃ। —ঐ, ভাষ্যবিবরণম্ (ঢুণ্ডিরাজকৃতম্)

করতঃ যথাক্রমে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম এবং স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় (৬৭)। উক্ত অবস্থাগুলিতে তাহার নাম যথাক্রমে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। কেবলমাত্র এই বৈখরীরূপিণী বাক্‌ই কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতির সংযোগ বা বিভাগের সাহায্যে আমাদের শ্রোত্রপথের পথিক হয়। শব্দের পূর্ব্বোক্ত তিনটি অবস্থায় সে আমাদের শ্রবণগোচর হয় না। স্ফোটবাদের আলোচনা-কালে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণগণ প্রথমতঃ শব্দকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি শ্রবণযোগ্য এবং অপরটি শ্রবণযোগ্য নহে। যে শব্দ শ্রবণযোগ্য নহে, তাহার মধ্যেও তিনটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় মনীষিগণের চিন্তাশক্তি কত গভীর ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাই।

সম্প্রতি রেডিও-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিরা কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র নিজেদের তীক্ষ্ণ মনীষাদ্বারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আধুনিক শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহারই সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন।

কেবল শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধেই নহে, জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও সুপ্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর পরে যান্ত্রিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক তাহারই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। উদ্ভিদের প্রাণবত্তা প্রমাণ করিয়া যে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু অমরকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনিও ইহার তথ্য নির্ণয়ের জন্য আর্য্য ঋষিগণের নিকটই ঋণী; কারণ, মনু, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের উক্তি হইতেই তিনি এই তত্ত্বকথা জানিতে পারিয়া ইহার প্রমাণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিবার ফলে পাশ্চাত্ত্য শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আমরা যে সকল শব্দ শুনিতে পাই, তাহা ছাড়াও শব্দের আর একটি সূক্ষ্ম অবস্থা আছে।

রেডিও বিজ্ঞানের মত

তাঁহারা শ্রব্য-(audible) শব্দরূপে একপ্রকার শব্দের উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, শ্রব্য নহে এমন (inaudible) এক প্রকার

(৬৭) —বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড—১১৩ শ্লোক।

সূক্ষ্মশব্দও আছে। বিখ্যাত রেডিও-বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য ফ্রেডারিক এম্যান্স টেরম্যান (Fredarick Emmans Terman) তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত "রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারিং" (Radio Engineering) নামক গ্রন্থে শ্রব্যশব্দ (audible sound) সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি শব্দের বিশেষণরূপে 'শ্রব্য' শব্দটিকে ব্যবহার করায়, এতদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য একপ্রকার শব্দের অস্তিত্বও যে তিনি স্বীকার করেন, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। তবে, এই শ্রব্যেতর শব্দের অবান্তর-বিভাগ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য শব্দ-বিজ্ঞান-বিদ্‌দের গবেষণা এখনও বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

ভারতীয় মনীষিগণ যাহাকে শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থা বলিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের স্বীকৃত শ্রব্যেতর (inaudible) শব্দ তাহা হইতে অভিন্ন—একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। শব্দের স্বরূপ-সম্বন্ধেও প্রাচীন-ভারতীয় বৈয়াকরণগণ আধ্যাত্মিক গবেষণাদ্বারা যে তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, স্থূল যান্ত্রিক গবেষণা দ্বারা আধুনিক শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহাকেই সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে শব্দের স্বরূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করা যায়,

**পতঞ্জলির মত**

উচ্চারণাদি প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শ্রবণাবচ্ছিন্ন আকাশে উপনীত তাদৃশ তরঙ্গ-বিশেষই শব্দ নামে অভিহিত হয় (৬৮)। ইহাদ্বারা মহর্ষি শ্রব্যশব্দেরই লক্ষণ করিয়াছেন। আচার্য্য ফ্রেডারিক তাঁহার "রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারিং" নামক গ্রন্থে শ্রব্যশব্দের যে লক্ষণ দিয়াছেন, তাহাও কার্য্যতঃ উল্লিখিত লক্ষণ হইতে অভিন্ন (৬৯)।

আচার্য্য ফ্রেডারিক বলিয়াছেন যে, শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে,

**বিজ্ঞান-মত**

এমন যান্ত্রিক স্পন্দনই শব্দ নামে অভিহিত হয়। যন্ত্র শব্দে মানুষের কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি অথবা ঘণ্টা ইত্যাদিকে বুঝানোই আচার্য্যের অভিপ্রেত। শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, আচার্য্য ফ্রেডারিকের মতে তাহা শ্রব্যশব্দ নহে। যাহা শ্রব্য নহে, তাহাকে

---

(৬৮) শ্রোত্রোপলব্ধিবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য প্রয়োগেনাভিজ্বলিতঃ আকাশদেশঃ শব্দঃ।

—মহাভাষ্য ( অনুদিৎসূত্র-ভাষ্য )

(৬৯) Sound is a mechanical vibration lying within the frequency range to which the ear responds.

Radio—Engineering. Chapter—18; Page—857.

শ্রবোত্তরই বলিতে হইবে। তাদৃশ শ্রবোত্তর শব্দ (inaudible sound) যে শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থা ইহা সহজেই অনুমেয়।

সুবিখ্যাত মনীষী হার্ব্বে ফ্লেচার (Harvey Fletcher) তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদ্বারাও উল্লিখিত মতই সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা আচার্য্য ফ্লেচারের দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে পারি ; যথা—

(১) Loudness, Pitch, and Timber of Musical Tones and their Relation to the Intensity, the Frequency, and the Overtone Structure.

(২) Speech and Hearing.

আধুনিক শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শব্দের দ্বিবিধ অবস্থা আছে। যে অবস্থায় শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাই শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থা। আকাশে যে প্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি হইলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই, সেইপ্রকার তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গ (sound waves) বলা হয় ; আর সূক্ষ্মাবস্থায় শব্দ যাদৃশ-তরঙ্গরূপে অবস্থান করে, তাদৃশ তরঙ্গকে বলা হয় 'বৈদ্যুতিক তরঙ্গ' (electrical waves)। আধুনিক যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে এবং শব্দতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা চলে। শব্দ-তরঙ্গ হইতে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভব হয়, কেবলমাত্র তাদৃশ বৈদ্যুতিক তরঙ্গকেই শব্দতরঙ্গে পরিণত করা যায়।

আকাশস্থ তরঙ্গবিশেষই যে শব্দ, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শব্দতরঙ্গ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়—ইহাই সাধারণ অভিমত। প্রাচীন-ভারতীয় শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, কেবল স্থূল অবস্থায়ই নহে, সূক্ষ্ম অবস্থায়ও শব্দ বায়ুদ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে।

**বায়ু শব্দবহ**

আচার্য্য নাগেশের নামে প্রচলিত পরমলঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে প্রাচীন আচার্য্যগণের এই অভিমত স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (৭০)।

---

(৭০) মূলাধারস্থ পবন-সংস্কারীভূতা মূলাধারস্থা শব্দব্রহ্মরূপা স্পন্দশূন্যা বিন্দুরূপিণী পরা বাগুচ্যতে। নাভিপর্য্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনাভিব্যক্তা মনোগোচরীভূতা :পশ্যন্তী বাক্ উচ্যতে। এতদ্ দ্বয়ং বাগ্ ব্রহ্মযোগিনাং সমাধৌ নির্ব্বিকল্পক-সবিকল্পক-জ্ঞানবিষয় ইত্যুচ্যতে। ততো হৃদয়-পর্য্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনাভিব্যক্তা তত্তদর্থবাচকশব্দস্ফোটরূপা শ্রোত্রগ্রহণাযোগ্যত্বেন সূক্ষ্মা

সম্পূর্ণ বায়ুহীন স্থানে শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না দেখিয়া কোন কোন আচার্য্য বায়বীয় তরঙ্গ-বিশেষকেই শব্দতরঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরীক্ষা-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি কক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করিয়া যদি তাহাতে একটি বৃহৎ ঘণ্টাও অনবরত সঞ্চালিত করা হয়, তথাপি কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বায়ুহীন স্থানে শব্দতরঙ্গের উদ্ভব হইলেও বায়ুর অভাবে তাহা কোনদিকে অগ্রসর হইতে পারে না; এবং ফলে শ্রবণসকাশে শব্দতরঙ্গের উপস্থিতি না হওয়ায় শব্দ শ্রুত হয় না—ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত।

প্রথম সংশয়

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উল্লিখিত বায়ুশূন্যস্থানে যে শব্দ তরঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহার প্রমাণ কি? বায়ুশূন্য গৃহে ঘণ্টায় অভিঘাত হইলেও শব্দের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয় না, এবং ফলে শব্দও শ্রুতি-গোচর হইতে পারে না—এইরূপ বলিলে কি দোষ হয়? জলের উপর বায়ুর আঘাত পড়িলেই জল-তরঙ্গের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। উক্ত জলতরঙ্গকে বায়ু কেবল বহনই করে না; কিন্তু উৎপন্নও করিয়া থাকে। উক্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া বায়ুকে শব্দতরঙ্গের নিমিত্তকারণরূপে স্বীকার করাই কি অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত নহে?

সংশয় খণ্ডন

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে আমরা বলিব—বায়ু নিজেই জল-তরঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে; কারণ, বায়ুর অভাবেও অন্য যে কোন প্রকার আঘাতের ফলে জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। বায়ুর বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই বেগদ্বারা জলে যে আঘাত পড়ে, তাহারই ফলে তরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। বায়ুর অতি মৃদু অবস্থায় যখন জলাশয়ের জল সম্পূর্ণ স্থির থাকে, সেই সময়েও মনুষ্যের হস্তপদাদি কিংবা কাষ্ঠ, লোষ্ট্র প্রভৃতির আঘাতের ফলে জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। উক্ত পদার্থগুলিতে সঞ্চালনের দ্বারা যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাই তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সুতরাং যে কোন প্রকারের বেগই জলতরঙ্গের স্রষ্টা; কিন্তু বায়ুই তাহার স্রষ্টা নহে।

মনীষিগণ বলিয়াছেন—বায়ু শব্দতরঙ্গের বাহক। ইহা কি সত্য?

---

জপাদৌ বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যা মধ্যমা বাগুচ্যতে। তত আস্যপর্য্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনোর্দ্ধ্বাক্রামতা চ মূর্দ্ধানমাহত্য পরাবৃত্য চ তত্তৎস্থানেষ্বভিব্যক্তা পরশ্রোত্রেণাপি গ্রাহ্যা বৈখরী বাগুচ্যতে।

—পরমলঘুমঞ্জুষা।

আমার মনে হয়, জলীয় বা শাব্দ কোন তরঙ্গকেই বায়ু নিজে বহন করে না। বায়ুর স্থির অবস্থায় যখন জলে তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, তখন আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বেগই তরঙ্গকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। বায়ুর বেগও জলতরঙ্গকে ঠেলিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বায়ুই তরঙ্গের বাহক। বস্তুতঃ যে কোন প্রকার বেগই তরঙ্গের স্রষ্টা এবং বাহক। শব্দতরঙ্গের বেলাও এই নিয়মই খাটিবে। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ বা দ্রব্যদ্বয়ের বিভাগের ফলে যে বেগের উদ্ভব হয়, তাহাই আকাশে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং বেগই সেই তরঙ্গকে নানাদিকে বহন করিয়া লইয়া যায়।

স্বমতে বেগ শব্দবহ

প্রতিকূল বায়ুর বেগ পূর্ব্বোক্ত বেগের গতিরোধ করিয়া শব্দের গতি থামাইয়া দিতে এবং অনুকূল বায়ুর বেগ তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া বহু দূরে লইয়া যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ বায়ুহীন গৃহে ঘণ্টায় আঘাত হইলেও তাহাদ্বারা অতি অল্প বেগের সঞ্চার হওয়ায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু আসিয়া সেই বেগকে বর্দ্ধিত করিতে না পারায় শব্দ শ্রুত হয় না; সুতরাং তরঙ্গ-বিশেষের শব্দত্ব স্বীকার করিবার পরও এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে যে, উক্ত তরঙ্গকে আকাশে উৎপন্ন না বলিয়া বায়বীয় তরঙ্গরূপে স্বীকার করিলে দোষ কি? শিক্ষাসূত্রকার

দ্বিতীয় সংশয়

বলিয়াছেন—বায়ুই শব্দরূপে পরিণত হয় (বায়ুরাপদ্যতে শব্দতাম্)। আবার ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরাও দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুরই শব্দরূপে প্রকাশ লাভ করার কথা স্বীকার করিয়াছেন (বায়ুঃ শব্দত্বং প্রতিপদ্যতে)। সুতরাং শব্দকে বায়বীয় তরঙ্গ বলিলে উক্ত মনীষিগণের মতটিও স্বীকার করা হয়।

এই সংশয়ের উত্তরে আমরা বলিব—শব্দ যদি বায়বীয় তরঙ্গ হইত, তাহা

সংশয় খণ্ডন

হইলে আমরা চর্ম্মদ্বারা তাহাকে অনুভব করিতাম, কর্ণদ্বারা নহে। জলকে যেমন আমরা চক্ষুর্দ্বারা দেখি এবং হস্তদ্বারা স্পর্শ করি জলীয় তরঙ্গগুলিকেও তেমনি দেখিতে এবং

শব্দ বায়বীয় নহে

স্পর্শ করিতে পারি। বায়ুর বেগ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন আমরা চর্ম্মদ্বারা উহা অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু শব্দকে কেহ কদাপি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিতে পারে নাই। শব্দ যে বায়বীয় তরঙ্গ বা বায়ুর বিকার নহে—ইহাই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরাও কেহই শব্দের বায়ুস্বরূপতা স্বীকার করেন

নাই। যদিও বাক্যপদীয় গ্রন্থে, ব্রহ্মকাণ্ডের ১০৯ সংখ্যক শ্লোকে আচার্য্য বায়ুর শব্দরূপে পরিণত হওয়ার কথা বলিয়াছেন (৭১); তথাপি ইহা তাঁহার নিজের মত নহে। উক্ত শ্লোকে তিনি শিক্ষাসূত্রকারের মতটি প্রকাশ করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরির মত

ভর্ত্তৃহরির নিজের মত জানিতে হইলে আমাদিগকে ব্রহ্মকাণ্ডের ১১৩ এবং ১১৪ সংখ্যক শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে আচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন—জ্ঞান সূক্ষ্মশব্দরূপে (মনুষ্য প্রভৃতির) অন্তরে অবস্থান করে, এবং নিজের প্রকাশের জন্য শব্দরূপে নিবর্ত্তিত হয়। উক্ত সূক্ষ্ম শব্দরূপী জ্ঞানই মনন-স্বরূপতা লাভ করিয়া দেহাভ্যন্তরস্থ তেজোদ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে (৭২)। এখানে ভর্ত্তৃহরি বায়ু হইতে শব্দের ভিন্নত্ব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন।

আচার্য্য নাগেশও তাঁহার 'লঘুমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থে বায়ুকে শব্দের প্রেরক-রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। লঘুমঞ্জুষাতে তিনি বলিয়াছেন—মূলাধারস্থ পবন-সংস্কারের দ্বারা শব্দব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন (বর্ত্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহাদ্বারা বায়ুর শব্দত্ব স্বীকার বুঝায় না।

নাগেশের মত

ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—আন্তর জ্ঞানই সূক্ষ্ম বাগ্‌রূপে অবস্থান করে। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। ভর্ত্তৃহরির এই কথাটি স্বীকার করিলে শব্দ এবং অর্থ বস্তুতঃ অভিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দ ও অর্থ যে বস্তুতঃ ভিন্ন ইহা নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং উল্লিখিত বাক্যে ভর্ত্তৃহরি জ্ঞান ও শব্দের যে তাদাত্ম্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা নাগেশভট্ট-কথিত ব্যাবহারিক তাদাত্ম্যই

শব্দ জ্ঞানস্বরূপ নহে

---

(৭১) লব্ধক্রিয়ঃ প্রযত্নেন বক্তুরিচ্ছানুবর্ত্তিনা।
স্থানেষ্বভিহতো বায়ুঃ শব্দত্বং প্রতিপদ্যতে॥
—বাক্যপদীয়ম্; ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক—১০৯॥

৭২) অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥
স মনোভাবমাপদ্য তেজসা পাকমাগতঃ।
বায়ুমাবিশতি প্রাণমথাসৌ সমুদীর্য্যতে।
—বাক্যপদীয়ম্, ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক—১১৩—১১৪॥

হইবে, বাস্তব তাদাত্ম্য নহে। শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটি বাস্তব নহে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বাচ্য-বাচক বা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বাক্ বা শব্দ যদি আন্তর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই আন্তর জ্ঞানের আশ্রয় একটি অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং জ্ঞান বা শব্দের আধেয়তা নিবন্ধন তাহার নিত্যতা স্বীকার করা চলে না। তাহা ছাড়া শব্দ যদি জ্ঞানস্বরূপ হইত, তাহা হইলে অচেতন পদার্থ হইতে শব্দের উৎপত্তি সম্ভব হইত না। যষ্টি ভাঙ্গিলে যে শব্দ হয়, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি, কিন্তু যষ্টির মধ্যে কোনরূপ জ্ঞানের অবস্থিতি সম্ভব নহে। মেঘ অচেতন পদার্থ ; সুতরাং তাহাতে কোনরূপ জ্ঞান থাকা অসম্ভব ; অথচ মেঘদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কথা চিন্তা করিলে অন্ততঃ নিরর্থক শব্দগুলি যে জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে শব্দের একদেশের জ্ঞানাস্বরূপতা খণ্ডিত হওয়ায় ইহার দৃষ্টান্তে শব্দমাত্রেরই জ্ঞান-স্বরূপতা অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। এক হাড়ি ভাতের মধ্যে একটিকে টিপিলেই যেমন ভাতগুলি সিদ্ধ হইয়াছে কি না বুঝা যায়, এক্ষেত্রেও তেমনি নিরর্থক শব্দগুলির পরীক্ষাদ্বারা জানা যায় যে, কোন শব্দই জ্ঞানস্বরূপ নহে।

আধুনিক শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু গবেষণার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শব্দতরঙ্গের প্রগাঢ়তাই শব্দের উচ্চতার কারণ, এবং ইহা শব্দতরঙ্গের বিস্তৃতির উপরই নির্ভরশীল (৭৩)। বহু লোক যখন একসঙ্গে কোন শব্দ উচ্চারণ করে, তখন তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চারিত বিভিন্ন শব্দের তরঙ্গগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, এবং এইরূপ প্রগাঢ়তাপ্রাপ্ত তরঙ্গগুলির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতর শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে। যদিও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণই ধ্যানবলে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি এতদিন ইহা যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার কবিতে পাবে নাই। সম্প্রতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হওয়ায়

উচ্চ ও অনুচ্চ শব্দ

(73) Sound-intensity is a measure of loudness and depends on amplitude of the sound waves. —Hand-Book of Wireless Telegraphy ( 1938 ) by Admiralty (voll 11. Sec-N)

সকলেই ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই আবিষ্কারের ফলে লাউড্‌স্পীকার বা শব্দের উচ্চতা-বিধায়ক যন্ত্র, গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

লাউড্‌স্পীকার :—শব্দবিজ্ঞানবিদ্‌গণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন—মানুষ যখন শব্দ উচ্চারণ করে, তখন সেই শব্দতরঙ্গ তাহার মুখের সম্মুখে সৃষ্ট হইয়াই সমানবেগে দশদিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। অতএব তাঁহাদেব মনে হইল, যদি কোন উপায়ে এই তরঙ্গটিকে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে মাত্র একদিকে প্রধাবিত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শব্দের উচ্চারণ উচ্চতর হইবে। পরীক্ষাস্বরূপ একটি দীর্ঘ শৃঙ্গাকার যন্ত্র মুখে লইয়া শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেখা গেল যে, শৃঙ্গের মধ্য দিয়া প্রধাবিত শব্দের উচ্চারণ সত্যই উচ্চতর হইতেছে। ইহারই ফলে শৃঙ্গাকার লাউড-স্পীকার (Horn-type Loud-speaker) যন্ত্রের উদ্ভব হইল। অতঃপর আরও নানাবিধ পরিকল্পনার সাহায্যে অন্যান্য নূতন পদ্ধতির আরও অনেক প্রকার লাউড্‌স্পীকার যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—(১) Cone Diaphragm (২) Moving Coil (৩) Moving Iron প্রভৃতি লাউড্‌স্পীকার যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আচার্য্য এডমিরেল্টি ( Admiralty ) তাঁহার "Hand-book of Wireless Telegraphy (voll—ll)" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। শব্দ যদি তরঙ্গস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত উপায়ে লাউড্‌স্পীকার যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে উচ্চতর করা সম্ভব হইত না।

গ্রামোফোন :—বৈজ্ঞানিকগণ উল্লিখিত প্রকারে শব্দের স্বরূপ অবগত হওয়ার ফলেই উচ্চারিত শব্দের স্পন্দনগুলি যন্ত্রের সাহায্যে গ্রামোফোনের রেকর্ডে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রামোফোনের পিনটি রেকর্ডের উপর স্থাপন করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে সঞ্চালন করিলে উক্ত পিনের আঘাতে রেকর্ডে ধৃত শব্দতরঙ্গগুলি স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হয়। যে শব্দের তরঙ্গ ধৃত হইয়াছিল, এই স্পন্দনের ফলে সমীপস্থ আকাশে তাদৃশ তরঙ্গই পুনরায় আবির্ভূত হইয়া আমাদের শ্রবণ পথের পথিক হয় (৭৪)। যে যন্ত্রের

(৭৪) A Gramophone needle is secured as shown and as it runs in the groove on the record, it produces corresponding vibratlons of the armature about its pivot,

—Admiralty. "Hand-book of Wireless Telegraphy( 1938)
voll II. Sec "(N)"

সাহায্যে আমরা এইভাবে শব্দ সংরক্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে প্রকাশ করিতে পারি, তাহারই নাম গ্রামোফোন (১৫)। শব্দ তরঙ্গময় হওয়ার ফলেই এইভাবে তাহাকে রেকর্ডে ধরিয়া রাখা এবং পুনরায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

টেলিফোন——টেলিফোন নামক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বহু দূরদেশে শব্দ প্রেরণ করিতে পারি। এই যন্ত্রের দুইটি বিশেষ অঙ্গ আছে। টেলিফোন করিবার সময় আমরা মুখের কাছে একটি যন্ত্র রাখিয়া শব্দ উচ্চারণ করি। বস্তুতঃ, উহা একটি লাউডস্পীকার যন্ত্র। এই যন্ত্র আমাদের উচ্চারিত শব্দকে বহুদূরে অবস্থিত একটি বিশেষ যন্ত্রে ঠেলিয়া লইয়া যায়। যাওয়ার পথে উক্ত শব্দতরঙ্গ সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু টেলিফোন রিসিভার নামক যন্ত্রটিকে পাওয়া মাত্রই সে আবার শব্দতরঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। টেলিফোনের শব্দ শুনিবার জন্য আমরা যে যন্ত্রটিকে কাণের উপর স্থাপন করি, তাহারই নাম 'টেলিফোন রিসিভার' বা শব্দ-সংগ্রাহক যন্ত্র। এই যন্ত্রটির অভ্যন্তরে একটি কৃত্রিম ঝিল্লী ( diaphragm ) সংস্থাপিত থাকে এবং সমাগত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের চাপে উহা স্পন্দিত হইয়া উল্লিখিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গটিকে শব্দতরঙ্গে পরিণত করিয়া দেয়। তখন এই তরঙ্গরূপ শব্দই আমাদের কর্ণপটহে শ্রুত হয়। আচার্য্য ফ্রেডারিক তাঁহার "রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (১৬)।

---

(১৫) A gramophone pick-up is essentially a device for converting the mechanical vibrations of a gramophone needle into corresponding electrical oscillatory voltages which are capable of being subsequently amplified and reproduced by loud-speakers in the form of sound-(Do)

(১৬) The term 'telephone receiver' is used here to denote those devices which convert electrical energy into sound-waves and which are held against the ear, when used.

– Radio Engineering, Ch. 18. Page – 883.

All types of telephone-receivers make use of a diaphragm that is effectively sealed to the ear by means of a vented cap, so that as the diaphragm vibrates, the pressure of the small quantity of air trapped between the diaphragm and the ear-drum varies in accordance with the displacement of the diaphragm.

—Radio Engineeing, Ch. 18. Page—883.

শব্দ যদি তরঙ্গময় না হইত, তাহা হইলে টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে এই ভাবে দূরদেশে প্রেরণ করা সম্ভব হইত না।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও যে "তরঙ্গ—বিশেষই শব্দ" এইরূপ একটি মত প্রচলিত ছিল, বিভিন্ন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। শিক্ষাসূত্রকার "বায়ুরাপন্নতে শব্দতাম্" সূত্রটি দ্বারা বায়বীয় তরঙ্গ-বিশেষকেই শব্দের স্বরূপ হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও যে আকাশস্থ তরঙ্গ-বিশেষেরই শব্দত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৭৭)। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ শব্দের উৎপত্তি ও বিস্তার বুঝাইবার জন্য যে বীচি-তরঙ্গ ন্যায়ের কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা বস্তুতঃ শব্দের তরঙ্গ-স্বরূপতাই স্বীকৃত হইয়াছে। শবরস্বামী প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ শব্দের বায়বীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু শব্দের বাহকরূপে এক প্রকার বায়বীয় তরঙ্গ স্বীকার করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। মীমাংসকদের এতৎসংক্রান্ত উক্তিগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

তরঙ্গই শব্দ

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, একদিকে প্রাচীন ভারতের কোন কোন ঋষির সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং অপরদিকে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণের বিবিধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া—এই উভয়ের সাহায্যেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শব্দ তরঙ্গ-বিশেষ-স্বরূপ। আমরাও যুক্তি এবং অনুভবের সাহায্যে আকাশজাত তরঙ্গ-বিশেষকেই শব্দের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই তরঙ্গ বায়ুস্বরূপ নহে, কিন্তু বায়ু এই শব্দতরঙ্গের বাহক।

স্বমতে শব্দস্বরূপ

প্রাচীন ভারতীয় আচার্য্যগণের মধ্যে অধিকাংশই স্বীকার করিয়াছেন যে, শব্দ বায়বীয় তরঙ্গ বা বায়ুর বিকার নহে। সুতরাং শিক্ষাসূত্রকার প্রভৃতি দুই একজন আচার্য্যের সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়ে আমাদের মতের মিল না থাকিলেও অধিকাংশ আচার্য্যের সঙ্গেই আমাদের মতের মিল থাকিয়া যাইতেছে, এবং আমাদের বাস্তব অনুভবটি ও যথাযথভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

---

(৭৭) পাদটীকা—৬৮।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## শব্দ নিত্য না অনিত্য

শব্দ নিত্য না অনিত্য?—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর্য্য ঋষিগণের এতৎ-সংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় আবশ্যক। বিভিন্ন শাস্ত্রে শব্দের নিত্যতার পক্ষে ও বিপক্ষে এত অধিক উক্তি ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে আর্য্য ঋষিগণের বহুমুখী মনন-শীলতার সূক্ষ্ম পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের চিন্তার গভীরতা দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল সিদ্ধান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই নহে; চিন্তার মৌলিকতা, গভীরতা এবং ব্যাপকতার জন্যও এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা একান্ত আবশ্যক। শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শাস্ত্রসমূহে এই সম্বন্ধে যে সকল উক্তি ও যুক্তি আছে, আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনে যত্নবান হইব।

### শ্রুতি

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন (১)। ইহা হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট সব কিছুই অনিত্য। শব্দ যে ব্রহ্ম নহে, তাহা শব্দব্রহ্মবাদের আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইবে।

শব্দ যে আকাশের গুণ, ইহা শ্রুতিতেও স্বীকৃত হইয়াছে (২)। শব্দ আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান—ইহাও এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। আকাশ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান শব্দও নিত্য হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মরূপ

---

(১) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেব [ ছান্দোগ্য; ৬ষ্ঠ প্রপাঠক; পৃ—৩৮৭ (জীবানন্দ সংস্করণ) ]

ব্রহ্ম বা হ ইদমগ্র আসীদেকমেব [ বৃহদারণ্যক; ব্রহ্মকাণ্ড ১।৪।১১ ]

(২) আকাশেন শৃণোতি, আকাশেন প্রতিশৃণোতি।......

[ ছান্দোগ্য, ৭ম প্রপাঠক, পৃ—৫০১ (জীবানন্দ সংস্করণ] )

ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে (৩)। আকাশের উৎপত্তি-জ্ঞাপক এই শ্রুতিই আকাশের অনিত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোন কোন শ্রুতিতে আবার আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৪)। আকাশ যদি ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যতাও স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ আকাশ ব্রহ্ম কি না, তাহাই সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি।

আকাশে শব্দরূপ গুণ বিদ্যমান; কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ। ইহা দ্বারাও ব্রহ্ম হইতে আকাশের পার্থক্যই প্রমাণিত হয়। অন্যান্য শ্রুতিতেও আকাশ এবং ব্রহ্মের পার্থক্য স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে বলা হইয়াছে যে, দহরাকাশে (হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত আকাশে) যাঁহাকে অন্বেষণ করা যায়, তিনিই ব্রহ্ম (৫)। বৃহদারণ্যকোপনিষদে "আকাশ কাহার মধ্যে ওতপ্রোত?"—গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "আকাশ ব্রহ্মপদার্থে ওতপ্রোত" (৬)। আকাশ নিজেই যদি ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকে উল্লিখিত উক্তিগুলি থাকিত না।

যে সকল শ্রুতিতে আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে ব্রহ্ম শব্দটি গৌণার্থে প্রযুক্ত। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে ব্রহ্মের সত্তা অনুভব করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তুমাত্রকেই গৌণ ব্রহ্ম শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন (৭)। এই কারণেই উপনিষদের কোন কোন স্থানে ঐরূপ শ্রুতি দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে ঐরূপ অর্থেই আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তথায় তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন—

---

(৩) তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ (তৈত্তিরীয়; ২য় অধ্যায় ২।১।৩॥)

(৪) ওঁ খং ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক; ব্রহ্মকাণ্ড; ৫ম অধ্যায়; ১ম ব্রাহ্মণ)

আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম [তৈত্তিরীয়; ৬ষ্ঠ অনুবাক ১।৬।২]

(৫) অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি (ছান্দোগ্য; ৮ম প্রপাঠক; পৃ—৫২৮—২৯)

(৬) তস্মিন্ন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি (বৃহদারণ্যক; ব্রহ্মকাণ্ড—৩।৮।১১)

(৭) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য, পৃ ২০০—২০১)

আকাশকে যে ব্রহ্ম বলা হয়, তাহার কারণ, ব্রহ্ম আকাশেরই মত অশরীরী এবং সূক্ষ্ম ; বস্তুতঃ আকাশ ব্রহ্ম নহে (৮)। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "ওঁ খং ব্রহ্ম" (ব্রহ্মকাণ্ড, ৫ম অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ) এই শ্রুতির ব্যাখ্যায়ও আচার্য্য শঙ্কর স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দটি 'বৃহৎ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৯)। 'খং ব্রহ্ম' কথাটির অর্থ 'আকাশ অতি বিস্তৃত'—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের অভিমত। মুখ্য এবং গৌণ দ্বিবিধ অর্থেই যে শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার আছে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ" (বৃহদারণ্যক, ব্রহ্মকাণ্ড ১।৫।৩ প্রভৃতি শ্রুতি হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়।

"অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ" (বৃহদারণ্যক, ব্রহ্মকাণ্ড ১।৫।৩) এই শ্রুতিতে যে আত্মা বা ব্রহ্মকে বাঙ্ময় বলা হইয়াছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, বাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব অপরের কাছে বিশ্লেষণ করা যায়। বস্তুতঃ বাক্য বা শব্দই ব্রহ্ম নহে। বাক্য বা শব্দই যদি ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে আর ঐ শ্রুতিতে তাহাকে মনোময় বা প্রাণময় বলিয়া উল্লেখ করা হইত না। 'মনোময়' শব্দটি দ্বারা শ্রুতি জানাইয়াছেন যে, মনোদ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। 'প্রাণময়' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণ যেমন জীবদেহে সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহাতে লাবণ্য, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি বিধান করেন, আত্মা বা ব্রহ্মও তেমনি সকলের অগোচরে বিদ্যমান থাকিয়া সকল কার্য্যের জনক হন। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" প্রভৃতি অন্যান্য শ্রুতি-বাক্যদ্বারাও ইহাই জানানো হইয়াছে।

অতএব দেখা-যাইতেছে যে, শ্রুতি অনুসারে শব্দ এবং আকাশ উভয়েই ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত ; সুতরাং অনিত্য। যদিও কোন কোন শ্রুতিতে বেদের অপৌরুষেয়তা এবং নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি তাহাকে ব্যাবহারিক বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—বেদসমূহ বিরাট্ পুরুষের নিঃশ্বাস-স্বরূপ। আমার বিবেচনায় উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নিম্নপ্রকার—

---

(৮) আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম [ ছান্দোগ্য ; ৮ম প্রপাঠক ; পৃ—৬১৩ ( জীবানন্দ সংস্করণ ]।

আধ্যানাম্নাকাশো বৈ নাম শ্রুতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা। আকাশ ইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ স চাকাশো নাম।—ঐ শাঙ্করভাষ্য।

(৯) ব্রহ্মশব্দো বৃহদ্বস্তুমাত্রাস্পদোঽবিশেষিতো বিশেষ্যতে খং ব্রহ্মেতি। —শাঙ্করভাষ্য।

পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য জগতে যত মানুষ বা বুদ্ধিমান প্রাণী আছেন, তাঁহাদের সমষ্টি বিরাট্ পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন। ঐ সকল মানুষ বা বুদ্ধিমান প্রাণীর মধ্যে যখন যে সত্য উপলব্ধ হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা শিষ্যপরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে উপলব্ধ এই সকল সত্যই বেদ নামে পরিচিত। কোন দিন হইতে এইরূপ সত্য-জ্ঞানের সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে এবং কোন দিন এই জ্ঞান বিনষ্ট হইবে, একথা কেহই বলিতে পারে না। এই কারণেই বেদেব ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই জ্ঞানকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, নিঃশ্বাস যেমন বিনা চেষ্টায় স্বাভাবিকভাবে বহিতে থাকে, জ্ঞানময় বেদও তেমনি বিনা চেষ্টায় স্বাভাবিক ভাবেই আবির্ভূত হইয়াছে। এই জ্ঞান কেবল আমাদের পৃথিবীতেই উপলব্ধ হয় না; অন্যান্য জগতেও ইহার উপলব্ধি আছে। অতএব পৃথিবী ধ্বংসের সময়ে পৃথিবী হইতে বেদের বিলোপ হইলেও অন্য জগতে তাহা থাকিবে; এবং পুনরায় নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে তাহাতেও এই জ্ঞানময় বেদের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে।

বেদের বাস্তব নিত্যতা স্বীকার করা চলে না। জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞাতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মনুষ্যের উপলব্ধ জ্ঞান মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না; সুতরাং তাহার আদি অবশ্যই থাকিবে। এইভাবে তাহার অন্তও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীতে যে সংস্কৃত-ভাষাময় বেদ আছে, অন্যান্য জগতেও তাহা ঠিক এই ভাবেই থাকিবে, এইরূপ স্বীকার করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অতএব পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে বেদেরও বাস্তব উৎপত্তি-বিনাশ অনুভবসিদ্ধ। কেবলমাত্র, আদি অন্তের সময় নির্ণয়ে কোন সুদৃঢ় উপায় না থাকায় ইহার ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য্য। শব্দব্রহ্মবাদেব আলোচনাকালে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা কবিব।

## স্মৃতি

শ্রুতির অর্থ প্রকাশ করিবার জন্যই স্মৃতিসমূহ রচিত হইয়াছে। স্মৃতি-সমূহের মধ্যে মনুসংহিতার প্রামাণ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (১০)। শ্রুতি হইতে

(১০) বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥—বৃহস্পতিস্মৃতিঃ।

স্মৃতির বিশেষত্ব এই যে, শ্রুতিতে যে সকল বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সেই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণও স্মৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে। মনুসংহিতাতে সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে সব কিছুই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। বর্ত্তমানে আমরা যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি, তখন ইহাদের কোনরূপ লক্ষণ বা প্রকাশক-শব্দ ছিল না; এবং এই সকল বিষয় জানিবার জন্য কোনরূপ বিতর্কও উপস্থিত হইত না। তাহার পর নামরূপাদিহীন ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নিজের তেজঃপ্রভাবে মহাভূত-সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন (১১)।

এই নামরূপাদিহীন সনাতন ব্রহ্ম হইতে ক্রমশঃ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। পরমেশ্বর স্বয়ং ভূলোক, দ্যুলোক, আকাশ এবং দিক্‌সমূহকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১২)।

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন বাকী সব কিছুই অনিত্য; আর মনুও শ্রুতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিলেন—ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি সবকিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, মনু-সংহিতাতেও আকাশের অনিত্যতাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আকাশ অনিত্য হইলে, তাহাতে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান শব্দও অনিত্য হইতে বাধ্য।

---

(১১) আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্;
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥
—মনুসংহিতা; ১ম অধ্যায়; ৫—৬ শ্লোক।

(১২) তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥—মনু ১।১২

উত্তরেণ দিবং স্বর্লোকমধরেণ ভূলোকমুভয়োর্মধ্যে আকাশং দিশশ্চ অন্তরালদিগ্‌ভিঃ সহ অষ্টৌ, সমুদ্রাখ্যমপাং স্থানং স্থিরং নির্ম্মিতবান্।—কুল্লূকভট্টঃ।

তাভ্যামণ্ডশকলাভ্যামুত্তরেণ দিবং নির্ম্মমে নির্ম্মিতবান্। ধরণ্যাং পৃথিবীমধ্যে ব্যোমাকাশং দিশোঽষ্টৌ চ প্রাগাদ্যাঃ।- অবান্তরদিগ্‌ভির্দক্ষিণপূর্ব্বাভিঃ সহাপাং স্থানমন্তরীক্ষে সমুদ্রমাকাশঞ্চ, পৃথিবী পাতালগতা।—মেধাতিথিঃ।

কেবল মনুসংহিতাতেই নহে; অন্যান্য কোন কোন স্মৃতিতেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাতে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, অব্যক্ত (ব্রহ্ম) হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের এবং অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে তন্মাত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি এই তন্মাত্রেরই গুণ। প্রলয়ের সময়ে ইহারা বিলোমক্রমে বিলীন (বিনষ্ট) হইয়া থাকে (১৩)। এক্ষেত্রে শব্দের আশ্রয় শব্দতন্মাত্র বা আকাশ উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়াই কথিত হইল। সুতরাং আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, স্মৃতি-অনুসারেও শব্দ বস্তুতঃ অনিত্য; কেবলমাত্র তাহার ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

মনুসংহিতায় ওঙ্কারকে কোথাও অব্যয় বলিয়া (১৪) কোথাও বা অক্ষর বলিয়া (১৫) বর্ণনা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদ্বারা গ্রন্থকার ব্যাবহারিক অব্যয়ত্বের কথাই বলিয়াছেন। বেদার্থ প্রকাশ করার জন্যই যে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং মনুর পক্ষে বেদবিরুদ্ধ কথা বলা সম্ভব নহে। বেদে যে ওঙ্কার বা অন্য শব্দের বাস্তব নিত্যত্ব স্বীকার করা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

## পুরাণ

পুরাণসমূহে স্পষ্টই শব্দকে আকাশের গুণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (১৬)। সুতরাং পুরাণমতে যদি আকাশ নিত্য না হয়, তাহা হইলে শব্দও নিত্য হইতে পারে না। সৃষ্টির আদিতে যে আকাশ বিদ্যমান ছিল না, তাহাও

---

(১৩) বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাত্ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ ॥ ১৭৯ ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ, রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ।
যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে ॥ ১৮০ ॥
—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(১৪) ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।—মনুসংহিতা ২।৮১ ॥

(১৫) অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ম্।—ঐ ২।৮৪

(১৬) আকাশ-বায়ু-তেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।
শব্দাদিভির্গুণৈর্ব্রহ্মন্ সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৩৬

পুরাণসমূহে স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে (১৭)। সৃষ্টিপ্রক্রিয়াসম্বন্ধে প্রত্যেক পুরাণের মতই প্রায় একপ্রকার। প্রত্যেক পুরাণেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, প্রথমে একমাত্র পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তখন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকায় কোনরূপ সৃষ্টিকার্য্য ছিল না। তাহার পর উক্ত গুণত্রয় বিকৃত হওয়ায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

মহাভূত সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্ম তন্মাত্রসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল; এবং ঐ সকল তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মাত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে হয়—আকাশের উৎপত্তি (১৮)। অতঃপর আকাশ বিকৃত হইয়া স্পর্শতন্মাত্র সৃষ্টি করে, এবং তাহা হইতে বায়ুর সৃষ্টি হয়। এই ক্রমে, অন্যান্য মহাভূতের উৎপত্তি হয়। প্রলয়ের সময়েও মহাভূত সমূহ এইভাবে নিজ নিজ উৎপত্তিস্থলে বিলীন হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরাণমতেও আকাশ উৎপত্তি এবং বিনাশের অধীন; নিত্য নহে। আকাশ নিত্য না হওয়ায় তাহার গুণ শব্দেরও বাস্তব নিত্যতা অসম্ভব। যে সকল স্থলে আকাশ এবং শব্দের নিত্যতার উল্লেখ দেখা যায়, বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করিয়াই এই প্রকার বলা হইয়াছে।

যে সকল পুরাণে আকাশ হইতে শব্দের উৎপত্তির কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই, তাহাতেও শব্দের উৎপত্তিধর্ম্মকতা স্বীকার করা হইয়াছে।

"তদা সমভবত্তত্র সানন্দং শব্দলক্ষণম্।
ওমিতীদং মুনিশ্রেষ্ঠ সুব্যক্তং প্লুতলক্ষণম্॥

—শিবপুরাণ (৩য় অধ্যায়)

---

(১৭) নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৩॥

(১৮) ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকস্ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্॥—বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৩৬॥
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশং শুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্॥
বায়ুপুরাণ, প্রক্রিয়াপাদ, ৪র্থ অঃ ৫০ শ্লোক॥

এই শিবপুরাণের শ্লোকেও 'সমভবৎ' শব্দটিদ্বারা পুরাণকার জানাইয়াছেন যে, শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা ছাড়া অন্যান্য পুরাণেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

"তদা সমভবত্তত্র নাদো বৈ শব্দলক্ষণঃ।"

—লিঙ্গ পুরাণ ( ৩য় অধ্যায় )

প্রভৃতি পুরাণবাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

## ইতিহাস

সংস্কৃতে ইতিহাস বলিতে প্রধানতঃ রামায়ণ এবং মহাভারতকেই বুঝায় (১৯)। তন্মধ্যে মহাভারতেই ঐতিহাসিক তথ্য অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। মহাভারত যে ইতিহাস, মহাভারতের সাক্ষ্য হইতেও তাহা জানা যায় (২০)।

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগীতাতে শব্দতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শব্দকে আকাশের গুণরূপে এবং আকাশকে শব্দের যোনি বা উৎপত্তিস্থলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (২১)। তাহা ছাড়া আশ্বমেধিক পর্ব্বের ২০শ অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে "ততঃ সঞ্জায়তে শব্দঃ" এবং ২৮ শ অধ্যায়ের ২০ শ শ্লোকে 'শৃণোত্যাকাশজান্ শব্দান্" বলিয়া মহাভারতের রচয়িতা স্পষ্টই শব্দের উৎপত্তিধর্ম্মকতা স্বীকার করিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাকে নিত্য বলা চলে না; সুতরাং মহাভারতের মতে শব্দে বাস্তব নিত্যতা নাই।

---

(১৯) ইতিহাসঃ ভারতঞ্চ বাল্মীকিকাব্যমেব চ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড; অঃ ১৩৩; শ্লোঃ ২৩॥

(২০) তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥

মহাভারত; আদিপর্ব্ব; অঃ ১; শ্লোঃ ৫৪

ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্। ঐ, ঐ, ঐ শ্লোক—১৯॥

(২১) পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতা যোনিরিত্যেব শব্দিতাঃ॥
হবির্ভূতাঃ গুণাঃ সর্ব্বে প্রবিশন্ত্যগ্নিজং গুণম্।
অন্তর্ব্বাসমুষিত্বা চ জায়ন্তে স্বাসু যোনিষু॥

মহাভারত; আশ্বমেধিকপর্ব্ব; ২০শ অধ্যায়।

উক্ত ব্রাহ্মণগীতাতে ( ২১ শ অধ্যায়ে ) ঘোষবতী এবং জাতনির্ঘোষা ( অঘোষবতী ) ভেদে শব্দের দ্বৈবিধ্যও অঙ্গীকৃত হইয়াছে (২২)। এই জাতনির্ঘোষা শব্দদ্বারা মহর্ষি ব্যাস সম্ভবতঃ শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থার কথাই বলিয়াছেন। কারণ, এই অধ্যায়েরই পূর্ব্ববর্ত্তী একটি শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাণ এবং অপানবায়ুর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বাক্ অবস্থান করেন (২৩)। প্রাণের অবস্থিতিস্থল হৃদয় এবং অপানের অবস্থিতিস্থল গুহ্যদেশ (২৪)। সুতরাং ইহাদের মধ্যবর্ত্তীস্থলে যে শব্দ বিরাজ করে, সে নিশ্চয়ই পরবর্ত্তীকালের বৈয়াকরণগণ কর্ত্তৃক কথিত শব্দের পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমা অবস্থা। যে শব্দ বদনপথে বহির্গত হইয়া আমাদের শ্রুতিগোচর হয়; তাহাকেই ঘোষিণী বা ঘোষযুক্তা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরা এবং পশ্যন্তী যে শ্রুতিগোচর হয় না, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মধ্যমা বাক্ও যে শ্রুতিগোচর হয় না, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদর্শন করিব।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে,. শব্দের এই সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটি নিত্য কি না। প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ুর মধ্যবর্ত্তী স্থলে যাহা অবস্থান করে, দেহীর প্রাণত্যাগের পর আর তাহার অবস্থিতি সম্ভব নহে; কারণ আশ্রয়নাশে আশ্রিত দ্রব্য মাত্রেরই বিনাশ ঘটিয়া থাকে। মানুষের মৃত্যু হইলে তখন আর তাহার মধ্যে প্রাণ এবং অপানবায়ু থাকে না, সুতরাং ঐ সময়ে শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটিও থাকিতে পারে না। তখন ঐরূপ সূক্ষ্ম শব্দেরও বিনাশ হয়, এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। যদি স্বীকার করা হয় যে, ঐ সময়েও শব্দের একটি সূক্ষ্ম অবস্থা আকাশে অবস্থান করে, তাহা হইলেও আকাশের বিনাশকালে শব্দের বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে।

মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব্ব, ২১শ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের ভারত-ভাবদীপ নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে মহাত্মা ৺নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, প্রাণাদি

---

(২২) ঘোষিণী জাতনির্ঘোষা নিত্যমেব প্রবর্ত্ততে।
তয়োরপি চ ঘোষিণ্যা নির্ঘোষৈব গরীয়সী।। ঐ ঐ, ২১শ অধ্যায়।

(২৩) প্রাণাপানান্তরে দেবী বাগ্ বৈ নিত্যং স্ম তিষ্ঠতি।
—মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ২১শ অধ্যায়।

(২৪) হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।। —বিশ্বকোষ ( প্রাণশব্দ ) ধৃত।

বায়ুই শব্দ উৎপাদন করে (২৫)। ইহাদ্বারা তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ শব্দেরই উৎপত্তিধর্ম্মকতা স্বীকার করিয়াছেন। ২০শ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, সুষুপ্তি অবস্থায় শব্দ প্রভৃতি সমুদয় গুণই সূক্ষ্মভাবে চিত্তে অবস্থান করে এবং জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় উৎপন্ন হয় [উৎপদ্যতে] (২৫)। যদি বলা হয় যে, সুষুপ্তি অবস্থায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করার ফলে শব্দাদির বস্তুতঃ বিনাশ হয় না, তাহা হইলেও মহাপ্রলয়ের সময়ে আকাশের বিনাশের সঙ্গে তাহার এইরূপ সূক্ষ্ম অবস্থারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শব্দের বাস্তব নিত্যতা কিছুতেই মহাভারত-রচয়িতার অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তবে তাহার ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করার পক্ষে কোন বাধা নাই।

## তন্ত্র

তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে শব্দব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তন্ত্রশাস্ত্রও বুঝি শব্দের ব্রহ্মস্বরূপতা এবং নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সম্যক্ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, শব্দের বাস্তব নিত্যতা বা যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপতা তন্ত্রসমূহে স্বীকৃত হয় নাই। সারদা-তিলক নামক গ্রন্থে বিন্দু বা অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে শব্দের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে (২৭)। ক্রিয়াসার নামক গ্রন্থের মতে শিবাত্মক বিন্দু এবং শক্ত্যাত্মক বীজ এই উভয়ের সমন্বয়ে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (২৮)। প্রয়োগসার নামক গ্রন্থেও 'শব্দই বর্ণতা প্রাপ্ত হয়' এইরূপ মত প্রকাশ করিবার কালে 'সম্ভূয়' পদটি প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার

---

(২৫) আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
ইতি শিক্ষোক্তের্মনঃপ্রবর্ত্তিতাঃ প্রাণাদ্যাঃ এব বাচং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ।

(২৬) সুষুপ্ত্যাদৌ বাসনারূপেণ চিত্তে স্থিতং পুনর্জাগরে উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ।
মহাভাঃ; নীলকণ্ঠটীকা; আশ্বমেধিকপর্ব্ব; অঃ ২০; শ্লো-২৫

(২৭) ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥—সারদাতিলক; প্রথমপটল।

(২৮) বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥ —ক্রিয়াসার।

শব্দের উৎপত্তিধর্ম্মকতাই স্বীকার করিয়াছেন (২৯)। প্রাণতোষণী তন্ত্রে এই প্রসঙ্গে রাঘবভট্টধৃত একটি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে (৩০)। উক্ত বচনেও বিন্দুরূপিণী প্রকৃতি হইতে শব্দের উৎপত্তির উল্লেখ দেখা যায়।

শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে সারদা-তিলকে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম হইতে সর্ব্বপ্রথম শক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অতঃপর সেই শক্তি হইতে নাদ এবং তাহা হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই বিন্দু আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, তামসিক বিন্দুর নাম বীজ এবং রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ। এক্ষেত্রে, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয় বলিয়া পুনরায় বিন্দুবিশেষের নাম নাদ বলায় এবং অন্যস্থানে বিন্দু হইতে নাদের উৎপত্তির কথা বলায় সারদাতিলকের কথাগুলিতে আপাত-বিরোধ দেখা যায়। তাই জগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ প্রথমোৎপন্ন নাদকে মহত্তত্ত্ব অর্থে এবং শেষোৎপন্ন নাদকে ধ্বনি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে পারি—প্রথমে শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থার সৃষ্টি হয় (সূক্ষ্মতর অবস্থাটিও এই সূক্ষ্মতম অবস্থারই পরিবর্ত্তিত রূপ)। তারপর তাহার সূক্ষ্ম অবস্থার সৃষ্টি হইয়া অতঃপর স্থূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই মতে, যোগিগণ-মাত্র-বেদ্য পরা ও পশ্যন্তী নামক অবস্থাদ্বয়কে একটি পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার করিলেই সারদাতিলকের প্রত্যেকটি বাক্য সঙ্গত হইতে পারে।

যদিও সারদাতিলকের দ্বিতীয় পটলে শব্দের প্রকাশকে তাহার ব্যক্তি বলা হইয়াছে (৩১), তথাপি পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাখ্যা

---

(২৯) সোঽন্তরাত্মা তদা দেবি নাদাত্মা নদতে স্বয়ম্।
যথাসংস্থানভেদেন সম্ভূয় বর্ণতাং গতঃ॥—প্রয়োগসার।

(৩০) ক্রিয়াশক্তি প্রধানায়াঃ শব্দ-শব্দার্থকারণম্।
প্রকৃতের্ব্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দ-ব্রহ্মাভবৎ পরম্॥—রাঘবভট্টধৃত (প্রাণতোষণীতে উদ্ধৃত)।

(৩১) ততো ব্যক্তিং প্রবক্ষ্যামি বর্ণানাং বদনে নৃণাম্।
প্রেরিতা মরুতা নিত্যং সুষুম্নারন্ধ্রনির্গতাঃ।
কণ্ঠাদিকারণৈর্ব্বর্ণাঃ ক্রমাদাবির্ভবন্তি তে॥—সারদাতিলক; দ্বিতীয় পটল। ১২শ্লোক।

করিলে আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, ঐস্থলে তন্ত্রকার উৎপত্তি অর্থেই ব্যক্তি শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া এই সারদাতিলকেই আমরা দেখিতে পাই যে, তন্ত্রকার স্বয়ং শব্দের ব্রহ্মস্বরূপতা স্বীকার করেন নাই। তিনি শব্দব্রহ্ম শব্দটিকে 'শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম' এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ"।

—সারদাতিলক ; প্রথম পটল ; ১৩ শ শ্লোক।

অর্থাৎ তাঁহার মতে সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত চৈতন্যই শব্দব্রহ্মপদবাচ্য। শ্রুতিতে যেমন প্রণবকে ব্রহ্মের বাচক বলা হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রেও তেমনি ব্রহ্মের বাচকরূপেই প্রণব প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, যাঁহাতে সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে এবং যাঁহার মধ্যে সকলের প্রলয় ঘটে, তিনিই ব্রহ্ম (৩২)। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দের ব্রহ্মত্ব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেরও অভিপ্রেত নহে; কারণ শব্দের ঐ সকল গুণ নাই। শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার না করা দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাহার নিত্যত্ব-স্বীকারও তন্ত্রকারগণের অভিপ্রেত নহে। অন্যান্য তন্ত্রেও অনুরূপ মতই দেখা যায়। কুলার্ণব-তন্ত্রেও শব্দপ্রতিপাদ্য জ্ঞানকেই শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৩৩); শব্দকে নহে।

কামধেনুতন্ত্রের একটি শ্লোকে বর্ণ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (৩৪)। ইহা দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়, উক্ত

---

(৩২) যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ন্তদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র ; তৃতীয় উল্লাস।

(৩৩) আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥

—কুলার্ণবতন্ত্র ; ৫ম খণ্ড ; ১ম উল্লাস।

(৩৪) বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি জগৎ-সংহারকারকঃ॥

—কামধেনুতন্ত্র ( নাদলীলামৃত ৫৬ পৃষ্ঠায় ধৃত )

তন্ত্রে বুঝি বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতাই স্বীকৃত হইল। বস্তুতঃ উক্ত শ্লোকে তন্ত্রকারের অভিপ্রায় যে অন্যরূপ, অপর তন্ত্রবাক্য-সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। আমরা মনে করি, বর্ণ হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলিয়া তন্ত্রকার এইটুকুমাত্র জানাইতে চাহিয়াছেন যে, বর্ণোচ্চারণ-ব্যতিরেকে অপরের নিকট ব্রহ্মাদি দেবগণের অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করা যায় না। ইহাদ্বারা বস্তুতঃ বর্ণের বাচকতাই স্বীকৃত হয়; নিত্যতা কিংবা ব্রহ্মতা নহে।

স্বচ্ছন্দ তন্ত্রের ৮ম পটলে (শ্লোক—২৬) "ন বর্ণাঃ পরমার্থতঃ" বলিয়া তন্ত্রকার পরিষ্কার ভাষায়ই জানাইয়াছেন যে, বর্ণ বা বর্ণাত্মক শব্দের বাস্তব নিত্যতা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। শব্দসমষ্টিও যে বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহার পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে 'বিজ্ঞান-ভৈরব' নামক তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের একাদশ শ্লোকে "শব্দরাশির্ন ভৈরবঃ" বলিয়া তন্ত্রাচার্য্য পরিষ্কার ভাষায়ই স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

## মীমাংসাদর্শন

দর্শনসমূহের মধ্যে মীমাংসাদর্শনই বেদের প্রামাণ্য এবং উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বাধিক চেষ্টা করিয়াছেন। বেদ মনুষ্যের সৃষ্ট হইলে তাহার অবশ্য-প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা চলে না; এই কারণে মীমাংসক আচার্য্যগণ বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। বেদ শব্দময়; অতএব, বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে, শব্দমাত্রেরই নিত্যত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। এই কারণে মীমাংসক আচার্য্যগণকর্ত্তৃক শব্দমাত্রেরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শব্দনিত্যতার বিপক্ষে প্রতিপক্ষের বিভিন্ন যুক্তির উল্লেখক্রমে মীমাংসক আচার্য্যগণ উক্ত প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডনের জন্য নিজেদের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষষ্ঠ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত মহর্ষি জৈমিনি, এবং ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শবরস্বামী শব্দনিত্যতার বিপক্ষে প্রতিপক্ষের ছয়টি প্রধান যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন (৩৫); যথা—

(৩৫) কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥১।১।৬॥ অস্থানাৎ ॥১।১।৭॥ করোতিশব্দাৎ ॥১।১।৮॥ সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ ॥১।১।৯॥ প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ ॥১।১।১০॥ বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাস্য ॥১।১।১১॥

(১) শব্দের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মানুষের কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতির সংযোগের ফলে শব্দ উচ্চারিত হয়; অতএব, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শব্দের উচ্চারণ যত্নসাধ্য। যত্নসাধ্য বস্তুমাত্রেই উৎপত্তিশীল; অতএব, শব্দের যত্ন-সাধ্যতাই তাহার উৎপত্তিমত্তার প্রমাণ।

কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগরূপ যত্ন পূর্ব্ব হইতে স্থিত শব্দকে প্রকাশ করে, এইরূপ মনে করাও ভুল; কারণ, উচ্চারণের পূর্ব্বে যে শব্দ অবস্থিত থাকে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

(২) শব্দের স্থায়িত্বও নাই। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের বিনাশ ঘটে; এতএব, এইরূপ ক্ষণস্থায়িতাও শব্দের অনিত্যতার অপর প্রমাণ। উচ্চারণের সময়েই আমরা শব্দ শুনিতে পাই। ইহার পূর্ব্বে তাহাকে শুনিতে পাই না, এবং উচ্চারণের পরক্ষণেও আর শব্দের শ্রবণ হয় না। শব্দ যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে সকল সময়েই তাহাকে শোনা যাইত।

যদি বলা হয় যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে এবং পরেও শব্দ অবস্থিত থাকে, কেবলমাত্র আশ্রয়পদার্থের অভাববশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না; তাহা হইলে এই যুক্তিও টিকিবে না; কারণ, শব্দের আশ্রয় যে আকাশ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আকাশ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সুতবাং আশ্রয়াভাবহেতু শব্দের শ্রবণাভাবের কল্পনা অসঙ্গত। শব্দের গ্রাহক আমাদের কর্ণ। ইহাও উচ্চাবণের পূর্ব্বে, পরে এবং উচ্চারণের সমকালে একই ভাবে অবস্থিত থাকে। সুতরাং গ্রাহক পদার্থের অভাবে শব্দের শ্রবণাভাবও স্বীকার করা অসম্ভব।

(৩) লৌকিক ব্যবহারেও শব্দের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। সে শব্দ করিতেছে, তুমি শব্দ করিতেছ, আমি শব্দ করিতেছি—ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বদাই সকলে বলিয়া থাকে। শব্দের উৎপত্তি না থাকিলে লোকে এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিত না।

(৪) শব্দের নানাত্বও তাহার অনিত্যতার অপর প্রমাণ। নিত্যপদার্থসমূহ সর্ব্বদাই এক এবং অবিভক্ত থাকে, কিন্তু শব্দ সেইরূপ নহে। একসঙ্গে বহুস্থানে একইপ্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। বহু ব্যক্তি একসঙ্গে অথবা বিভিন্ন সময়ে একই প্রকারের শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইঁহাদ্বারা শব্দের বহুত্ব প্রমাণিত হয়। নিত্য পদার্থের বহুত্ব বা বিভাগ থাকিতে পারে না।

(৫) শব্দের আকৃতি-পরিবর্ত্তনও দেখা যায়। দধি+অত্র=দধ্যত্র—এখানে সন্ধির নিয়ম অনুসারে ইকার স্থানে য্ হইয়াছে। এইরূপে ইকারের উচ্চারণ য্‌কারের উচ্চারণে রূপান্তরিত হইয়া প্রমাণ করে যে, শব্দ অনিত্য; কারণ, নিত্যপদার্থের আকৃতি-পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। ই এবং য্ এর মধ্যে উচ্চারণগত আংশিক সাদৃশ্যও বিদ্যমান। এই উচ্চারণগত সাদৃশ্যদ্বারাও বুঝা যায় যে, য্ ইকারেরই রূপান্তর।

(৬) শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্যও তাহার অনিত্যতার অপর প্রমাণ। যখন বহু লোক একসঙ্গে কোন শব্দ উচ্চারণ করে, তখন অতি উচ্চ ধ্বনি হয়। আবার, ঐরূপ উচ্চারণকারীর সংখ্যা কমিতে থাকিলে ধ্বনিও ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকে। এইভাবে যখন একজনমাত্র লোক সেই শব্দ উচ্চারণ করে, তখন অতি মৃদু ধ্বনি হয়। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, উচ্চতর ধ্বনির সময়ে যে শব্দ শোনা গিয়াছিল, তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক উচ্চারিত। শব্দের এইরূপ বিভাগ থাকায় তাহার অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়; কারণ, নিত্যপদার্থের কোনরূপ বিভাগ থাকা সম্ভবপর নহে।

এইভাবে প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক মহর্ষি জৈমিনি উক্ত প্রথমপাদের দ্বাদশ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ সূত্র পর্য্যন্ত এবং আচার্য্য শবরস্বামী ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যে উল্লিখিত যুক্তিগুলির বিপক্ষে নিজেদের যুক্তি প্রদর্শন করিযাছেন (৩৬); যথা—

(১) প্রতিপক্ষ বলিয়াছেন—মানুষের যত্নের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহা সত্য নহে। বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতে স্থিত কিন্তু অপ্রকাশিত শব্দ মানুষের যত্নের ফলে প্রকাশ লাভ করে। শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও তাহার অস্তিত্ব থাকাই স্বাভাবিক। শব্দ যে নিত্য, তাহা পরে প্রদর্শন করা হইবে।

(২) উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের বিনাশ ঘটে—প্রতিপক্ষের এই অনুমান সত্য নহে। শব্দ অল্পদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই দূরস্থ লোক ইহা শুনিতে পায় না—এই যুক্তিও ঠিক নহে। বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতে স্থিত, কিন্তু অপ্রকাশিত

---

(৩৬) সমং তু তত্র দর্শনম্ ॥১।১।১২॥ সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ ॥১।১।১৩॥ প্রয়োগস্য পরম্ ॥১।১।১৪॥ আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্ ॥১।১।১৫॥ বর্ণান্তরমবিকারঃ ॥১।১।১৬॥ নাদবৃদ্ধিপরা ॥১।১।১৭॥

শব্দকে একজন লোক তাহার চেষ্টাদ্বারা প্রকাশ করে। তখন ঐ ব্যক্তির কণ্ঠতাল্বাদিসংযোগরূপ চেষ্টার ফলে আকাশের মধ্যে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, এবং ঐ তরঙ্গ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিলেই আমরা শব্দ শুনিতে পাই। ঐরূপ শব্দ-প্রকাশক তরঙ্গ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়াই দূরস্থ ব্যক্তির কর্ণে শব্দের শ্রবণ হয় না। উক্ত তরঙ্গ শব্দ নহে; কিন্তু শব্দের প্রকাশক। সুতরাং তরঙ্গের বিনাশকেই শব্দের বিনাশ বলা যায় না। কখন কখন ঐরূপ শব্দবাহী তরঙ্গ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে বহুদূর পর্যান্ত অগ্রসর হয়; আবার কখনও প্রতিকূল বায়ু ইহার গতি স্বল্পপ্রসারিত করিয়া দেয়। ইহাদ্বারাও বুঝা যায় যে, তরঙ্গ বিশেষই শব্দের প্রকাশক (৩৭)।

(৩) 'শব্দ করিতেছে' প্রভৃতি কথাদ্বারা 'শব্দ উৎপন্ন করিতেছে' এইরূপ অর্থ বুঝায় না; কিন্তু 'শব্দের ব্যবহার করিতেছে' এইরূপ অর্থ বুঝায়, 'গোময়ং কুরু' ( গোময় কর ) বাক্যের অর্থ যেমন 'গোময় সংগ্রহ কর'; কিন্তু 'গোময় উৎপন্ন কর' এইরূপ নহে; ঠিক তেমনি 'শব্দ কর' বাক্যটিদ্বারাও বুঝায়—শব্দের ব্যবহার কর।

(৪) বস্তুতঃ শব্দের নানাত্ব নাই। সূর্য্য যেমন এক হইয়াও বিভিন্নব্যক্তি-

---

(৩৭) আচার্য্য শবরস্বামী বলেন—অভিঘাত ( উচ্চারণ-প্রযত্ন ) দ্বারা প্রেরিত দেহাভ্যন্তরস্থ কৌষ্ঠ বায়ু বদনসন্নিহিত স্থির বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদিক্‌গামী কতকগুলি সংযোগ ও বিভাগ সৃষ্টি করে ( অভিঘাতেন হি প্রেরিতা বায়বঃ স্তিমিতানি বায়্বন্তরাণি প্রতিবাধমানাঃ সর্ব্বতোদিক্কান্ সংযোগ বিভাগানুৎপাদয়ন্তি।—শাবরভাষ্য ১।১।১৩)। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন, এই সংযোগ-বিভাগ শব্দদ্বারা তরঙ্গ ভিন্ন আর কি বুঝা যাইতে পারে? শাবরভাষ্যের ঐ অংশের ব্যাখ্যায় আচার্য্য বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী শবরস্বামীর অভিপ্রায় প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সংযোগ ও বিভাগ তালু প্রভৃতি স্থানে থাকে না; বস্তুতঃ তাহারা বায়ুস্বরূপ ( ন সংযোগ-বিভাগানাং তাল্বাদিস্থানস্থিতত্বং কিন্তু বায়বীয়ত্বমেব।—প্রভাটীকা ১।১।১৩)। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত সংযোগ-বিভাগ শব্দদ্বারা আচার্য্য শবরস্বামী বায়বীয় তরঙ্গের কথাই বলিযাছেন। এইরূপ তরঙ্গ উৎপত্তির ব্যাপারে যে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানবিশেষের সংযোগ আবশ্যক হয়, আচার্য্য বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী তাঁহার ব্যাখ্যায় এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন [ তে ( কৌষ্ঠ্যা বায়বঃ ) চ শব্দবিশেষাভিব্যক্ত্যর্থং তাল্বাদিস্থানবিশেষমনুরুধ্যন্তে। —প্রভাটীকা ১।১।১৩ ]। এইরূপ শব্দবাহী তরঙ্গ যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্তই যে শব্দের শ্রবণ হয়, তাহাও শবরস্বামী পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়াছেন ( যাবদ্বেগমভিপ্রতিষ্ঠন্তে।......অনুপরতেষ্বেব তেষু শব্দা উপলভ্যন্তে নোপরতেষু।—শাবরভাষ্য, ঐ )।

কর্ত্তৃক বিভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হন, শব্দও তেমনি এক হইয়াও বিভিন্ন-ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্নভাবে শ্রুত হইয়া থাকে। সকালবেলা রাম যখন মাঠে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন তাহার মনে হয়, সূর্য্য যেন ঠিক তাহার সম্মুখেই অবস্থিত। আবার তাহার এক মাইল দক্ষিণে বা এক মাইল বামে দাঁড়াইয়া যদু অথবা শ্যাম একই সময়ে যখন একই সূর্য্যকে দেখে, তখন তাহাদেরও মনে হয়, সূর্য্য যেন তাহাদের প্রত্যেকেরই ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। বস্তুতঃ সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থিতি-স্থল বুঝিতে না পারাই তাহাদের ঐরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ। সূর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করেন না; কিন্তু বহুদূরে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একইভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দও তেমনি এক এবং অভিন্ন। মানুষ যে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রবণ করিতেছে বলিয়া মনে করে, ইহা তাহাদের ভ্রম।

শব্দের আশ্রয় যে আকাশ ইহা সত্য; এবং আকাশ সর্ব্বব্যাপী—ইহাও সত্য। শ্রোত্রাকাশে যে শব্দ গৃহীত হয়—একথাও সত্য। তবে আসল কথা এই যে, শ্রোত্রাকাশে নিত্য শব্দেরই শ্রবণ হইয়া থাকে; শব্দের উৎপত্তি হয় না।

(৫) বস্তুতঃ শব্দের আকৃতি-পরিবর্ত্তনও হয় না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে শব্দ শ্রবণের কারণ—স্থানের নানাত্ব; শব্দের নানাত্ব নহে। দধি শব্দের ই এবং অত্র শব্দের অ মিলিয়া যে 'য' হয়, তাহা বস্তুতঃ ইকারের বিকার বা রূপান্তর নহে। ই এবং য সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ। ই এবং য যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ইকার গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি যকারকেই গ্রহণ করিত; কিন্তু কেহই এইরূপ করে না; ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, ই এবং য অভিন্ন নহে। ইকার এবং যকারের উচ্চারণে আংশিক সাদৃশ্য আছে দেখিয়াও তাহাদের অভিন্নতা কল্পনা করা অযৌক্তিক। দধি এবং কুন্দপুষ্প উভয়েই শ্বেতবর্ণ; কিন্তু তাই বলিয়া কেহই কুন্দপুষ্প এবং দধিকে অভিন্ন দ্রব্য মনে করে না। অতএব, আংশিক সাদৃশ্য বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা প্রমাণে সমর্থ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতিপক্ষের উল্লিখিত যুক্তিদ্বারা শব্দের আকৃতি-পরিবর্ত্তনও প্রমাণিত হইতেছে না। বস্তুতঃ, শব্দ নিত্য; সুতরাং তাহার আকৃতি-পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

(৬) শব্দের অংশবিভাগের কল্পনাও অযৌক্তিক। একজন লোক যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করে, তখন একবারই শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ তরঙ্গ

আমাদের কর্ণে একবারই আঘাত করে ; এবং ফলে আমরা একটি মৃদু শব্দ শুনিতে পাই। কিন্তু যখন বহু লোক এক সঙ্গে শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, তখন তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণে এক একটি পৃথক্ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত প্রত্যেকটি তরঙ্গ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে। সুতরাং একই প্রকার তরঙ্গের পৌনঃপুনিক আঘাতের ফলে আমাদের মনে হয়, যেন উচ্চতর ধ্বনি হইতেছে। বস্তুতঃ ধ্বনি এক প্রকারেরই হয় ; তরঙ্গের নানাত্বই তাহার উচ্চানুভূতির কারণ। অতএব শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য বা অংশ কোনটাই থাকা সম্ভব নহে বলিয়া প্রতিপক্ষের উল্লিখিত যুক্তিও শব্দের নিত্যতা খণ্ডন করিতে পারে না।

উল্লিখিত যুক্তিগুলিদ্বারা বিপক্ষের প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করিয়া মীমাংসক আচার্য্যগণ শব্দের নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিবার জন্য আরও কতকগুলি নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে বিপক্ষের অন্যান্য যুক্তিও তাঁহাদের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৮ শ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে এবং উক্ত সূত্রগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থে ঐ সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত যুক্তিগুলিতে মীমাংসকগণ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যথাক্রমে নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

( ১ ) অন্য পদার্থ প্রতিপাদনের জন্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। শব্দ পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত এবং জ্ঞাত থাকে বলিয়াই সে অন্যপদার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে। কোন অনিত্য দ্রব্যই অপর পদার্থ প্রতিপাদনে সমর্থ নহে ; সুতরাং শব্দের এই বিশেষগুণ দ্বারা তাহার নিত্যতা প্রমাণিত হয়। গো শব্দ যে গরুকে বুঝায়, তাহা স্মরণাতীত কাল হইতেই মনুষ্যসমাজে বিদিত আছে। গো ব্যক্তির বিনাশ ঘটে ; কিন্তু গো শব্দের বিনাশ নাই। যে গো-শব্দ এক বৎসর পূর্ব্বে একটি গরুকে বুঝাইয়াছিল, সেই এক বৎসর পরে পুনরায় অপর গরুকে বুঝাইয়া থাকে। শব্দ নিত্য বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়।

প্রতিপক্ষ বলেন, পূর্ব্বে উচ্চারিত গোশব্দ হইতে পরে উচ্চারিত গোশব্দটি ভিন্ন ; কেবলমাত্র উচ্চারণের সাদৃশ্যবশতঃই সে গোপদার্থটিকে বুঝাইতে সমর্থ হয়। এই যুক্তি ঠিক নহে। উচ্চারণের সাদৃশ্য দ্বারা ভিন্ন পদার্থের অভেদ-প্রতীতি হয় না। শালা এবং মালা দুইটি শব্দের উচ্চারণে যথেষ্ট

সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু তাই বলিয়া শালা শব্দের দ্বারা মালাকে বা মালা শব্দ দ্বারা শালাকে বুঝা যায় না। গো শব্দের অনুকরণে যে গাবী প্রভৃতি অপশব্দের উচ্চারণ করা হয়, তাহাদের দ্বারা যথার্থ বস্তুর যথার্থ প্রতীতি হয় না। যে স্থলে ঐরূপ প্রতীতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়, সেই স্থলে উহাকে ভ্রান্ত প্রতীতিই বুঝিতে হইবে। গো প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হইলেও বস্তুতঃ তাহা এক। রবিবার সন্ধ্যাকালে আমরা যে বৃক্ষটিকে দেখি, রাত্রির অন্ধকারে সেই বৃক্ষ আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকিলেও সোমবার প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষকেই আমরা পুনরায় দেখিয়া থাকি। প্রকাশক আলোকের অভাব যেমন রাত্রিতে ঐ বৃক্ষটিকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখে, শব্দও তেমনি প্রকাশক চেষ্টার অভাবে মধ্যবর্ত্তী সময়ে আমাদের কাছে অপ্রকাশিত থাকে। প্রকাশকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই নিত্যশব্দের পুনরায় প্রকাশ ঘটে। সুতরাং অপর-পদার্থ-প্রতিপাদন-সামর্থ্যরূপ বিশেষ গুণদ্বারা শব্দের নিত্যতা প্রমাণিত হয়—একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

(২) একই সময়ে দিল্লীতে এবং কলিকাতায় যখন দুইজন ব্যক্তিকর্ত্তৃক গোশব্দ উচ্চারিত হয়, তখন ঐ দুইটি গোশব্দ দুইটি পৃথক্ পৃথগ্ গরুকে বুঝায়—এই যুক্তিদ্বারাও শব্দের নিত্যতা খণ্ডন করা যায় না। বস্তুতঃ গো শব্দটি সমগ্র গো-জাতির বোধক। একই গো শব্দ প্রয়োজনানুসারে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে পৃথিবীর সমুদয় গরুকেই বুঝাইতে সমর্থ। সুতরাং দিল্লীতে উচ্চারিত হইয়া যে গোশব্দ সেই স্থানে স্থিত একটি গরুকে বুঝাইল, একই সময়ে কলিকাতায় উচ্চারিত হইয়া সেই গোশব্দই অপর একটি গরুকেও বুঝাইতে পারিল। স্থানভেদই এইরূপ পৃথক্ পৃথক বস্তু প্রতিপাদনের কারণ; শব্দভেদ নহে। বস্তুতঃ শব্দের কোন ভেদ নাই। শব্দের শক্তিগ্রহ যদি ব্যক্তিতে হইত, তাহা হইলে শব্দভেদ কল্পনা করা যাইতে পারিত; কিন্তু মীমাংসকমতে শব্দের শক্তিগ্রহ হয়—জাতিতে; ব্যক্তিতে নহে। জাতিশক্তিবাদ স্বীকার করিলে আর শব্দভেদ কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না।

(৩) একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হয় দেখিয়া যাঁহারা শব্দে বহুত্ব কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতও ঠিক নহে। পাঁচবার শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, দশবার গান করিতেছে—ইত্যাদি বাক্যে একই শব্দের পুনঃ

পুনঃ উচ্চারণের কথাই বলা হয়; পৃথক্ পৃথক্ শব্দের নহে। গতকল্য যে গোশব্দ উচ্চারণ করা হইয়াছিল, তাহা তখনই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যে গোশব্দ উচ্চারণ করা হইতেছে, তাহা উক্ত গোশব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—এইরূপ মনে করা ভুল। একজন লোক প্রবাসে যাওয়ার পূর্ব্বে বাড়ীতে তাহার আত্মীয়গণকে দেখিয়া যায়। প্রবাসে থাকাকালে তাহাদিগকে দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রবাস হইতে ফিরিয়া পুনরায় সেই আত্মীয়গণকেই দেখিতে পায়। এখানে যেমন পূর্ব্বের আত্মীয়গণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, এবং পরে সে অপর আত্মীয়গণকে দেখিতেছে—এরূপ মনে করা যায় না, শব্দের বেলাও ঠিক তেমনি। প্রকাশকের অভাবই মধ্যবর্ত্তী সময়ে শব্দের শ্রবণের অভাব ঘটায়; এবং পুনরায় প্রকাশকের আবির্ভাব হইলেই সেই শব্দ পুনরায় শ্রুত হয়। শব্দ কদাপি বিনষ্ট হয় না; সময়-বিশেষে অপ্রকাশিত থাকে—এইমাত্র।

(৪) যাঁহাদের মতে সকল দ্রব্যই অনিত্য, সেই শূন্যবাদীরাও শব্দের নিত্যত্ব খণ্ডন করিতে পারেন না। অপর দ্রব্যগুলিকে বিনষ্ট হইতে দেখা যায় বলিয়াই তাঁহারা ঐগুলির বিনাশশীলতা স্বীকার করেন; কিন্তু কোন শব্দের বিনাশ কেহ কখনও দেখে নাই এবং দেখিতে পারে না; সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অভাবেও শব্দের বিনাশশীলতা প্রমাণ করা অসম্ভব।

(৫) যাঁহারা বলেন—গতকল্য শ্রুত বা উচ্চারিত শব্দ হইতে অদ্যকার শ্রুত বা উচ্চারিত শব্দটি ভিন্ন, তাঁহারা অনুমানের সাহায্যেই এইরূপ বলিয়া থাকেন; প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে নহে। অনুমান সকল সময়ে নির্ভুল হয় না। অনুমানদ্বারা অনেক সময়ে রজ্জুকে সর্প বা সর্পকে রজ্জু বলিয়া মনে করা যায়। অতএব, কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করা অযৌক্তিক।

(৬) অনিত্য বস্তু মাত্রেই বিনাশশীল উপকরণের দ্বারা নির্ম্মিত থাকে এবং ঐ সকল বিনাশশীল উপাদান বিনষ্ট হওয়ার ফলেই উক্ত দ্রব্যেরও বিনাশ ঘটে। বস্ত্রখণ্ড সূত্রসমূহদ্বারা নির্ম্মিত, এবং ঐ সূত্রগুলি বিনাশশীল; সুতরাং বিনাশশীল সূত্রের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য বস্ত্রেরও বিনাশ ঘটে। শব্দে কোন উপাদান নাই; অতএব শব্দের বিনাশ সম্ভব নহে।

(৭) যাঁহারা শব্দকে বায়ুর বিকার মনে করেন; তাঁহারাও ভ্রান্ত। বস্তুতঃ শব্দ বায়ুর বিকার বা বায়বীয় উপাদানের দ্বারা রচিত নহে। বায়ুর স্পর্শগুণ আছে; আমরা চর্ম্মদ্বারা বায়ুকে অনুভব করিতে পারি; কিন্তু শব্দকে কেহই স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব শব্দের ত্বাচ-প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাহাকে বায়ুর বিকার বা বায়বীয় উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত বলা অযৌক্তিক। বস্তুতঃ, শব্দ উপাদানরহিত, নিত্য এবং অখণ্ড (৩৮)।

শিক্ষাসূত্রে যদিও শব্দকে বায়ুর বিকাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য নহে। শব্দ যদি বায়ুর বিকার হয়, তাহা হইলেও ইহা এক অলৌকিক বিকার হইবে, যে বিকারের ফলে বায়ুর কোন গুণই আর শব্দে থাকে না। বস্তুতঃ শব্দ বায়ুর বিকারই নহে। বেদেও শব্দের নিত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে; সুতরাং অন্যান্য লৌকিক প্রমাণের পর বেদোক্ত প্রমাণ উল্লেখ করিয়াও আমরা শব্দের নিত্যতা অনায়াসেই প্রমাণ করিতে পারি। মহর্ষি জৈমিনি "লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥" (১।১।২৩) সূত্রদ্বারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য শবর-স্বামী মহর্ষির উল্লিখিত উক্তির সমর্থনে "বাচা বিরূপ-নিত্যয়া" এই শ্রুতিটি প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গানাথ ঝা উক্ত শ্রুতির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—"By means of word which is eternal." আচার্য্য বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী শাবর-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় এই শ্রুতিটিকে বিশ্লেষণ করিয়া উল্লিখিত অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন (৩৯)।

---

(৩৮) তথা চ শিক্ষাকারা আহুঃ—বায়ুরাপদ্যতে শব্দতামিতি, নৈতদেবম্ বায়বীয়শ্চেচ্ছব্দো ভবেদ্ বায়োঃ সন্নিবেশবিশেষঃ স্যাৎ। ন চ বায়বীয়ানবয়বান্ শব্দে সতঃ প্রত্যভিজানীমো যথা পটস্য তন্তুময়ান্। ন চৈবং ভবতি। স্যাচ্চেদেবং স্পর্শনেনোপলভেমহি। ন চ বায়বীয়ানবয়বান্ শব্দগতান্ স্পৃশামঃ। তস্মান্ন বায়ুকারণকঃ। অতো নিত্যঃ।

—শাবরভাষ্য (১।১।২২)।

(৩৯) বিরূপা চ সা নিত্যা চেতি বিগ্রহঃ। রূপয়তীতি রূপং কর্ত্তা বিগতং রূপং যস্যা ইতি কর্ত্তৃরহিতেত্যর্থঃ। অতএব নিত্যা বাগিত্যর্থঃ। ইয়ং চ শ্রুতিরগ্নিস্তুতিপরা সতী বাচো নিত্যত্বং দ্যোতয়তীতি লিঙ্গং ভবতীতি।

—বৈদ্যনাথ শাস্ত্রিকৃত-শাবরভাষ্যটিপ্পনী।

বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তার বিপক্ষে প্রতিপক্ষ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, মীমাংসক আচার্য্যগণ একে একে সেইগুলিও খণ্ডন করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনির সূত্র, শবরস্বামীর ভাষ্য এবং এই দুইখানা গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া রচিত মীমাংসাশাস্ত্রীয় অন্যান্য গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে শব্দ-নিত্যতার বিপক্ষে পূর্ব্বপক্ষ হিসাবে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উত্থাপন করা হইয়াছে। যথা—

(১) বেদের বিভিন্ন শাখার নাম দেখিয়া মনে হয়, ঐগুলি মানুষের রচিত। কঠ, কলাপ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ঐ সকল শাখা যথাক্রমে কাঠক, কালাপক, পৈপ্পলাদ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যদি বলা হয় যে, বেদের রচয়িতা একজনই ছিলেন; উল্লিখিত শাখাসমূহ ঐ সকল শাখার প্রচারকদের নাম অনুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; তাহা হইলেও বেদের পৌরুষেয়ত্বই স্বীকৃত হয়। বেদ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের রচিত হইলে তাহাকে আর নিত্য বলা চলে না (৪০)।

(২) 'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত,' 'কুসুরবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়ত' প্রভৃতি বেদোক্ত বাক্য দেখিয়া বুঝা যায়, প্রবাহণের পুত্র ববর বা উদ্দালকের পুত্র কুসুরবিন্দের জন্মের পর বেদের ঐসকল অংশ রচিত হইয়াছে। অতএব বেদের আদি থাকায় তাহাকে নিত্য বলা যায় না। যাহার আদি এবং অন্ত কোনটিই নাই, তাহাই নিত্য (৪১)।

(৩) বেদে কতকগুলি অদ্ভুত উক্তি দেখা যায়। যথা—'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত' (বৃক্ষেরা যজ্ঞ করিয়াছিল), 'সর্পাঃ সত্রমাসত' (সর্পেরা যজ্ঞ করিয়াছিল) ইত্যাদি। বৃক্ষ অচেতন পদার্থ এবং সর্পও শাস্ত্রজ্ঞানহীন। যজ্ঞ করার উপযোগী বুদ্ধি বা কর্ম্মক্ষমতা ইহাদের নাই। অতএব বেদের উল্লিখিত উক্তি বালকোচিত। এইরূপ উক্তি কখনও অপৌরুষেয় বা নিত্য হইতে পারে না। একমাত্র অজ্ঞ মনুষ্যকর্ত্তৃকই এতাদৃশ উক্তি রচিত হইতে পারে (১।১।৩১ সূত্রের শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

(৪০) বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ ।১।১।২৭।

(৪১) অনিত্যদর্শনাচ্চ ।১।১।২৮।

(৪) উপাসনা বা যজ্ঞক্রিয়াই বেদের মূল উদ্দেশ্য। অতএব বেদের প্রত্যেকটি বাক্য উক্ত দ্বিবিধ ক্রিয়ার উপকরণ হওয়া উচিত। কিন্তু বেদে এমন কতকগুলি বাক্য আছে, উপাসনা বা যজ্ঞে যাহাদের কোন উপযোগিতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ 'সোঽরোদীৎ। যদরোদীৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' (তৈঃ সং ১।৫।১।১), 'প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ' (তৈঃ সং ২।১।১), 'দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রজানন্' (তৈঃ সং ৬।১।৫) প্রভৃতি বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেদ যদি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইত, তাহা হইলে বেদে ঐরূপ নিরর্থক উক্তি থাকিত না। অতএব ঐ সকল উক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষদুষ্ট মনুষ্যবিশেষ বা ঐরূপ মনুষ্যগণকর্তৃকই বেদ রচিত হইয়াছে (৪২)।

(৫) বেদে যে সকল অর্থবাদবাক্য আছে তাহাতে শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ এবং শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ দেখা যায়।

শাস্ত্রবিরোধ, যথা— 'স্তেনং মনঃ' 'অনৃতবাদিনী বাক্' ইত্যাদি বাক্য বেদে বর্ত্তমান। এই সকল উক্তি দ্বারা যথাক্রমে চৌর্য্য ও মিথ্যাভাষণের বিধান দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ চৌর্য্যাদিকার্য্য শাস্ত্রবিগর্হিত।

দৃষ্টবিরোধ, যথা— 'তস্মাদ্ ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চ্চিঃ'। 'তস্মাদর্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূমঃ' (তৈঃ সং ২।১।২) ইত্যাদি উক্তিতে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, আমরা দৃষ্টিশক্তির সাহায্যেই তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারি।

শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ যথা— 'কো হি তদ্ বেদ যদ্যমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা ন বা' (তৈঃ সং ৭।২।২), এই উক্তিটি শাস্ত্রদৃষ্ট বিষয়ের বিরোধী পরলোক যে আছে, এবং তাহাতে যে লোকে কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে, ইহা বেদেই স্বীকৃত হইয়াছে। 'স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' প্রভৃতি বেদবাক্যে পারলৌকিক ফলের পরিষ্কার উল্লেখ দেখা যায়। অথচ উল্লিখিত উক্তিতে এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বেদ অপৌরুষেয় হইলে, তাহাতে উক্ত ত্রিবিধ বিরোধের কোনটিই থাকিতে পারিত না (৪৩)।

(৬) বেদে ইহার কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,

(৪২) আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে ।১।২।১।

(৪৩) শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ ।১।২।২।

যিনি উহা জানেন তাঁহার মুখ শোভিত হয় [ শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদ ] (৪৪)। বস্তুতঃ ঐ বিষয় জানার ফলে কাহারও মুখ শোভিত হইতে দেখা যায় না। ভবিষ্যতে মুখ শোভিত হইবে—এইরূপ উদ্দেশ্যে উহা বলা হইয়াছে— এ কথাও বলা চলে না ; কারণ, উক্ত অংশ জানা বা পড়ার ফলে দীর্ঘকাল পরেও কাহারও মুখ শোভিত হইতে দেখা যায় না। অতএব, এই উক্তিটিই নিষ্ফল। এইরূপ নিষ্ফল উক্তি নিত্য বা অপৌরুষেয় হইতে পারে না ( ৪৫ )।

(৭) বেদে বহু অনর্থক বা মিথ্যা উক্তি দেখা যায়। যথা—"পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি" ( তৈঃ ব্রাঃ—৩।৮।১০।৫) "পশুবন্ধযাজী সর্ব্বাল্লোঁকানভিজয়তি", "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ চৈনমেবং বেদ " ( তৈঃ ব্রাঃ—৫।৩।১২।২ ) ইত্যাদি। বস্তুতঃ গৃহস্থ ব্যক্তিরা নিত্যসাধ্য অগ্নিহোত্রে সর্ব্বদাই পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন। পূর্ণাহুতিদ্বারা যদি সকল লোকই লাভ করা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য যজ্ঞ করা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অথবা এক পশুবন্ধযাগদ্বারা সকল ফল লাভ হইলে অন্য যজ্ঞ করিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব, হয় অন্যান্য যাগের বিধান অনর্থক, না হয়, উল্লিখিত উক্তিসমূহ মিথ্যা। উক্ত পক্ষদ্বয়ের যে কোনটি স্বীকার করিলেই বেদের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় (৪৬)

(৮) বেদে এমন সব বিধান দৃষ্ট হয়, যাহাদের প্রয়োগস্থলই পাওয়া যায় না। যথা—"ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরীক্ষে ন দিবি" (তৈঃ সঃ ৫।২।৭) এই বাক্যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ সকল স্থানেই অগ্নি চয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ, অন্তরীক্ষে অগ্নি-চয়ন করা সম্ভবই নহে, এবং স্বর্গে অগ্নিচয়ন করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাহা ছাড়া পৃথিবীতে অগ্নি চয়ন যদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কোন যজ্ঞই করা চলিবে না ; অথচ যজ্ঞের বিধান বেদই দিয়াছেন। সুতরাং ঈদৃশ উক্তি অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া নিত্য হইতে পারে না (৪৭)।

উল্লিখিত আপত্তিসমূহ প্রদর্শন করতঃ মীমাংসক আচার্য্যগণ অধঃস্থ

( ৪৪ ) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ।২০।১৬।৬।

( ৪৫ ) তথা ফলাভাবাৎ ।১।২।৩।

( ৪৬ ) অন্যানর্থক্যাৎ ।১।২।৪।

( ৪৭ ) অভাগি প্রতিষেধাচ্চ ।১।২।৫।

যুক্তিগুলির সাহায্যে তাহাদিগকে যথাক্রমে খণ্ডন করিয়াছেন। যথা—

(১) পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বেদের এক একটি বিশেষ শাখা যাঁহারা যত্নসহকারে অধ্যাপনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নামানুসারে পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল শাখা কাঠক, কালাপক, পৈপ্পলাদ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কঠ, কলাপ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি মুনিগণ বেদের কোন অংশেরই রচয়িতা নহেন; তাঁহাদের এক একজন বেদের এক একটি অংশের প্রচারক মাত্র। "বৈশম্পায়নঃ সর্ব্বশাখাধ্যায়ী, কঠঃ পুনরিমাং কেবলাং শাখামধ্যাপয়াম্বভূব"—প্রভৃতি বেদের উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, কঠ প্রভৃতি মুনিরা পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত বেদের শাখাবিশেষের অধ্যাপনাই করিয়াছেন; উহা রচনা করেন নাই (৪৮)

বেদের একজন রচয়িতা ছিলেন—একথাও ঠিক নহে; কারণ, শব্দময় ও জ্ঞানময় বেদ অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আদি যুগের মনীষীরা তপস্যার সাহায্যে সনাতন জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া সনাতন শব্দের সাহায্যে তাহার প্রচার করিয়াছেন (৪৯)।

(২) 'ববর প্রাবাহণি' বলিতে প্রবাহণের পুত্র ববরকে বুঝাইতেছে না। প্রশব্দটি প্রকর্ষবাচক এবং বহ্ ধাতুর অর্থ—বহন করা। অতএব প্রাবাহণি শব্দের অর্থ—যে প্রকৃষ্ট-প্রকারে বহন করে। 'ববর' একটি শব্দের অনুকরণ মাত্র। অতএব, উল্লিখিত শব্দ দুইটিদ্বারা নিত্য অর্থই প্রকাশিত হইতেছে। 'কুসুরবিন্দ ঔদ্দালকি' বলিতেও এইরূপ ব্যুৎপত্ত্যর্থেরই গ্রহণ করা হইয়াছে; ব্যক্তি-বিশেষ অর্থে ইহার ব্যবহার হয় নাই (৫০)।

(৩) 'বৃক্ষেরাও যজ্ঞ করিয়াছিল'—প্রভৃতি উক্তি অদ্ভুত নহে। যজ্ঞসাধনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জানাইবার জন্য এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে। লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়—"সন্ধ্যাকালে পশুরাও চলে না; বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের আর কথা কি?" এইরূপ উক্তিদ্বারা বুঝানো হয় যে, সন্ধ্যাকালে

---

(৪৮) আখ্যা প্রবচনাৎ ।১।১।৩০॥

(৪৯) উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বম্ ।১।১।২৯।

(৫০) পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ ।১।১।৩১।

যঃ প্রবাহয়তি স প্রাবাহণিঃ। ববর ইতি শব্দানুকৃতিঃ। তেন যো নিত্যোঽর্থস্তমেবৈতৌ শব্দৌ বদিষ্যতঃ।—শাবরভাষ্য (১।১।৩১)

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিচরণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। বেদের 'বৃক্ষেরাও যজ্ঞ করিয়াছিল' প্রভৃতি বাক্যদ্বারাও এইভাবেই বুঝানো হইয়াছে যে, মনুষ্য মাত্রেরই যজ্ঞ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এতাদৃশ বিধান দানের জন্য উক্তরূপ বাক্য প্রয়োগে মিথ্যা-ভাষণ হয় না। ইহার নাম—অর্থবাদ। বেদের নানাস্থানে এই শ্রেণীর অর্থবাদ-বাক্যের বহু প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদ্বারা বেদের নিত্যতা বা অপৌরুষেয়তা ব্যাহত হয় না। ১।১।৩১ সংখ্যক জৈমিনিসূত্রের শাবরভাষ্যে এই সকল কথা পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে।

(৪) "সোঽরোদীৎ", "যদরোদীৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্"—এই বাক্য দুইটি উপাসনাবিধিরই অঙ্গ। উপাসনাকারী উপাসনা সময়ে তদ্গতচিত্তে ইষ্টদেবতা বা ৺ভগবানের নিকট মনোঽভিলাষ নিবেদনের সময়ে মনের আবেগে রোদন করিতে পারেন—ইহাতে কোন আপত্তি নাই; এই বিধিটিই উক্ত প্রথম বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যটির তাৎপর্য্য এই যে, উপাসনাকালে এইরূপ ভাবাবেগে রোদন করা প্রশংসনীয়ই বটে; নিন্দনীয় নহে।

"প্রজাপতি ··"এই বাক্যের অর্থ—প্রজাপতিও যখন স্বকীয় বপাদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন মানুষও এইরূপ করিতে পারে। সুতরাং এই বাক্যটিও বিধিমূলকই বটে। "দেবাঃ···" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞ বা উপাসনা করিবার সময়ে সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত হওয়া আবশ্যক। দেবতাদের উল্লেখ দ্বারা উক্ত বিধির উদাহরণ দেখানো হইয়াছে; অতএব, এই বাক্যটিও বিধিমূলক। সুতরাং উল্লিখিত বাক্যসমূহের কোনটিকেই ভ্রমাদিদুষ্ট বলা চলে না; এবং ফলে ইহাদের নিত্যত্বও ব্যাহত হয় না। বেদের অন্যান্য স্থলে যে উপাসনার বিধি আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া উক্ত প্রকারের বাক্যগুলির অর্থনির্ণয় করিতে হয়। ঐরূপ করিলেই আর সংশয়ের কারণ থাকে না (৫১)।

(৫) উল্লিখিত তিন প্রকার বিরোধের কোনটিই বস্তুতঃ বেদে নাই। 'স্তেনং মনঃ' কথাটিদ্বারা চৌর্য্যের বিধি দেওয়া হয় নাই। মানুষ ধর্ম্মের প্রতি অবহিত না হইলে তাহার অসংযত মন তাহাকে চৌর্য্যের মত নিন্দনীয় কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে—এইরূপ সতর্কবাণীই উক্ত বাক্যদ্বারা

(৫১) বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।১।২।৭।

উচ্চারণ করা হইয়াছে। 'অনৃতবাদিনী বাক্' কথাটিও অনুরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিতেছে (৫২)।

সায়ংকালে অগ্নিমন্ত্রে এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যমন্ত্রে হোম করিবার জন্য বেদের অন্যস্থানে বিধান দেওয়া হইয়াছে। সেই বিধানের সমর্থক হেতুরূপে তস্মাদ্ ধূম···' ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যে হেতু রাত্রিতে কেবল অগ্নিই দেখা যায়, সেই হেতু অগ্নিমন্ত্রে রাত্রিতে আহুতি দিবে, এবং দিবসে কেবল সূর্যকেই দেখা যায় বলিয়া দিবাভাগে সূর্য্যমন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে—ইহাই উল্লিখিত বেদবাক্যের তাৎপর্য্য (৫৩)। আচার্য্য সায়ণ তাঁহার ঋগ্বেদ-ভাষ্যোপক্রমণিকাতে স্পষ্টভাবেই এই কথা বলিয়াছেন (৫৪)।

"কো হি······" এই বাক্যে পারলৌকিক ফলের নিষেধ করা হয় নাই। কেবলমাত্র তাদৃশ ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে—এই পর্য্যন্তই জানানো হইয়াছে। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" প্রভৃতি বিধির সহিত মিলাইয়া উক্ত বাক্যের অর্থ করিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

"স্বর্গকামঃ·········" প্রভৃতি বেদবাক্য হইতেই পারলৌকিক ফলের বিষয় জানা যায়; অতএব প্রত্যক্ষ-ব্যতিরিক্ত শ্রুতিরূপ প্রমাণও অবশ্য স্বীকার্য্য—ইহাই উল্লিখিত বাক্যের তাৎপর্য্য।

(৬) "শোভতেঽস্য মুখম্" প্রভৃতি বেদবাক্যও মিথ্যা নহে। এইরূপ বাক্যদ্বারা বিদ্যা প্রভৃতির প্রশংসা করা হইয়াছে। গর্গত্রিরাত্রবিধিনামক বেদাংশের শেষে উক্ত বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, যিনি উক্ত বেদাংশ অবগত হন, তিনি শিষ্যদের সম্মুখে উহা ব্যাখ্যা করিবার সময়ে শিষ্যেরা তাঁহার উৎসাহ-দীপ্ত মুখমণ্ডলকে কর্ণাভরণাদিদ্বারা শোভিত মুখের মতই উজ্জ্বল দেখে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই উল্লিখিত

(৫২) রূপাৎ প্রায়াৎ ।১।২।১১॥

যথা স্তেনাঃ প্রচ্ছন্নরূপাঃ, এবং মন ইতি গৌণঃ শব্দঃ ।

—শাবরভাষ্য ( ১।২।১১॥ )

(৫৩) দূরভূয়স্ত্বাৎ ১।২।১২।

(৫৪) যস্মাদ্ রাত্রাবর্চিরেব দৃশ্যতে তস্মাদগ্নিমন্ত্রো রাত্রৌ প্রয়োক্তব্যঃ, সূর্য্যমন্ত্রশ্চ দিবা। ইত্যেবং তয়োর্মন্ত্রয়োঃ স্তুতিঃ। ধূমার্চ্চিষোরদর্শনোপন্যাসস্তু দূরভূয়স্ত্বগুণনিমিত্তঃ।—সায়ণভাষ্য।

বেদবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অতএব ইহাদ্বারাও বেদের নিত্যত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইতেছে না (৫৫)।

(৭) পূর্ণাহুতি, পশুবন্ধযাগ প্রভৃতির প্রশংসার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত বাক্যগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে; অতএব ইহারা অনর্থক নহে। ইহাদিগকে মিথ্যাও বলা যায় না; কারণ 'সকল ব্রাহ্মণকেই খাওয়াইবে' বলিলে যেমন সকল শব্দ পৃথিবীর সমুদয় ব্রাহ্মণকে না বুঝাইয়া কেবলমাত্র গৃহাগত ব্রাহ্মণ-দিগকেই বুঝায়, এখানেও তেমনি যে সকল ফলদানে পূর্ণাহুতির সামর্থ্য আছে, সর্ব্বশব্দটিদ্বারা কেবলমাত্র সেই সকল ফলকেই বুঝানো হইয়াছে। আচার্য্য সায়ণ ঋগ্বেদ-ভাষ্যের উপক্রমণিকাতে পূর্ণাহুতির ত্রিবিধ ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) পূর্ণাহুতির অভাবে আধানরূপ কর্ম্ম অঙ্গ-বিকল হয়, (২) পূর্ণাহুতি দিলে পর আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসাধনের যোগ্যতা লাভ করে, এবং (৩) পূর্ণাহুতিদ্বারা পূর্ণতা লাভ করিলেই কর্ম্মসমূহ যথোক্তফলদানে সমর্থ হইয়া থাকে।

অতএব, পূর্ণাহুতি উক্ত ত্রিবিধ ফলদান করে—এই অর্থেই তাহাকে সর্ব্বফলদাতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সুতরাং এই অর্থবাদ বাক্যটি মোটেই মিথ্যা নহে। পশুবন্ধযাগ প্রভৃতির বেলাও এই ভাবেই অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে (৫৬)।

(৮) 'ন পৃথিব্যা ··· 'এই বাক্যটিকে "হিরণ্যং গৃহীত্বা চেতব্যম্" এই স্থানান্তরস্থিত বাক্যের সহিত অন্বিত করিয়া তাহার অর্থ করিতে হইবে। চয়নকালে হিরণ্য ধারণের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনের জন্যই পৃথিবী প্রভৃতিতে অগ্নি-চয়ন নিষিদ্ধ, এইরূপ বলা হইয়াছে। অন্তরীক্ষাদিতে অগ্নি-

---

(৫৫) সোঽয়ং গর্গত্রিরাত্রবিধেঃ শেষঃ। তদ্‌বিষয়ং বেদনমপি মুখশোভাহেতুঃ, কিমুতানুষ্ঠানমিতি স্তূয়তে। যথা কর্ণাভরণাদিনা মুখং শোভিতং ভবতি, এবং বেদিতুরুৎসাহেন বিকসিতং বদনং শোভিতমিব শিষ্যৈরুদ্বীক্ষ্যতে। অতঃ শোভাসাদৃশ্যগুণযোগাৎ 'শোভতে' ইত্যুচ্যতে।—সায়ণ; ঋগ্বেদ-ভাষ্যোপক্রমণিকা।

(৫৬) পূর্ণাহুতেরভাবে সতি আধানরূপং কর্ম্ম অঙ্গবিকলং ভবতি; তচ্চ বৈকল্যং পূর্ণাহুত্যা সমাধীয়তে ইত্যেকঃ কামঃ; তস্মিন্ সমাহিতে সতি আহবনীয়াদ্যগ্নয়োঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসু যোগ্যা ভবন্তি ইত্যয়মন্যঃ কামঃ; তৈশ্চ কর্ম্মভিস্তৎ তৎ ফলং প্রাপ্যতে ইতি কামান্তরম্। ঈদৃশী সর্ব্বকামাবাপ্তিরাহুত্যন্তরেষপি বিদ্যত ইতি চেৎ? বিদ্যতাং নাম; কিং নশ্ছিন্নম্? ন খল্বেতাবতা পূর্ণাহুতিস্তুতেঃ কাচিদ্ হানিরস্তি। —সায়ণ, ঋঃ, ভাঃ, উঃ।

চয়নের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের নিষেধ অর্থবাদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অর্থবাদের প্রামাণ্য ভারতীয় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মহর্ষি জৈমিনি "অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্ ॥১।২।১৮॥" সূত্রটিদ্বারা এইরূপ উত্তরই দিয়াছেন, এবং শবরস্বামী, সায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই এইভাবে উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উল্লিখিত যুক্তিগুলির সাহায্যে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটি যুক্তিই মীমাংসক আচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তাঁহারা আরও বহু আপত্তির উল্লেখক্রমে সেইগুলিও খণ্ডন করিয়াছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই বিষয়ে দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

## সমালোচনা

মীমাংসক আচার্য্যগণের উল্লিখিত যুক্তিগুলি খুবই সুন্দর, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, উক্ত যুক্তিগুলি দ্বারা শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয়; বাস্তব নিত্যতা নহে। শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের আলোচনাকালে আমরা দেখাইয়াছি যে, ঐ সকল গ্রন্থে শব্দের বাস্তব নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই; কেবলমাত্র ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে। বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত মীমাংসকগণ বেদবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন না; সুতরাং আমরা ধরিয়া লইব যে, মীমাংসকেরাও শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতা স্থাপনের জন্যই উল্লিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়াছেন। বেদকে যে কারণে অপৌরুষেয় বাক্য বলা হয়, তাহা আমরা শ্রুতির আলোচনাকালে প্রদর্শন করিয়াছি। মীমাংসক আচার্য্যগণের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি।

মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগের ফলে পূর্ব্ব হইতে স্থিত শব্দ প্রকাশ লাভ করে। উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ অবস্থিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন সে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিত, একথাও বলা আবশ্যক। তাই, মীমাংসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, নিত্য পদার্থ আকাশে পূর্ব্ব হইতে সমবায় সম্বন্ধে শব্দ অবস্থিত থাকে। আকাশ নিত্য কি না—এই সম্বন্ধে চিন্তানায়কগণের মধ্যে স্পষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। শ্রুতি, স্মৃতি, এবং পুরাণ সমূহে যখন আকাশকে অনিত্য বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়াছে, তখন আকাশের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা আকাশকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি। মীমাংসকেরা শ্রুতিসমূহকে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; সুতরাং অন্ততঃ আকাশের অনিত্যতা-সম্বন্ধীয় শ্রুতিগুলিকে তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। যে সকল শ্রুতিতে শব্দকে অক্ষর এবং ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে যে, শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করার ফলেই তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রণবকে অক্ষর বলার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণব-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম অক্ষর। এই সকল কথা শ্রুতির আলোচনাকালে আলোচিত হইয়াছে।

গতকল্য যে গোশব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা উচ্চারণের পরক্ষণেই নিজের আশ্রয় আকাশে বিলীন হইয়া রহিয়াছিল, এবং অদ্য পুনরায় ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টার ফলে সে প্রকাশ লাভ করিল—এইরূপ স্বীকার করিলেও সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত শব্দের উৎপত্তি অস্বীকার করা চলে না। শব্দ সূক্ষ্মাবস্থায় আকাশে বিলীন থাকিলেও তখন তো আমরা তাহাকে শব্দ বলি না। যখন সে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়, কেবলমাত্র তখনই আমরা তাহাকে শব্দ বলিয়া থাকি। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি শব্দ এক সময়ে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রথম উচ্চারণে পূর্ব্বস্থিত শব্দের প্রকাশ স্বীকার করার কোন যুক্তি নাই। তবে, এই প্রথম উচ্চারণের স্থান ও কাল সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা চলে।

মহাত্মা রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার পদার্থ-খণ্ডনম্ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, দিক্, কাল ও আকাশ ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে। "ব্রহ্ম বা হ ইদমগ্র আসীদেকমেব" প্রভৃতি শ্রুতিতে এক মাত্র ব্রহ্মেরই আদিকারণত্বের স্বীকৃতি দেখিয়া উক্ত শ্রুতির সঙ্গে নৈয়ায়িক মতের সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্যেই শিরোমণি মহাশয় উল্লিখিত প্রকার কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বস্তুতঃ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" প্রভৃতি শ্রুতিতে পরিষ্কার ভাষায় পরমাত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ থাকায়, এবং স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও আকাশের উৎপত্তি-বিনাশের বর্ণনা দৃষ্ট

হওয়ায় আচার্য্য শিরোমণির উল্লিখিত উক্তিটিকে আমরা বিচারসহ মনে করি না। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত..." ... "প্রভৃতি বেদোক্ত অঘমর্ষণ মন্ত্রে কালেরও উৎপত্তির উল্লেখ থাকায়, এবং ব্রহ্মের দিক্‌স্বরূপতা, কালস্বরূপতা বা আকাশস্বরূপতা অনুভবসিদ্ধ না হওয়ায় আমরা দিক্, কাল এবং আকাশ প্রত্যেককেই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত মনে করি।

মীমাংসকেরা যদিও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ উৎপত্তি এবং যুগপৎ বিনাশ স্বীকার করেন না, তথাপি পুরাণাদি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাঁহাদের এই মতটিতে আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। মীমাংসকমতে জাতির বিনাশ নাই। ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘটত্বরূপ জাতি বিদ্যমান থাকে বলিয়া মীমাংসকেরা মনে করেন। তাঁহাদের মতে সকল সময়েই একটি না একটি ঘট কোন না কোন স্থানে বিদ্যমান থাকিবে। এই কারণেই তাঁহারা যুগপদ্ ধ্বংস স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ, জাতির বিনাশ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, শরভ, অলর্ক প্রভৃতি জাতির বিনাশ দেখিয়া আমরা তাহা অনুভব করিয়া থাকি।

যাঁহারা বলেন—পৃথিবীর ধ্বংসের পরও অন্য কোন জগতে ঘটের অবস্থিতি থাকে; তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত নহি। অন্য কোন জগতে ঘট থাকিবে—ইহা তাঁহাদের কল্পনা মাত্র; বস্তুতঃ ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

যাঁহারা বলেন—পৃথিবী প্রভৃতি সব কিছুর বিনাশের পরও ঘটত্বরূপ জাতি কালে অবস্থান করে; তাঁহাদের কথাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পুনরায় সৃষ্টি হইবে—একথা আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু সেই সৃষ্টির লোকেরাও যে ঘট ব্যবহার করিবে, তাহার প্রমাণ কোথায়? মানুষের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেশ ও কালভেদে বিভিন্ন প্রকারেরই হইয়া থাকে। প্রস্তর যুগের অসভ্য মানুষ যে সকল দ্রব্য ব্যবহার বা প্রস্তুত করিত, বর্ত্তমানে আমরা তাহা করি না। আবার সম্প্রতি আমরা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত বা ব্যবহার করিতেছি, সহস্র বৎসর পরে হয়ত কোন মানুষই তাহাদের অনেকগুলি প্রস্তুত অথবা ব্যবহার করিবে না। জাগতিক দৃষ্টান্ত দর্শনে এইরূপই মনে হয়। অতএব আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত জাতিনিত্যতার কল্পনা বিচারসহ নহে।

উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের বিনাশ ঘটে কি না—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমেই অন্য একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে—আধুনিক শব্দ (রেডিও) বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যেমন গ্রাহ্য ও

অগ্রাহ্য ( audible and inaudible ) ভেদে শব্দকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মীমাংসকেরাও এইভাবে শব্দদ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন কি না? এইরূপ শব্দদ্বৈবিধ্য স্বীকার করিলে বলা যাইতে পারে যে, উচ্চারণের পরক্ষণেই শব্দের গ্রাহ্য অবস্থার বিলোপ ঘটে এবং তখন সে অগ্রাহ্য অবস্থায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শব্দের এইরূপ সূক্ষ্ম অগ্রাহ্য অবস্থা স্বীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে তাহার স্বীকৃতি নাই। আমরা সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র গ্রাহ্য শব্দকেই শব্দ নামে অভিহিত করি; অগ্রাহ্য শব্দকে নহে। শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলেন যে, অগ্রাহ্য শব্দ যে তরঙ্গদ্বারা বাহিত হয়, তাহা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ; শব্দতরঙ্গ নহে। অতএব, লৌকিক ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উভয়েই অগ্রাহ্য শব্দকে সাধারণ শব্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। সুতরাং শব্দের গ্রাহ্য অবস্থার বিনাশকেই শব্দের বিনাশ বলা অন্যায় নহে। প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়ে যেমন ক্ষিতি বিকৃত হইয়া জলে পরিণত হইলে, তখন আর তাহাকে ক্ষিতি বলা যায় না; তেমনি গ্রাহ্যশব্দ বিকৃত হইয়া অগ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন আর তাহাকে শব্দ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। শব্দের এই গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য অবস্থাদ্বয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগকে অস্বীকার করাও চলে না।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—যখন কোন নাম বা মন্ত্রের মানস জপ করা হয়, তখন কি তাহার শব্দত্ব স্বীকার্য্য নহে? মানস জপে যে নাম বা মন্ত্রের জপ করা হয়, তাহার শব্দত্ব স্বীকার করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সূক্ষ্ম শব্দেরও শব্দত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—মানস জপে যে নামের জপ করা হয়, তাহা বস্তুতঃ নামের স্মরণমাত্র। শব্দের স্মরণ এবং তাহার উচ্চারণ এক বস্তু নহে।

'বিজ্ঞান-ভৈরব' নামক আগম শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ( ১৪৫তম শ্লোকে ) ভাবনা বা বিমর্শস্বরূপ জপকে নাদাত্মক বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে; শব্দাত্মক বলা হয় নাই। এই বিমর্শাত্মক নাদ যে শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বাবস্থা, তাহার বিমর্শমাত্রস্বরূপতাই ইহার প্রমাণ।

'শব্দ করা' কথাটিকে শব্দের ব্যবহার করা অর্থে গ্রহণ করার যে যুক্তিটি মীমাংসকগণ দেখাইয়াছেন, তাহা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। গোময় ( সংগ্রহ ) করা এবং শব্দ ( উচ্চারণ ) করা এক শ্রেণীর বাক্য নহে। 'গোময়ং

কুরু' বলিতে যে গোময় সংগ্রহ করা বুঝায় ইহা অনুভবসিদ্ধ। গোময় শব্দের অর্থ—গরুর বিষ্ঠা। মানুষের পক্ষে গরুর বিষ্ঠা উৎপাদন অসম্ভব বলিয়াই ঐস্থানে কৃধাতুটি সংগ্রহ করা রূপ গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দের ক্ষেত্রে এইরূপ গৌণার্থ কল্পনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। মানুষ যে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু মানুষ কর্তৃক শব্দের সংগ্রহ বা পূর্ব্ব হইতে স্থিত শব্দের ব্যবহার আমরা প্রত্যক্ষ করি না। সুতরাং আমি বলিতে চাই যে, মানুষ কর্তৃক শব্দের উচ্চারণকে শব্দের সৃষ্টি বলা অন্যায় নহে।

কেবল কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগই শব্দ উচ্চারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কারণ নহে। ইচ্ছাপ্রেরিত কৌষ্ঠ বায়ু ঊর্দ্ধদিকে চাপ না দিলে সহস্রবার কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ ঘটিলেও শব্দ উৎপন্ন হয় না। ২।২।১৮ সংখ্যক ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি বাৎস্যায়ন উচ্চারণের লক্ষণদান প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছেন। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণগণও অনুরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ শিক্ষাসূত্রকার শব্দকে বায়ুর বিকার বলিয়াছেন। শব্দ বায়ুর বিকারই হউক, আর আকাশের গুণই হউক, সর্ব্বাবস্থায়ই সে বস্তুতঃ অনিত্য। সুতরাং মানুষের ইচ্ছা এবং চেষ্টা অনিত্য শব্দের উৎপত্তিই সাধন করে। শব্দের নিত্যতা যে বাস্তব নহে, কেবল অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধ শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণেরাও এই সত্য কথাটি স্বীকার করিয়াছেন।

শব্দের নানাত্বের বিপক্ষে মীমাংসকগণ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের মনঃপূত হইতেছে না। সূর্য্যদর্শনের সঙ্গে শব্দশ্রবণের তুলনা হইতে পারে না; কারণ, উভয়ে সমধর্ম্মাক্রান্ত নহে। যখন কোন একজন বিশিষ্ট বক্তা একটি সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন এবং শত শত শ্রোতা তাঁহার কথা শুনিতে থাকে, তখন সূর্য্যদর্শনের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হইলেও যে সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারিত একই প্রকারের বিভিন্ন শব্দ শ্রুত হয়, তখন তাহার নানাত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মনে করুন, জনৈক অসাধারণ লোকের লিখিত একটি বক্তৃতার অনেকগুলি কপি করিয়া বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন সভায় উহা একই সময়ে পাঠ করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সভায় উপস্থিত পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতারা বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারিত একই প্রকার শব্দ যখন সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রবণ করেন, তখন আর সূর্য্য-দর্শনের সঙ্গে তাহার তুলনা-করা চলে না। তাহা ছাড়া একই

ব্যক্তি একই সময়ে তাহার তিনদিকে অবস্থিত তিনজন লোকের উচ্চারিত একই প্রকার শব্দও পৃথক্ পৃথগ্ ভাবেই শুনিতে পারে। দুই তিনটি ছেলেমেয়ে হঠাৎ সাপ দেখিয়া যখন একই সঙ্গে 'সাপ সাপ' বলিয়া চেঁচাইতে থাকে, তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে প্রত্যেকটি বালক বালিকার উচ্চারিত প্রত্যেকটি 'সাপ' শব্দই শুনিতে সমর্থ হন, এবং উচ্চারণগত পার্থক্যদ্বারা কোন্ 'সাপ' শব্দটি কে উচ্চারণ করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শ্রবণ করেন, তখন শব্দের নানাত্ব অস্বীকার করা চলে না, এবং সূর্য্যদর্শনের সঙ্গে তাহার তুলনাও হয় না।

শব্দের এই নানাত্বকে ব্যাবহারিক বলাও অযৌক্তিক। ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি বলিতে যেমন আকাশের মধ্যে কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করা হয়, ইহা তেমন নহে। এখানে বিভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ উচ্চারিত ও পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে শ্রুত হইয়াছে। গতকল্য উচ্চারিত রামশব্দ যদি উচ্চারণের পর আকাশে বিলীন হইয়া থাকে, এবং আজ আবার কণ্ঠ-তালু-সংযোগাদির ফলে সেই প্রকাশ লাভ করে, তাহা হইলেও অদ্যকার উচ্চারণ তাহার নূতন রূপেরই প্রমাণ দেয়। গতকল্য উচ্চারিত রামশব্দ যখন সূক্ষ্ম অগ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন তাহার বিনাশই ঘটিয়াছিল; অদ্য পুনরায় সে নূতন রূপই পরিগ্রহ করিয়াছে।

উচ্চারণসাম্য শব্দের অভিন্নতার কারণ নহে। একই আকারের বিভিন্ন দ্রব্য আমরা প্রত্যহ অবলোকন করিয়া থাকি। ঐ সকল দ্রব্যের আকৃতিগত সাম্য তাহাদের অভিন্নতা প্রমাণ করে না। মনে করুন, শরভচিহ্নিত কতকগুলি টাকা ট্রেজারি হইতে আনিয়া আপনি কয়েকজন লোকের মধ্যে উহা বণ্টন করিলেন। প্রত্যেকটি টাকার আকৃতি এবং ওজন একই প্রকারের। কিন্তু আপনি কি বলিতে পারেন যে, ঐ গুলি ভিন্ন ভিন্ন টাকা নহে? এক্ষেত্রে যেমন আকৃতিগত সাম্য সত্ত্বেও টাকার বিভিন্নতা স্বীকার করা হয়, ঠিক তেমনি উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকিলেও গতকল্য উচ্চারিত রাম শব্দ হইতে অদ্য উচ্চারিত রামশব্দের পার্থক্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অথবা ভেরী, দণ্ড ইত্যাদির সংযোগের ফলে যে বেগের সৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা আকাশে একপ্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া

থাকে—এই কথাটি মীমাংসকেরাও স্বীকার করেন। মীমাংসকমতে উক্ত তরঙ্গ শব্দের প্রকাশক; কিন্তু তরঙ্গ নিজেই শব্দ নহে। মীমাংসকগণের এই অনুমান সত্য নহে। বস্তুতঃ উক্ত তরঙ্গ নিজেই শব্দ। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

উপবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তীকালের প্রায় সকল আচার্য্যই এই বিষয়ে একমত যে, আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাই শব্দ। বায়ুর চাপ বা কোনরূপ আঘাতজনিত বেগের ফলে যখন কোন জলাশয়ে জলতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তখন যেমন সেই জলতরঙ্গগুলিকে আমরা হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারি, শব্দতরঙ্গগুলিকেও আমরা তেমনি কর্ণপটহদ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি। জলতরঙ্গ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে; শব্দতরঙ্গগুলিও তেমনি শব্দ হইতে ভিন্ন নহে। পার্থক্য এই যে, জলতরঙ্গ যেমন পূর্ব্ব হইতে স্থিত জলের মধ্যে উৎপন্ন হয়, শব্দতরঙ্গ সেইরূপ নহে। জলতরঙ্গ আকাশে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু সে আকাশ-স্বরূপ নহে। জলতরঙ্গ হইতে শব্দতরঙ্গের ইহাই বিশেষত্ব।

শব্দতরঙ্গগুলি বায়ুদ্বারা চালিত হয়—ইহা আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রদ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং আধুনিক শব্দ( রেডিও )বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যন্ত্রদ্বারা ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণ শব্দের বায়ুপ্রেরকতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় রেডিও-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তরঙ্গবিশেষকেই শব্দরূপে জানিতে পারিয়া তাহাকে যন্ত্রের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সত্যের আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক রেডিও-বিজ্ঞান এত উন্নত হইতে পারিয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষদৃষ্ট এই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আকাশস্থ তরঙ্গবিশেষই যে শব্দ, এই পরীক্ষিত সত্য কথাটি আচার্য্য ফ্রেডারিক তাঁহার Radio Engineering নামক গ্রন্থের ১৮ শ অধ্যায়ে ৮৫৭ পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। শব্দের স্বরূপ আলোচনাকালে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

চেষ্টার ফলে যে শব্দতরঙ্গের উৎপত্তি হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার বিনাশ ঘটে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তরঙ্গস্বরূপ শব্দের উৎপত্তি এবং বিনাশও স্বীকার করাই উচিত।

শব্দের বিকারের বিরুদ্ধে মীমাংসকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন. তাহা স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বরং এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের যুক্তিটি বেশ সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। আমাদের বিবেচনায় ই প্রভৃতি বর্ণ শব্দ নহে, কিন্তু ই প্রভৃতি বর্ণের ব্যঞ্জক যে ধ্বনিগুলিকে আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহারাই শব্দ। যদিও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শব্দের উচ্চারণ বলিতে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টিকে বুঝায়; তথাপি স্থূলতঃ শব্দের উচ্চারণকেই শব্দ বলা যায়। ইকারের উচ্চারণ হইতে যকারের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক্; সুতরাং ইহারা পৃথক্ শব্দই বটে।

উচ্চ-নীচ শব্দের অভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্য মীমাংসকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা আমি সঙ্গত মনে করি না। ঊর্দ্ধদিকে প্রেরিত কোষ্ঠ বায়ুতে বা মৃদঙ্গাদিতে নিক্ষিপ্ত দণ্ডে যে বেগ সৃষ্টি করা হয়, তাহাই আকাশে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে। উক্ত বেগের অল্পতা এবং আধিক্যবশতঃই শব্দ যথাক্রমে নীচ এবং উচ্চ হইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। বহুলোক যখন একসঙ্গে শব্দ উচ্চারণ করে, তখন তাহাদের প্রত্যেকের দ্বারা সৃষ্ট শব্দ-তরঙ্গসমূহ পরস্পরের গায়ে আহত হইয়া উচ্চতা লাভ করে। এইরূপ তরঙ্গের উচ্চতাই শব্দের উচ্চতার কারণ। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটিকে স্পষ্ট করিতেছি। মনে করুন, একটি জলাশয়ের জল সম্পূর্ণ শান্ত আছে। কয়েকটি বালক খেলা করিবার জন্য সেই জলাশয়ে আসিল। প্রথমে একটি বালক জলের নিকট গিয়া হস্তদ্বারা জলে আঘাত করিল। সেই আঘাতের ফলে জলে বেগের সঞ্চার হইয়া তাহাদ্বারা একটি জল-তরঙ্গের উদ্ভব হইল। তাহার পর একে একে অন্যান্য বালকেরাও জলের নিকট গিয়া ঐরূপ করিতে লাগিল। সকল বালক যখন একযোগে জল আলোড়ন করিবে, তখন নিশ্চয়ই তরঙ্গগুলিও পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইবে। শব্দতরঙ্গের বেলাও এই নিয়ম। শব্দতরঙ্গের এই উচ্চতাকে আধুনিক রেডিও-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ Frequency দ্বারা পরিমাপ করিয়া থাকেন। মহর্ষি জৈমিনির 'নাদবৃদ্ধিপরা' সূত্রটিতেও আমরা এইরূপ অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাই।

শব্দের অন্যপদার্থ-প্রতিপাদনসামর্থ্যদ্বারাও তাহার বাস্তব নিত্যতা প্রমাণিত

হয় না। বস্তুতঃ শব্দ সঙ্কেত(চিহ্ন)-স্বরূপ। মানুষই নিজেদের ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পদার্থকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শব্দরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে। বাচক শব্দগুলি যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে একই শব্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে একই অর্থ বুঝাইত; কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষই শব্দের বাচকতা সৃষ্টি করিয়াছে। শব্দের এই বাচকতার অনাদি-ব্যবহাররূপ নিত্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু ইহা তাহার যথার্থ নিত্যতা নহে। ভারতবর্ষে গো শব্দে গরুনামক জন্তুটিকে বুঝায়; কিন্তু ইহাই ইংলণ্ড বা আমেরিকায় উচ্চারিত হইলে 'গমন'রূপ ক্রিয়া বুঝাইয়া থাকে। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গরুকে বুঝাইবার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

আমার মতে, গতকল্য যে গোশব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, অদ্য উচ্চারিত গোশব্দ তাহার সদৃশ বটে; কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন। আবার দিল্লীতে উচ্চারিত গোশব্দ হইতে কলিকাতায় উচ্চারিত গোশব্দও ভিন্ন। এইরূপে শব্দের ভিন্নতা স্বীকার করিলেও তাহাদের ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকারে কোন বাধা নাই। পাঁচবার বা দশবার যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন একজাতীয় বিভিন্ন শব্দেরই উচ্চারণ হইয়া থাকে; এক শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নহে। উচ্চারণের পরক্ষণে শব্দের অস্তিত্বই থাকে না; সুতরাং একই শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার অসম্ভব।

একটি মুদ্রাযন্ত্রে যখন রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করা হয়, তখন পূর্ব্বে উৎপন্ন মুদ্রা হইতে পরে উৎপন্ন মুদ্রাটিকে আমরা পৃথগ্‌ভাবেই দেখিতে পাই। এই ভাবে যখন ১০টি বা ২০টি মুদ্রা পর পর প্রস্তুত হয়, তখনও তাহাদিগকে আমরা পৃথগ্‌ভাবেই দেখিয়া থাকি। এক্ষেত্রে যেমন একটি টাকাকেই ১০বার বা ২০ বার প্রস্তুত করা হয় না; তেমনি শব্দ উচ্চারণেও একটি শব্দকেই ৫ বার বা ১০ বার উচ্চারণ করা হয় না; পৃথক্ পৃথক্ শব্দেরই উচ্চারণ হইয়া থাকে।

মানুষের মুখ শব্দ-উচ্চারণের যন্ত্র। এই যন্ত্রের বিভিন্নতা থাকিলে শব্দের উচ্চারণেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। রামের উচ্চারিত গোশব্দ হইতে শ্যামের উচ্চারিত গোশব্দের পার্থক্য আমরা শ্রবণমাত্রই বুঝিতে পারি। রামের উচ্চারিত দুইটি গোশব্দও উচ্চারণ-প্রযত্নের অল্পতা ও আধিক্যের ফলে পৃথক্ পৃথক্ রূপেই শ্রুত হইয়া থাকে। একটি যন্ত্রে প্রস্তুত মুদ্রাগুলি উৎপাদন

করিবার সময়ে যদি চাপপ্রদানে সমতা না থাকে, তাহা হইলে যেমন তাহাদের চিহ্নেও সমতা থাকে না, শব্দ-উচ্চারণের বেলাও তেমনি প্রযত্নের অল্পতা ও আধিক্যের ফলে শব্দ-শ্রবণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

শব্দের উচ্চারণ, শব্দতরঙ্গ এবং শব্দের শ্রবণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তরঙ্গ বিশেষই শব্দ এবং এই তরঙ্গের সৃজনকেই শব্দের উচ্চারণ বলা হয়; আর ইহার গ্রহণের নামই শব্দের শ্রবণ।

শব্দের কোন উপাদান না থাকায় তাহার বিনাশ অসম্ভব—এই যুক্তি ঠিক নহে। বস্তুতঃ উপাদানহীন পদার্থেরও বিনাশ দৃষ্ট হয়। আকাশের কোন উপাদান নাই—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু, এই আকাশের অনিত্যতাও বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

শব্দের বায়বীয়তা খণ্ডনের জন্য মীমাংসকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা যথার্থই বটে। শব্দ যদি বায়বীয় উপকরণের দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাকে কর্ণদ্বারা না শুনিয়া চর্ম্মদ্বারা অনুভব করিতাম।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শব্দের বাস্তব নিত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নহে; কেবলমাত্র তাহার ব্যাবহারিক নিত্যতাই প্রমাণ করা সম্ভব। যে সকল আস্তিক এবং নাস্তিক দার্শনিকেরা শব্দের অনিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারাও শব্দের ব্যাবহারিক-নিত্যতা খণ্ডন করিতে পারেন না। সুতরাং শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাই অবশ্য স্বীকার্য্য—ইহাই আমাদের অভিমত।

বেদের নিত্যতা-সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত নিত্যতাও অনাদি-ব্যবহার-সিদ্ধ। সুতরাং আমার বিবেচনায় 'ববরঃ প্রাবাহণিঃ', 'কুসুরবিন্দ ঔদ্দালকিঃ' প্রভৃতি শব্দগুলিদ্বারা কোন মানুষকে বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। বেদের নিত্যতার বিপক্ষে প্রতিপক্ষ অন্যান্য যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাদের খণ্ডনের জন্য মীমাংসকগণের যুক্তিগুলি বেশ সুন্দরই হইয়াছে।

## ন্যায়দর্শন

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—যে হেতু (১) শব্দ উৎপন্ন হয়, (২) ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং (৩) অনিত্য সুখ দুঃখাদির ন্যায় ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে; এই তিনটি কারণে স্বীকার করিতে হইবে যে, শব্দ অনিত্য। (৫৭)

(৫৭) আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবদুপচারাচ্চ।—ন্যায়সূত্র ২।২।১৩।

সম্প্রতি উল্লিখিত যুক্তিত্রয়সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের চিন্তাধারা প্রদর্শন করিতেছি।

(১) সংযোগ অথবা বিয়োগরূপ কারণের দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়। জিহ্বার সহিত কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগই অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণোৎপত্তির হেতু। নিরর্থক শব্দের উৎপত্তিও এইভাবে সংযোগ বা বিয়োগ-নিবন্ধনই হইয়া থাকে। দুইটি হাতের তালু একত্র যুক্ত হইলে বা যে কোন আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি পদার্থের সংযোগে শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে গাছের ডাল ভাঙ্গিবার সময় বা সংযুক্ত দুইটি অঙ্গুলির বিভাগের সময় শব্দ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অতএব সার্থক ও নিরর্থক সকল শব্দই উৎপত্তিধর্ম্মযুক্ত। মহর্ষি গৌতম উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থেই ২।২।১৩ সূত্রে আদিমৎ শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও অবশ্যই থাকিবে। অতএব, নৈয়ায়িক মতে শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই থাকায় শব্দ অনিত্য।

(২) শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কারণ, আমরা কর্ণদ্বারাই শব্দ শুনিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রেই অনিত্য; অতএব শব্দও অনিত্য।

(৩) সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে যেমন তীব্রতা, মন্দতা প্রভৃতির বোধ হয়, শব্দেও তেমনি তীব্রতা ও মন্দতা প্রভৃতির বোধ হইয়া থাকে। ভেরীর শব্দ তীব্র; কিন্তু বীণার শব্দ মন্দ। সিংহের গর্জ্জন অতি তীব্র, কিন্তু কোকিলের কুহুরব অতি মৃদু। ক্রুদ্ধ লোক উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে; কিন্তু মৃদু-প্রকৃতির কুলবধূ অতি মৃদুস্বরে আলাপ করিয়া থাকেন।

সুতরাং তীব্র ও মন্দভেদে যে শব্দের পার্থক্য আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শব্দ যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে, সকল শব্দই একপ্রকার থাকিত। কোন শব্দ তীব্র এবং কোনটি মন্দ হইত না; কারণ, নিত্যপদার্থ বিভাগ-রহিত। আকাশ প্রভৃতি নিত্যপদার্থ সর্ব্বত্রই একরূপ থাকে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শব্দ নিত্য নহে; ইহা কার্য্য। কার্য্য থাকিলেই তাহার একটি কারণ থাকে; সুতরাং সংযোগ এবং বিয়োগ শব্দের উৎপাদক কারণ।

নৈয়ায়িকদের প্রদর্শিত উল্লিখিত যুক্তি তিনটির বিপক্ষে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে, মহর্ষি গৌতম যথাসম্ভব সেইগুলির উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটির বিপক্ষেই স্বকীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

১। আপত্তি—

(ক) উৎপন্ন পদার্থমাত্রেই বিনাশশীল—এ যুক্তি অচল। ঘটধ্বংসের

উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নাই। যে ঘটটি একবার ভাঙ্গা যায়, তাহাকে পুনরায় প্রস্তুত করা যায় না; এই কারণে ঘটধ্বংসের পুনরুৎপত্তি অসম্ভব। এই ঘটধ্বংসরূপ কার্য্য যে উৎপন্ন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং উৎপন্ন ঘটধ্বংসের নিত্যতার দৃষ্টান্তে স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপন্ন পদার্থও নিত্য হইতে পারে।

( খ ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ মাত্রেই অনিত্য—এ যুক্তিও স্বীকার করা চলে না; কারণ, ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হইয়া থাকে; এবং ইহাদের নিত্যতা নৈয়ায়িকেরাও স্বীকার করিয়াছেন।

( গ ) অনিত্য পদার্থের ন্যায় শব্দেরও তীব্র-মন্দাদি ব্যবহার আছে, এই যুক্তিতেও শব্দকে অনিত্য বলা চলে না; কারণ, নিত্যপদার্থেরও অনিত্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার দেখা যায়। অনিত্য পদার্থের মধ্যে যেমন 'বৃক্ষের অংশ' 'কম্বলের অংশ' এইরূপ ব্যবহার আছে, নিত্য পদার্থ আত্মা, আকাশ প্রভৃতির মধ্যেও তেমনি আকাশের অংশ ( ঘটাকাশ, পটাকাশ ), আত্মার অংশ (রামের আত্মা, শ্যামের আত্মা ) প্রভৃতি ব্যবহার দেখা যায়।

উত্তর—

উল্লিখিত আপত্তিত্রয়ের উত্তরে নৈয়ায়িকেরা যথাক্রমে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

( ক ) যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ কোনটিই নাই, তাহাই বস্তুতঃ নিত্য। ঘটধ্বংসের উৎপত্তি থাকায় ইহা যথার্থ নিত্য নহে। যদিও ঘটধ্বংসের নিত্যতা স্বীকার করা হয়; তথাপি তাহাকে গৌণ বলিয়াই বুঝা উচিত। এইরূপ গৌণ-নিত্যের নিত্যত্ব নৈয়ায়িকদের অভিপ্রেত নহে।

( খ ) ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতির ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা হইতে শব্দের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে বহুদূরে বর্ত্তমান শব্দকে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের নাই; কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে শব্দের কাছে যাওয়া বা দূরস্থিত শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে আসা, কোনটিই যুক্তিসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ দূরদেশে উৎপন্ন শব্দ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তাহার ১০ দিকে অপর ১০টি অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করে। ঐ সকল শব্দের প্রত্যেকটি আবার তাহাদের ১০ দিকে নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ নূতন নূতন শব্দ উৎপন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই আমরা শব্দের অনুভব করিতে পারি। অতএব, শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা শব্দসন্তানের ( উৎপন্ন, অতএব বিস্তার প্রাপ্ত

শব্দসমষ্টির) অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া শব্দের অনিত্যতা-সাধনেই সাক্ষ্যদান করিতেছে।

(গ) কোন বস্তুর অংশ বলিতে তাহার কারণ-দ্রব্যকেই বুঝায়। শাখাদি না থাকিলে বৃক্ষ হয় না; অতএব শাখা প্রভৃতি বৃক্ষের কারণদ্রব্য। মনুষ্য বা অন্য কোন জন্তুর হস্তপদাদিও এই কারণেই তাহার কারণ বলিয়া অংশরূপে পরিগণিত। নিত্যদ্রব্যের এইরূপ কোন কারণ না থাকায় তাহার অংশও স্বীকার্য্য নহে। নিত্যদ্রব্য আকাশ, আত্মা প্রভৃতিতে যে অংশের (আকাশের অংশ, আত্মার অংশ ইত্যাদির) ব্যবহার করা হয়, তাহা কল্পনামাত্র। ঐরূপ ব্যবহার যথার্থ নহে। বস্তুতঃ, আকাশ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের কোন অংশ নাই। অনিত্য পদার্থ বৃক্ষ, পশু প্রভৃতির কোন অংশকে কেহ ইচ্ছা করিলেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যইতে পারে; কিন্তু আকাশের কোন কল্পিত অংশকেই কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারে না (৫৮)। ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি কল্পনামূলক মিথ্যা ব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে (৫৯)।

প্রতিপক্ষের যুক্তিত্রয়ের বিপক্ষে উল্লিখিত তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি গৌতম স্বমতের দৃঢ়ীকরণের জন্য পুনরায় যুক্ত্যন্তরের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন—উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকে না; কারণ, তাহা হইলে আমরা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম। কোন আবরক হেতুদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় ঐ সময়ে শব্দের উপলব্ধি হয় না—একথাও বলা চলে না; কারণ তাদৃশ কোন হেতুই দেখা যায় না। যদি বলা হয় যে, উচ্চারণই শব্দের ব্যঞ্জক; উচ্চারণের পূর্ব্বে উক্ত ব্যঞ্জকের অভাব বশতঃ শব্দের উপলব্ধি হয় না; তাহা হইলেও নৈয়ায়িকগণ ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ; কারণ উচ্চারণ শব্দে বিবক্ষাজনিত প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত উদরমধ্যগত বায়ুকর্ত্তৃক কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির প্রতিঘাতকেই বুঝায়। উক্ত প্রতিঘাত সংযোগবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংযোগ যে শব্দের উৎপাদক কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, উচ্চারণের পূর্ব্বে ব্যঞ্জকের অভাবে শব্দের উপলব্ধি হয়

---

(৫৮) ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥

(৫৯) তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্বস্য বিভাগাদব্যভিচারঃ।—ন্যায়সূত্র ২।২।১৫॥
সন্তানানুমানবিশেষণাৎ।—ঐ ২।২।১৬॥
কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানাৎ।—ঐ ২।২।১৭॥

না, একথা ঠিক নহে; বস্তুতঃ তখন শব্দ না থাকায়ই তাহার উপলব্ধি হয় না (৬০)।

২। আপত্তি—শব্দের আবরক কোন পদার্থের উপলব্ধি না হওয়ায় ঐরূপ কোন আবরক দ্রব্য নাই—নৈয়ায়িকদের এই যুক্তি ঠিক নহে। ঐরূপ আবরকের অনুপলব্ধি তাঁহাদের কল্পনামাত্র; ইহা কোন সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায় স্বীকার্য্য নহে।

উত্তর—উক্ত আবরকের অনুপলব্ধির প্রমাণ আছে। উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি; অতএব উপলব্ধি না হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেখানে অনুপলব্ধি আছে। উল্লিখিত স্থানে উপলব্ধি না থাকায় অনুপলব্ধিই প্রমাণিত হইতেছে।

৩। আপত্তি—যে পদার্থকে স্পর্শ করা যায় না, তাহা নিত্য। আকাশ একটি নিত্যপদার্থ, এবং কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শব্দকেও কেহ স্পর্শ করিতে পারে না; অতএব শব্দ নিত্য।

উত্তর—উল্লিখিত যুক্তি ঠিক নহে। কোন কোন নিত্য পদার্থকেও স্পর্শ করা যায়, আবার কোন কোন অনিত্য পদার্থকেও স্পর্শ করা যায় না। পরমাণু একটি নিত্য পদার্থ, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করা যায়; আবার কর্ম্ম একটি অনিত্য পদার্থ; কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করা যায় না। অতএব অস্পর্শত্বরূপ হেতুদ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না।

৪। আপত্তি—যে বস্তু পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত থাকে, কেবলমাত্র তাহাকেই অন্যের নিকট দান করা যায়। শব্দও আচার্য্য কর্তৃক শিষ্যের নিকট প্রদত্ত হয়। এই সম্প্রদানীয়ত্বরূপ হেতু দেখিয়া বুঝা যায় যে, উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ অবস্থিত থাকে; সুতরাং শব্দ নিত্য।

উত্তর—শব্দকে যে সম্প্রদান করা যায়, ইহার সাধক কোন প্রমাণ না থাকায়, ইহা স্বীকার্য্য নহে।

---

(৬০) প্রাগুচ্চারণাদনুপলব্ধেরাবরণাদ্যনুপলব্ধেশ্চ।—ন্যায়সূত্র ২।২।১৮॥

কিমিদমুচ্চারণং নামেতি। বিবক্ষাজনিতেন প্রযত্নেন কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ প্রেরিতস্য কণ্ঠতাল্বাদিপ্রতিঘাতঃ যথাস্থানং প্রতিঘাতাদ্ বর্ণাভিব্যক্তিরিতি। সংযোগবিশেষো বৈ প্রতিঘাতঃ, প্রতিষিদ্ধঞ্চ সংযোগস্য ব্যঞ্জকত্বং তস্মান্ন ব্যঞ্জকাভাবাদগ্রহণম্, অপি ত্বভাবাদেবেতি।

—বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২।২।১৮॥

৫। আপত্তি—শব্দের যে অধ্যাপনা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করিয়া গ্রহণ করাইয়া থাকেন; ইহাই শব্দের অধ্যাপনা। এই অধ্যাপনা শব্দের সম্প্রদান ব্যতীত হইতে পারে না; অতএব শব্দকে যে সম্প্রদান করা হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

উত্তর—শব্দ নিত্য হইলে যেমন তাহার অধ্যাপনা হইতে পারে, তেমনি সে অনিত্য হইলেও তাহার অধ্যাপনার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। শব্দ আচার্য্যের নিকট পূর্ব্ব হইতেই থাকিয়া শিষ্যের নিকট প্রদত্ত হয় না; কিন্তু শিষ্য নৃত্যোপদেশের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব, শব্দে সম্প্রদানীয়ত্ব নাই, এবং সে নিত্যও নহে।

৬। আপত্তি—যাহা অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ) করা যায়, তাহা অবস্থিত দেখা যায়। 'পাঁচবার দর্শন করিতেছে' বলিলে বুঝা যায় যে, অবস্থিত কোন রূপকে পাঁচবার দেখা হইতেছে। শব্দেরও এইরূপ অভ্যাস দৃষ্ট হয়। 'দশবার অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ) অধীত হইয়াছে', 'নয়বার চণ্ডী (শব্দাত্মক গ্রন্থবিশেষ) পাঠ করিয়াছে' ইত্যাদি ব্যবহার হইতে আমরা শব্দের অভ্যাসের প্রমাণ পাই। শব্দ পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান না থাকিলে তাহার অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি) সম্ভব নহে। অতএব যখন শব্দের অভ্যাস হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ অবস্থিত থাকে এবং উচ্চারণের পরেও সে বিনষ্ট হইয়া যায় না। এই কথা স্বীকার করিলে শব্দের নিত্যত্বই স্বীকার করার বিষয় উপস্থিত হয়।

উত্তর—শব্দের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি) হয় সত্য, কিন্তু তাহাদ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব বা অভেদ প্রতিপন্ন হয় না; কারণ, ভেদ থাকিলেও অভ্যাস হইতে পারে। 'আপনি দুইবার নৃত্য করুন', 'সে দিনে তিনবার ভোজন করে' ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যে নৃত্যক্রিয়া করা হয়, পরের বার আবার তাহাই করা হয় না; কিন্তু সেইরূপ নৃত্যের মত নৃত্য করা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি সকাল বেলা যাহা খায়, দ্বিপ্রহরে বা রাত্রিতে আবার তাহাই খায় না; অন্য দ্রব্যই খাইয়া থাকে; অথচ এই সকল স্থানে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির ব্যবহার সর্ব্ববাদীসম্মত। এইরূপে, দ্বিতীয় বার কোন শব্দের উচ্চারণ বলিতে, সেই শব্দের মত অন্য শব্দের উচ্চারণই বুঝিতে হইবে। অতএব, শব্দের অনিত্যত্ব-সাধনে অভ্যাস প্রতিবন্ধক নহে

৭। আপত্তি—যাহা অনিত্য, কোন কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়; কিন্তু শব্দের বিনাশে কোন কারণ দেখা যায় না; অতএব শব্দ নিত্য।

উত্তর—শব্দের বিনাশে কোন প্রত্যক্ষ কারণ না থাকিলেও অনুমানগম্য কারণ আছে। শব্দসন্তানের উপপত্তিদ্বারাই আমরা উক্ত কারণটিকে জানিতে পারি। যখন কোন শব্দ হইতে অপর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন উক্ত দ্বিতীয় শব্দটি তাহার কারণরূপ প্রথম শব্দটিকে বিনষ্ট করে। এইভাবে যে শব্দসন্তানের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে দূরদেশে শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে; অতএব, দ্বিতীয় শব্দই প্রথম শব্দের বিনাশের কারণ। এইভাবে উৎপন্ন সর্ব্বশেষ শব্দটির বিনাশের কারণ কি—এই সংশয়ের উত্তরও নৈয়ায়িকেরা দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন—কুড্য (দেওয়াল) প্রভৃতি প্রতিঘাতি-দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাৎপর্য্য-টীকাকার ভাষ্যকারের উক্তির তাৎপর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ঘনতর দ্রব্যের (কুড্যাদির) সহিত সংযুক্ত আকাশ শব্দের সমবায়ী কারণ হয় না; সুতরাং সেইস্থলে শব্দরূপ অসমবায়ী কারণ থাকিলেও তাহা শব্দান্তর জন্মায় না। প্রতিঘাতি-দ্রব্যসংযোগই চরম শব্দকে বিনষ্ট করে।

মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার ন্যায়-দর্শনের টিপ্পনীতে (৪৫৩ পৃষ্ঠায়) এই প্রসঙ্গে নব্যনৈয়ায়িকদের মতের উল্লেখক্রমে স্বকীয় অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ন্যায়মত সমর্থন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—যে শব্দ আর শব্দান্তর জন্মায় না, এমন চরম শব্দ যখন অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঐ চরম শব্দ ক্ষণিক, অর্থাৎ এক-ক্ষণস্থায়ী; ইহাই স্বীকার্য্য। শব্দরূপ অসমবায়ী কারণ কার্য্যকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াই শব্দান্তরের কারণ হয় বলিয়া তর্ক-বাগীশ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যে শব্দ দ্বিতীয়ক্ষণে থাকে না, তাহা শব্দের অসমবায়িকারণ হয় না—ইহাও স্বীকার্য্য। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করতঃ তর্কবাগীশ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চরম শব্দ একক্ষণস্থায়ী বলিয়া উহা শব্দান্তররূপ কার্য্যের উৎপত্তিকালে (দ্বিতীয়ক্ষণে) না থাকায়, শব্দান্তর জন্মাইতে পারে না।

উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যতার বিপক্ষে আরও বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঘণ্টাতে অভিঘাত করিলে যে তীব্র, তীব্রতর, মন্দ, মন্দতর ভেদে নানাবিধ শব্দের অবিচ্ছেদে

শ্রবণ হয়, তাহাদ্বারা শব্দের নানাত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। শব্দ যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দের অভিব্যক্তির কোন কারণ অবশ্যই উপলব্ধ হইত এবং তাহার আশ্রয়ও কিছু থাকিত, কিন্তু ঐরূপ কোন কারণ উপলব্ধ হয় না, এবং তাহার আশ্রয়ও কিছু পাওয়া যায় না।

যদি বলা হয় যে, শব্দের ঐরূপ অভিব্যক্তির একটি কারণ আছে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ হয় না; তাহা হইলেও উক্ত কারণের একটি আশ্রয় অবশ্যই থাকা উচিত, এবং তাহা প্রমাণসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নিত্যশব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি ঘণ্টাস্থ এবং অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তীব্রত্বাদি-রূপে শ্রুতিভেদ হইতে পারে না; কারণ, এপক্ষে যে অভিব্যঞ্জক পূর্ব্ব-হইতেই ঘণ্টাতে আছে, তাহা একইরূপে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হইবে। যাহা প্রথমে তীব্ররূপে শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইয়াছে, তাহাই আবার অন্যরূপে ঐ শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইতে পারে না। উল্লিখিত অভিব্যক্তির কারণকে সন্তানবৃত্তি বলাও চলে না। সন্তানবৃত্তি বলিতে বুঝায়—যাহা একই সময়ে নানাবিধ হইয়া বর্ত্তমান থাকে। শব্দের অভিব্যক্তির কারণের ঐরূপ নানা-প্রকারতা থাকিলে একই সঙ্গে তীব্র-মন্দাদি নানাবিধ শব্দের শ্রবণ হইত।

তীব্রাদিভেদে শব্দগুলি নানা, কিন্তু নিত্য—ইহাও বলা চলে না; কারণ, তাহা হইলেও একই সময়ে সকল শব্দের শ্রবণ হইত। শব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি ঘণ্টাস্থ হইত, তাহা হইলে তাহার কার্য্যকারিতাও ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত; শ্রবণদেশে বর্ত্তমান শব্দকে সে অভিব্যক্ত করিতে পারিত না।

শব্দের অভিব্যক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ নহে, কিন্তু তাহা অন্য কোথাও বর্ত্তমান থাকে—একথাও বলা চলে না; কারণ, তাহা হইলে এক ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ অন্যান্য ঘণ্টাও বাজিয়া উঠিত। শব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি একটি ঘণ্টায় না থাকিয়াও তাহাতে শব্দ অভিব্যক্ত করিতে পারে; তাহা হইলে, অন্যান্য ঘণ্টায়ও সে একই সঙ্গে কেন শব্দের অভিব্যঞ্জক হইবে না?

তীব্রাদিভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে শ্রুতিভেদ উৎপন্ন হয় না—এই কথার বিপক্ষে শব্দনিত্যতাবাদীর যুক্তি এই যে, তীব্রত্বাদি শব্দের ধর্ম্ম নহে, উহা নাদের ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলেন—তীব্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইভাবে শব্দেই তীব্রত্বাদি ধর্ম্মের বোধ হওয়ায় উহা শব্দেরই ধর্ম্ম বলিতে

হইবে। এইরূপ সর্ব্বজনীন বোধকে ভ্রম বলা যায় না; কারণ, উক্ত স্থলে তাদৃশ ভ্রমের কোন নিমিত্ত নাই। নিমিত্ত-ব্যতীত এইরূপ ভ্রম হইতে পারে না। ভাষ্যকার নিজেও ত্রয়োদশ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, তীব্রত্বাদি শব্দেরই বাস্তব ধর্ম্ম। উক্ত স্থলে তিনি এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে তখন ঐ ঘণ্টায় অভিঘাতরূপ সংযোগের সহকারিরূপে তীব্র ও মন্দ বেগ নামক যে সংস্কার জন্মে, এবং তখন হইতে ঐ ঘণ্টায় যে বেগরূপ সংস্কারের অনুবৃত্তি হয়, তাহাই উক্ত স্থলে নানাশব্দ-সন্তানের অন্য একটি নিমিত্ত। উহার অনুবৃত্তিবশতঃই উল্লিখিত শব্দসন্তানের অনুবৃত্তি হয়। শব্দসন্তানের নিমিত্তান্তররূপ উক্ত বেগরূপ সংস্কার ঘণ্টাস্থ এবং সন্তানবৃত্তি। উক্ত সংস্কারের তীব্রতা ও মন্দতা-বশতঃই উৎপন্ন শব্দেরও তীব্রতা এবং মন্দতা হইয়া থাকে। শব্দে তীব্রতা ও মন্দতারূপ বাস্তব ধর্ম্ম থাকাতেই শব্দের শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয় (৬১)।

শব্দ নিত্য হইলে বেগরূপ সংস্কার তাহার কারণ হওয়া অসম্ভব। নিত্য পদার্থের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্বপক্ষে তাহার তীব্রত্বাদি ধর্ম্মের কোন প্রযোজক না থাকায় শব্দের শ্রুতিভেদও হইতে পারে না। এই সকল যুক্তির সাহায্যে নৈয়ায়িকেরা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, শব্দের শ্রুতিভেদ তাহার অনিত্যতা-সাধনের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শব্দনিত্যতাবাদীরা বলেন—শব্দের বিনাশের কোন কারণ উপলব্ধ না হওয়ায় শব্দের নিত্যতা স্বীকার্য্য। সূত্রকার মহর্ষি গৌতম নিজেই ইহার বিপক্ষে একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—ঘণ্টা যখন বাজিতে থাকে, তখন হস্তদ্বারা তাহাকে চাপিয়া ধরিলে আর শব্দ শোনা যায় না। হস্ত ও ঘণ্টার সংযোগ দ্বারা ঘণ্টাস্থিত বেগরূপ সংস্কার বিনষ্ট হওয়ায় তখন আর শব্দসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই এইরূপ শব্দশ্রবণের অভাব হয়। অতএব, শব্দের বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয় না—একথা ঠিক নহে (৬২)।

---

(৬১) আনিত্যে তু শব্দে ঘণ্টাস্থং সন্তানবৃত্তিসংযোগসহকারিনিমিত্তান্তরং সংস্কারভূতং পটুমন্দমনুবর্ত্ততে। তস্যানুবৃত্ত্যা শব্দসন্তানানুবৃত্তিঃ। পটুমন্দভাবাচ্চ তীব্রমন্দতা শব্দস্য, তৎকৃতশ্চ শ্রুতিভেদ ইতি।

—বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২।২।৩৫ ॥

(৬২) পাণিনিমিত্তপ্রশ্লেষাচ্ছব্দাভাবে নানুপলব্ধিঃ ॥ ন্যায়সূত্র ২।২।৩৬ ॥

সূত্রকার বলিয়াছেন—শব্দবিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়। উক্ত উপলব্ধি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে অথবা অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে হয়, এই বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককারের মতে শব্দশ্রবণের অভাব অনুমানসিদ্ধ। তাঁহারা বলেন—হস্ত ও ঘণ্টার সংযোগের ফলে শব্দশ্রবণের অভাব হওয়ায় অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে বুঝা যায় যে, বেগরূপ সংস্কার নষ্ট হওয়ার ফলেই এইরূপ হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের মতে শব্দশ্রবণের অভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই উপলব্ধ হয়। তিনি টিপ্পনীতে বলিয়াছেন—হস্তদ্বারা ঘণ্টা চাপিয়া ধরিলে যে আর শব্দ শোনা যায় না, তাহার কারণ হস্ত ও ঘণ্টার সংযোগ। এই সংযোগ আমরা চক্ষুর্দ্বারাই দেখিয়া থাকি; অতএব তাঁহার মতে শব্দের বিনাশ-কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে।

প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য মহর্ষি অন্যপ্রকার যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, শব্দবিনাশের কারণ যদি উপলব্ধ নাও হইত, তথাপি তাহাদ্বারা শব্দের নিত্যতা প্রমাণিত হইত না। শব্দনিত্যতাবাদীরা শব্দশ্রবণের অনিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের উল্লিখিত যুক্তি মানিয়া লইলে শব্দশ্রবণকেও নিত্য বলিতে হয়। কারণ, যে যুক্তিতে শব্দের বিনাশ-কারণ উপলব্ধ হয় না, সেই যুক্তিতেই শব্দ-শ্রবণেরও বিনাশ-কারণ উপলব্ধ হয় না (৬৩)।

## সমালোচনা

প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি খণ্ডনের জন্য নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সুন্দরই হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তথাপি সকল বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তিগুলি আমরা সমর্থন করিতে পারি না। নৈয়ায়িকেরা অভাবের পদার্থত্ব স্বীকার করেন; এই কারণে ঘটধ্বংসের দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নূতন যুক্তি দেখাইতে হইয়াছে। আমাদের অনুভব কিন্তু সাক্ষ্য দিতেছে যে, অভাব পৃথক্ পদার্থ নহে; সুতরাং ঘটধ্বংস পৃথক্ পদার্থ না হওয়ায় উৎপন্ন পদার্থের নিত্যতা প্রমাণের জন্য নৈয়ায়িকদের বিপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য নহে।

---

(৬৩) বিনাশকারণানুপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ॥—ন্যায়সূত্র ২।২।৩৭ ॥

আমরা কেন অভাবের পৃথক্ পদার্থত্ব স্বীকার করি না, এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে পদার্থের লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধেই সুদীর্ঘ আলোচনা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অবান্তর বিবেচনা করিয়া এবং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা তাহা হইতে বিরত রহিলাম। কেবলমাত্র এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—অভাবের পৃথক্ পদার্থত্ব স্বীকার না করিলে অন্ধকার গৃহে ঘটাদি দ্রব্য দর্শনের প্রসক্তি জন্মে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া আমি মনে করি না। নৈয়ায়িকমতে আলোকের অভাবই অন্ধকার। কিন্তু বিবেচক পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন—এই আলোক এবং অন্ধকারের কি কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে? যদি বলেন—যাহার বিদ্যমানে দেখা যায়, তাহাই আলোক; তাহা হইলেও অনেকগুলি আপত্তির উদ্ভব হইবে। পেচক প্রভৃতি প্রাণিগণ রাত্রির অন্ধকারে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়; সুতরাং তাহাদের উকীল বলিবেন—চন্দ্রতারকাহীন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে আলোক থাকে, আর দিবাভাগে যখন নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যদেব পূর্ণগৌরবে বিদ্যমান থাকেন, তখনই থাকে অন্ধকার। বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীরা দিনে এবং রাত্রিতে সকল সময়েই প্রায় তুল্যভাবে দেখিতে পায়, সুতরাং তাহাদের উকীল বলিবেন—দিন এবং রাত্রিতে সকল সময়েই আলোক থাকে; কখনই আলোকের অভাব হয় না। অন্ধ লোকেরা দিনে বা রাত্রিতে কোন সময়েই দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহারা বলিবে—আলোক বলিয়া কোন পদার্থই নাই; সকল সময়েই আছে কেবল প্রগাঢ় অন্ধকার। যাঁহারা দিনে দেখেন, কিন্তু রাত্রিতে দেখেন না; তাঁহারা যদি কোন বস্তুর নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যেরাই বা তাহাদের ইচ্ছানুসারে নাম নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না কেন?

তাহা ছাড়া, সকল প্রকার অন্ধকারেই যে মানুষেরা দেখিতে পায় না, এমন নহে। অন্ধকারের ঘনত্বের মধ্যেও কমি-বেশী আছে। অল্প অন্ধকারে আমরা দেখিতে পাই; কেবলমাত্র প্রগাঢ় অন্ধকারেই দেখিতে পাই না। অন্ধকার যতই গাঢ় হইতে থাকে, ততই আমাদের দৃষ্টিশক্তি অধিকতর রুদ্ধ হয়।

আবার অতি গাঢ় অন্ধকারে যেমন আমরা কিছুই দেখিতে পাই না,

তেমনি অতি তীক্ষ্ণ আলোকও তো আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। অতএব যাহার বিদ্যমানে আমরা দেখিতে পাই না, তাহাকে অন্ধকার বলিলে গ্রীষ্ম-কালীন দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যকেও এক হিসাবে অন্ধকার বলিতে হয়; কারণ, উক্ত সূর্য্যের দিকে তাকাইলে আমাদের চোখ ঝলসাইয়া গিয়া সাময়িক-ভাবে দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হয়।

আলোক যেমন মৃদু, মৃদুতর, তীব্র, তীব্রতর, প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন, অন্ধকারের মধ্যেও তেমনি বিভাগ আছে। আলোক কি পরিমাণ মৃদু হইলে তাহাকে অন্ধকার বলিব, এবং অন্ধকার কি পরিমাণ মৃদু হইলে তাহাকে আলোক বলিব, এইরূপ কোন নিয়ম করা সম্ভব নহে।

সকল মানুষের দৃষ্টিশক্তি সমান নহে। সুতরাং একজন মানুষ যাহাকে অন্ধকার বলিবেন, অন্যজন তাহাকেই আলোক বলিয়া বসিবেন। যে অন্ধকার গৃহে স্থিত ঘটটি একজন লোক মোটেই দেখিতে পান না, একই সময়ে সেইখানে থাকিয়া অন্য একজন লোক তাহাকে অস্পষ্ট দেখিতে পান এবং অপর একজন সেই ঘটটিকেই বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পারেন। তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তির বিভিন্নতাই এইরূপ ঘটিবার কারণ।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, উপনেত্র (চশমা) যেমন দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে পদার্থ অবলোকনের সামর্থ্য দান করে, আলোক এবং অন্ধকারেব প্রত্যেকেও তেমনি মনুষ্য বা পেচক প্রভৃতির দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

নৈয়ায়িকেরা তেজঃ এর পদার্থত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, তেজঃ বা আলোকের মৃদু অবস্থার নামই অন্ধকার এবং প্রকট অবস্থার নামই আলোক। মৃদুতর ও মৃদুতম আলোককে যথাক্রমে গাঢ় ও প্রগাঢ় অন্ধকার বলা হয়; আর প্রকটতর এবং প্রকটতম আলোককে যথাক্রমে তীব্র ও অতিতীব্র আলোক বলা হইয়া থাকে। অতএব, আমরা বলিতে চাই যে, অন্ধকার এবং আলোক ভিন্ন পদার্থ নহে; একই পদার্থের দুইটি পৃথক্ অবস্থা।

নৈয়ায়িকেরা জাতির নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন; এই কারণে প্রতি-পক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য তাঁহাদিগকে ঘটত্ব প্রভৃতির ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা হইতে শব্দের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার পার্থক্য প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় জাতিমাত্রেই নিত্য নহে। শরভ, অলর্ক প্রভৃতি কত

জাতি ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এইভাবে, ভবিষ্যতেও আরও কত জাতির বিলোপ ঘটিবে। ঘট, পট প্রভৃতির ব্যবহার যে কোন দিনই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তাহা ছাড় পৃথিবীই যখন অনিত্য, তখন পৃথিবী-সাক্ষাদ্-ব্যক্ত জাতি ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিও অনিত্য হইতে বাধ্য। জাতির নিত্যতা স্বীকারের বিপক্ষে অন্যান্য যুক্তি মৎপ্রণীত "শব্দার্থতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি।

শব্দসন্তানসম্বন্ধে নৈয়ায়িকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা সত্য নহে। বস্তুতঃ একটি শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর সে আর নূতন শব্দ সৃষ্টি করে না। আধুনিক শব্দ( রেডিও )বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, অভিঘাতের ফলে আকাশে একপ্রকার বিশেষ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; ঐ তরঙ্গ-বিশেষই শব্দ। রেডিও-বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্যগণ এই সত্য আবিষ্কারের ফলেই যে শব্দগুলিকে গ্রামোফোন প্রভৃতি যন্ত্রে ধরিয়া রাখিতে, বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দসমূহকে বহুদূরদেশে প্রেরণ করিতে এবং লাউড-স্পীকার নামক যন্ত্রের সাহায্যে মৃদু শব্দগুলিকে নিজের ইচ্ছামত উচ্চ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা সর্ব্বদাই এইভাবে শব্দের ধারণ এবং তাহার দূরদেশে প্রেরণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, অভিঘাতের ফলে উৎপন্ন আকাশস্থ তরঙ্গবিশেষই শব্দ। জলতরঙ্গ যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে, শব্দ-তরঙ্গও তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই অগ্রসর হয়। একটি শব্দতরঙ্গ তাহার দশদিকে আরও দশটি অনুরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি করে—এইরূপ বলিবার পক্ষেও উপযুক্ত কোন প্রমাণ নাই। শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

মহর্ষি বাৎস্যায়ন উচ্চারণের যে লক্ষণটি দিয়াছেন, এই বিষয়েও আমি তাঁহার সঙ্গে একমত নহি। উক্ত মহর্ষি অভিঘাত-বিশেষকেই উচ্চারণ বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু শব্দের উচ্চারণ বলিতে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টিকে বুঝিয়া থাকি। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত এবং শব্দতরঙ্গ-সৃষ্টি এক কথা নহে। অভিঘাত এবং তরঙ্গসৃষ্টি প্রত্যেকেই এক একটি ক্রিয়া বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উভয় ক্রিয়া এক নহে। 'লাঠিদ্বারা আঘাত' একটি ক্রিয়া এবং 'ব্যথার উৎপত্তি'ও একটি ক্রিয়া বটে; কিন্তু তাই বলিয়া কেহই লাঠির আঘাতকে ব্যথার উৎপত্তি বলেন না। বস্তুতঃ ব্যথার উৎপত্তি এবং

লাঠির আঘাতের মধ্যে কার্য্যকারণ-ভাব বিগুমান। লাঠির আঘাতের ফলে ব্যথার উৎপত্তি হয়; সুতরাং লাঠির আঘাত কারণ এবং ব্যথার উৎপত্তি তাহার কার্য্য। এখানেও তেমনি কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির আঘাতের ফলে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়; সুতরাং উক্ত অভিঘাত কারণ এবং শব্দতরঙ্গ-সৃষ্টি তাহার কার্য্য। উল্লিখিত দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে পরিষ্কার কার্য্য-কারণভাব বিগুমান থাকায় আমরা মহর্ষি বাৎস্যায়নের সঙ্গে অভিঘাত-বিশেষকেই উচ্চারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের অভাব-পদার্থের পৃথক্ স্বীকৃতিরই ফল। আমরা অভাবের পৃথক্ পদার্থত্ব স্বীকার করি না বলিয়া তাঁহাদের এই যুক্তিটি আমাদের ভাল লাগিতেছে না। কি কারণে নৈয়ায়িকদের এই যুক্তিটিকে আমি পছন্দ করি না, একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা পরিষ্কার করিতেছি। মনে করুন, একটি বিগ্যালয়ে একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। একজন ছাত্র পড়া শিখিয়া আসে নাই। কাজেই শিক্ষক মহাশয়ের শাসনের ভয়ে সে কোনরূপ জিজ্ঞাসা হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়। এই কারণে দুষ্টবুদ্ধি বালকটি কাঁদ কাঁদ ভাবের অভিনয় করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে জানাইল যে, তাহার পেটে ভীষণ ব্যথা হইতেছে। শিক্ষক মহাশয় এই ছাত্রের স্বভাব জানেন। তাহা ছাড়া অন্য একজন ছাত্রও তাঁহাকে জানাইল যে, পূর্ব্বোক্ত ছাত্রটি ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এইরূপ বলিতেছে। উক্ত ছাত্রটির বস্তুতঃ পেট ব্যথা আছে কি না, কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন— উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি; উপলব্ধি না হইলেই বুঝিতে হইবে যে, অনুপলব্ধি আছে; এবং উপলব্ধির সাহায্যে যেমন কোন বিষয় স্থিরভাবে জানা যায়, অনুপলব্ধিদ্বারাও তেমনি কোন একটি বিষয় স্থিরভাবে জানা যাইতে পারে। নৈয়ায়িকদের এই যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয়— বালকটির পেটে ব্যথা হইতেছে না বলিয়া যখন প্রমাণ করা সম্ভব নহে; তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার পেটে সত্যই ব্যথা হইতেছে। এইরূপ স্বীকৃতির ফলে ছাত্রটি পড়ায় ফাঁকি দিতে পারে বটে, কিন্তু সত্য-নির্দ্ধারণ হয় না; বরং একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আমি বলিতে চাই যে, এইরূপ যুক্তি সত্য-নির্ণয়ের সহায়ক নহে।

নিত্য পদার্থকে স্পর্শ করা যায় না বলিয়া নৈয়ায়িকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা আমার কাছে খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যখন কোন পদার্থকে স্পর্শ করিতেছি বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি, কেবলমাত্র তখনই তাহার স্পর্শ স্বীকার্য্য। স্পর্শের অনুভব না হইলে তাহাকে স্পর্শ বলিয়া স্বীকার করা চলে না। পরমাণুকে স্পর্শ করিতেছি বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না। প্রকৃত পরমাণু স্পর্শযোগ্য নহে বলিয়াই আমার মনে হয়। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, অঙ্গুলি-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পক্ষে দূরে চলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং পরমাণুর স্পর্শানুভূতি না হওয়ায় তাহার স্পর্শও স্বীকার্য্য নহে। তাহা ছাড়া পরমাণু নিত্য কি না, এই সম্বন্ধেও সংশয় আছে। পরমাণুর মধ্যেও পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু প্রভৃতি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবী ও জল যখন বিনাশশীল, তখন তাহাদের পরমাণুও বিনাশশীলই হইবে। প্রলয়কালে পার্থিব পরমাণু বিকৃত হইয়া জলীয় পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়, এবং জলীয় পরমাণুও তৈজস পরমাণুতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এইভাবে তৈজস পরমাণু বায়বীয় পরমাণুতে এবং তাহাও আকাশে বিলীন হয়। আকাশ মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে এবং বুদ্ধিতত্ত্ব পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে বলিয়া পুরাণাদিতে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুরও বিকৃতি এবং বিলয় থাকায় তাহার অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়।

শব্দকে সম্প্রদান করা যায় না বলিয়া নৈয়ায়িকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বেশ সুন্দরই হইয়াছে। আমরাও নৃত্য প্রভৃতির ন্যায় শব্দেরও অনুকরণই হয় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'ন্যায়দর্শন' এর টিপ্পনীতে এই সম্বন্ধে আলোচনা-ক্রমে ন্যায়মত সমর্থন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ৺তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বস্তুতঃ শব্দনিত্যতাবাদীর মতে শব্দের সম্প্রদান হইতেই পারে না। নিত্যপদার্থের সম্প্রদান হয় না। পরন্তু, শব্দে কাহারও স্বত্ব না থাকায় উহার সম্প্রদান অসম্ভব। বহুলোকে একই নিত্য শব্দের সম্প্রদান করে, ইহা হইতে পারে না। যে শব্দ একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার পুনঃ পুনঃ দানও অসম্ভব"—ন্যায়দর্শন-টিপ্পনী, পৃষ্ঠা—৪৪২ ॥

এইভাবে, শব্দের সম্প্রদান অসম্ভব বলিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতঃ ৺তর্কবাগীশ মহাশয় স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, অধ্যাপনা বলিতে

অধ্যাপকের ব্যাপারবিশেষকেই বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গভাষায় অধ্যাপনার একটি লক্ষণও দিয়াছেন। যথা—

"বস্তুতঃ ভাষ্যোক্ত শিষ্যের শব্দপ্রাপ্তি অথবা গৃহীত শব্দের অনুকরণরূপ ফলের অনুকূল অধ্যাপকের ব্যাপার বিশেষই অধ্যাপনা।" ঐ, পৃষ্ঠা—৪৪২ ॥

এই বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথাগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিলে বাস্তবিকই তাহার সম্প্রদানীয়তা স্বীকার করা চলে না। অনিত্য পদার্থেরই সম্প্রদান সম্ভব। নিত্যপদার্থ কাল প্রভৃতিকে কেহ দান করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে শব্দনিত্যতাবাদীর যুক্তিটি ভাল হয় নাই।

সপ্তম আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকেরা যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের চিন্তার গভীরতার প্রমাণ দেয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে জড়বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, তাঁহাদের ঐ ধারার চিন্তা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকদের কল্পিত শব্দসন্তান যে যথার্থ নহে, তাহা রেডিও-বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা যাইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ কেবল চিন্তার সাহায্যে একটি দুরূহ বিষয়ের যে সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পরে আজ তাহা যথার্থ নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলেও ইহাদ্বারা ভারতীয় নৈয়ায়িকদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহাদের গভীর চিন্তাশক্তি চিরকালই বিশ্বের বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট পরম শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ, শব্দ যে তরঙ্গময়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের ২।২।৩৭ সূত্রে যে যুক্তিদ্বারা শব্দনিত্যতাবাদী-দিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা খুবই সুন্দর হইয়াছে। শব্দের বিনাশ-কারণ উপলব্ধ না হওয়ায় যদি শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে একই যুক্তিতে শব্দ-শ্রবণকেও নিত্য বলিতে হয়; কিন্তু শব্দনিত্যতা-বাদীরা শব্দ-শ্রবণের অনিত্যতা স্বীকার করিয়া নিজেদেরই যুক্তির অবমাননা করিয়াছেন। শব্দ-শ্রবণের বিনাশ-কারণ তাঁহারা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। নৈয়ায়িকেরা যে শব্দশ্রবণের প্রতিবন্ধক কোন কারণ স্বীকার করেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, শব্দ নিত্য হইলে তাহার শ্রবণও নিত্য হইত; এবং তাহা হইলে সকল লোক সকল সময়ে একই সঙ্গে জগতের যাবতীয় শব্দ শুনিতে পাইত। এইরূপ শোনা যায় না বলিয়াই বুঝা যায় যে, শব্দে বাস্তব নিত্যতা নাই।

প্রতিপক্ষের অন্যান্য যুক্তির বিপক্ষে নৈয়ায়িকেরা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বেশ সুন্দরই হইয়াছে।

## বৈশেষিক-দর্শন

বৈশেষিক মতে শব্দ অনিত্য। বৈশেষিকেরা বলেন—শব্দ উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক ভেদে শব্দের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই সম্বন্ধে প্রশস্তপাদ বলেন—আত্মা ও মনের সংযোগের ফলে পূর্ব্বানুভূত বর্ণের স্মরণ হয়। তাহার ফলে হয়, বর্ণ উচ্চারণের ইচ্ছা। অতঃপর হয় উচ্চারণের প্রযত্ন। এই প্রযত্নের ফলে আত্মা ও বায়ুর সংযোগ হইয়া বায়ুতে কর্ম্ম বা বেগ উৎপন্ন হয়। এই বেগোৎপত্তির ফলে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে আঘাত করে। তাহার ফলে বদন-সন্নিহিত বায়ু ও আকাশের সংযোগ হইয়া বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশস্তপাদ বলেন যে, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগের ফলে ভেরী ও আকাশের সংযোগ হইয়া তাহারই ফলে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে (৬৪)।

বৈশেষিক-মতে শব্দোৎপত্তির কারণ তিনটি; যথা—(১) সংযোগ (২) বিভাগ, এবং (৩) অপরশব্দ। ভেরী ও দণ্ড প্রভৃতির সংযোগের ফলে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের বিভাগের ফলেও শব্দ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। গাছের ডাল ভাঙ্গিলে যে শব্দ হয়, তাহা বিভাগজই বটে। মানুষের উচ্চারিত শব্দ তাহাদের কণ্ঠ তালু প্রভৃতির সংযোগ এবং বিভাগ উভয়ের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, শব্দজ-শব্দরূপে শব্দের আর একটি প্রকার আছে (৬৫)।

---

(৬৪) স দ্বিবিধঃ—বর্ণলক্ষণঃ ধ্বনিলক্ষণশ্চ। তত্র অকারাদির্বর্ণলক্ষণঃ শঙ্খাদিনিমিত্তো ধ্বনিলক্ষণশ্চ। তত্র বর্ণলক্ষণস্যোৎপত্তিঃ—আত্মমনসোঃ সংযোগাৎ বর্ণোচ্চারণেচ্ছা তদনন্তরং প্রযত্নস্তমপেক্ষমাণাদাত্মবায়ুসংযোগাদ্ বায়ৌ কর্ম্ম জায়তে। স চোর্দ্ধং গচ্ছন্ কণ্ঠাদীনভিহন্তি। ততঃ স্থানবায়ুসংযোগাপেক্ষমাণাৎ স্থানাকাশ-সংযোগাদ্ বর্ণোৎপত্তিঃ। অবর্ণলক্ষণোঽপি ভেরীদণ্ডসংযোগাপেক্ষাদ্ ভের্য্যাকাশসংযোগাদুৎপদ্যতে।

—প্রশস্তপাদভাষ্য ; শব্দপ্রকরণ।

(৬৫) সংযোগাদ্ বিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ ॥—কণাদসূত্র ২।২।৩১ ॥

সংযোগাদ্ ভেরীদণ্ডাদিসংযোগাৎ, বিভাগাদ্ বংশে পাট্যমানে। তত্র

প্রশস্তপাদ বলেন, সংযোগ অথবা বিভাগের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই বীচিতরঙ্গন্যায়ানুসারে শব্দসন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই শব্দ-সন্তান যখন কর্ণপর্য্যন্ত পৌছে, তখনই শব্দের শ্রবণ হয়। প্রশস্তপাদের মতে এইরূপ শ্রুত শব্দই শব্দজ শব্দ (৬৬)। আচার্য্য শঙ্কর-মিশ্রও তাঁহার উপস্কার নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে অনুরূপ শব্দকেই 'শব্দজ শব্দ' নামে অভিহিত করিয়াছেন (৬৭)।

শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নৈয়ায়িকেরা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই বিষয়ে বৈশেষিকদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলিও প্রায় সেইরূপ। বৈশেষিকেরা বলেন—কেবলমাত্র উচ্চারণের সমকালেই শব্দের শ্রবণ হয়; উচ্চারণের পূর্ব্বে বা পরে শব্দের শ্রবণ হয় না। যে সময়ে শব্দের শ্রবণ হয় না, সেই সময়ে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। যে সকল বস্তু যথার্থই বিদ্যমান, তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে; সুতরাং অশ্রবণাবস্থায় শব্দসত্তার প্রমাণ না থাকায়ই বুঝা যায় যে, শব্দ কার্য্য, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল (৬৮)।

মহর্ষি কণাদ বলেন—নিত্য পদার্থের সঙ্গে শব্দের বৈধর্ম্ম্য থাকায় শব্দের অনিত্যতা স্বীকার্য্য। আচার্য্য শঙ্করমিশ্র তাঁহার উপস্কার নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে একটি যুক্তিদ্বারা ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আচার্য্য মিশ্র বলেন—পূর্ব্ব হইতে স্থিত ঘটাদি পদার্থকে যখন দীপ প্রকাশ করে, তখন ঘট দেখিয়াই কেহ অনুমান করে না যে, ঘরে দীপ আছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন কুড্যাদির অন্তরালে থাকিয়া শব্দ উচ্চারণ করে, তখন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই শ্রোতা অনুমান করে যে, অমুক ব্যক্তি কথা বলিতেছে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে স্থিত ঘটাদির

---

সংযোগস্তাবন্নাস্ত্যস্য শব্দস্য কারণং তদভাবাৎ তস্মাদ্ বংশদ্বয়বিভাগো নিমিত্তকারণং দলাকাশ-বিভাগশ্চাসমবায়িকারণম্।—উপস্কারঃ।

(৬৬) শব্দাচ্চ সংযোগবিভাগনিষ্পন্নাদ্ বীচিসন্তানবচ্ছব্দসন্তানঃ।—প্রশস্তপাদ ভাষ্য।

ন শ্রোত্রং শব্দদেশং গচ্ছতি নাপি শব্দঃ শ্রোত্রং তয়োর্নিষ্ক্রিয়ত্বাদপ্রাপ্তস্য গ্রহণং ন স্যাদিন্দ্রিয়াণাং প্রাপ্যকারিত্বনিয়মাৎ; অন্যথা ত্বুপলব্ধির্ন স্যাদিতি বীচিতরঙ্গন্যায়েন শব্দসন্তানকল্পনাবশ্যকীত্যর্থঃ। —ঢুণ্ঢীরাজকৃত ভাষ্যবিবরণম্।

(৬৭) যত্র চ দূরে বীণাদাবুৎপন্নঃ শব্দস্তত্র সন্তানরূপেণ উৎপদ্যমানঃ শব্দঃ কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নমাকাশদেশমাসাদয়ন্ গৃহ্যতে; তেন শব্দাদপি শব্দনিষ্পত্তিরিতি।—উপস্কারঃ।

(৬৮) সতো লিঙ্গাভাবাৎ। —কণাদসূত্র ২।২।২৬॥

ন চাশ্রবণদশায়াং শব্দসত্ত্বে প্রমাণমস্তি, তস্মাৎ কার্য্য এবায়ং ন ব্যঙ্গ্য ইতি। —ঐ, উপস্কারঃ।

সঙ্গে শব্দের বৈধর্ম্ম্য বিদ্যমান। ঘট যেমন প্রদীপের দ্বারা ব্যঙ্গ্য, শব্দও যদি সেইরূপ কণ্ঠসংযোগাদিদ্বারা ব্যক্ত হইত, তাহা হইলে শব্দ-শ্রবণে এইভাবে উচ্চারণকারীর অনুমান করা সম্ভব হইত না (৬৯)।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য যুক্তি নৈয়ায়িকদের অনুরূপ বলিয়া তাহা আর পৃথক্ প্রদর্শন করিলাম না।

## সমালোচনা

বৈশেষিক আচার্য্যগণ বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক ভেদে শব্দের মধ্যে যে দুইটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, উহা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। রাম, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে যেমন র প্রভৃতি বর্ণের সহায়তা আবশ্যক, ভেরী প্রভৃতির ধ্বনি 'তা ধিন্' প্রভৃতিতেও তেমনি তকারাদি বর্ণের সহায়তা আবশ্যক হয়। 'তা ধিন্' প্রভৃতি স্থলে ধ্বনিকে অখণ্ড বলিলে 'রাম' প্রভৃতি ধ্বনিকেও অখণ্ড বলিয়াই স্বীকার করা আবশ্যক। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ধ্বনিমাত্রেই বর্ণাত্মক। বর্ণাত্মক ব্যতিরিক্ত কোন ধ্বনির অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না।

মহর্ষি প্রশস্তপাদ বা আচার্য্য শঙ্করমিশ্র তাঁহাদের স্বীকৃত শব্দজ শব্দের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয়, গ্রাহ্য শব্দ মাত্রেই শব্দজ। বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ানুসারে যখন কোন শব্দ দূরদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কেবলমাত্র তখনই তো সে শ্রোতার কর্ণপটহের সংস্পর্শে আসিয়া গ্রাহ্য শব্দে পরিণত হইবে। ইহার পূর্ব্বে যদি তাহার কোন রূপ থাকে, তবে ঐ রূপটি অগ্রাহ্য থাকাই তো স্বাভাবিক। মানুষের উচ্চারিতই হউক, আর বেণু-বীণাদি হইতে উদ্ভূতই হউক, সকল শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটিবে।

বৈয়াকরণেরা স্ফোট নামে শব্দের যে একটি সূক্ষ্ম অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন বৈশেষিক-সম্মত সংযোগজ ও বিভাগজ শব্দগুলি কেবলমাত্র তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; কারণ সংযোগজ এবং বিভাগজ শব্দ বলিতে যদি গ্রাহ্য শব্দকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শব্দজ নামক শব্দের তৃতীয় প্রকার স্বীকারের

---

(৬৯) নিত্যবৈধর্ম্ম্যাৎ ॥—কণাদসূত্র ২।২।২৭ ॥

নিত্যেন সহাস্য শব্দস্য বৈধর্ম্ম্যমুপলভ্যতে যতশ্চৈত্রো বক্তীত্যপাবৃতোঽপি চৈত্রমৈত্রাদির্বচনেনানুমীয়তে। ন চ ব্যঞ্জকঃ প্রদীপাদির্ব্যঙ্গ্যেন ঘটাদিনা কচিদনুমীয়তে। তস্মাজ্জন্য এবায়ং ন ব্যঙ্গ্য ইতি ভাবঃ। —ঐ, উপস্কার।

আর স্থলই থাকে না। বৈয়াকরণ-সম্মত প্রথমোচ্চারিত মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক শব্দ যে পরশ্রবণগোচর হইতে পারে না, তাহা স্ফোটবাদের আলোচনাকালে প্রদর্শন করিব। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, মহর্ষি প্রশস্তপাদের বা আচার্য্য শঙ্করমিশ্রের স্বীকৃত ত্রিবিধ শব্দ স্বীকার করিলে তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটির গ্রাহ্যতা বা পরশ্রবণগোচরতা প্রদর্শন করা সম্ভব নহে।

মহর্ষি কণাদ যখন শব্দের উল্লিখিত ত্রিবিধ ভেদ প্রদর্শন করিয়া সূত্র রচনা করেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি প্রতিধ্বনির কথা ভাবিয়াই 'শব্দজ শব্দ' কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরাও প্রতিধ্বনিকেই শব্দজ-শব্দরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সংযোগজ ও বিভাগজ ভেদে গ্রাহ্য শব্দের দুইটি বিভাগ স্বীকার করিলে আর শব্দজ শব্দরূপে তৃতীয় বিভাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন থাকে না। বস্তুতঃ প্রতিধ্বনি মূল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দান্তর নহে, কিন্তু মূল শব্দেরই প্রত্যাবৃত্ত অবস্থা। একজন লোক দীর্ঘকাল বিদেশে থাকিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিলে যেমন তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়, প্রতিধ্বনিও তেমনি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া থাকে। শব্দতরঙ্গ পর্ব্বতাদিতে প্রতিহত হইয়া যখন উচ্চারণকারীর নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসে, তখনই আমরা তাহাকে প্রতিধ্বনি বলি। মূল শব্দতরঙ্গ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার পর যদি পুনরায় নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে প্রতিধ্বনিকে শব্দজ-শব্দ বলা যাইতে পারিত। বস্তুতঃ, মূল তরঙ্গই সম্মুখের পথ রুদ্ধ দেখিয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আসে; সুতরাং প্রতিধ্বনিকে শব্দজ-শব্দ বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

শব্দের স্বরূপ্ সম্বন্ধে বৈশেষিকেরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ফলেই তাঁহাদের দ্বারা শব্দজ-শব্দরূপে শব্দের অবান্তরবিভাগ কল্পনা করা সম্ভব হইয়াছে। একটি শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পরই যদি সে তাহার দশদিকে আরও দশটি নূতন শব্দ সৃষ্টি করিত, তাহা হইলে এইরূপ সৃষ্টি অব্যাহত গতিতেই চলিত; এবং ফলে বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে উভয়দিকে শব্দের গতি সমান থাকিত। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বায়ুর অনুকূলে শব্দ যতদূর অগ্রসর হয়, প্রতিকূলে ততদূর হয় না। আধুনিক শব্দবিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষাদ্বারা শব্দের তরঙ্গবিশেষ-স্বরূপ প্রকৃত রূপ প্রমাণ করায় বৈশেষিকদের উক্ত অনুমান সত্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তরঙ্গময় শব্দ পর্ব্বতাদিতে প্রতিহত

হইয়া যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে প্রতিধ্বনির শ্রবণই হইত না। একটি বল দেওয়ালের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলে যেমন দেওয়ালে আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বিপরীত গতি লাভ করিয়া নিক্ষেপ কারীর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, শব্দতরঙ্গও তেমনি পর্ব্বতাদিতে প্রতিহত হইয়া উচ্চারণকারীর নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। উচ্চারণের হেতুভূত কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ পর্ব্বতে না থাকায় এবং শব্দের মধ্যেও এইরূপ কোন হেতু না থাকায় পর্ব্বতে নূতন শব্দের উচ্চারণ, বা বিনষ্ট শব্দ হইতে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি ইহাদের কোনটিই সম্ভব নহে।

## সাঙ্খ্যদর্শন

সাঙ্খ্যসূত্রকার মহর্ষি কপিল কি বৈদিক কি লৌকিক কোন শব্দেরই নিত্যতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে; অতএব বেদের সাক্ষ্যদ্বারাই প্রমাণ হয় যে, বেদ নিত্য নহে (৭০)।

লৌকিক শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা যুক্তি দেখান যে, এক ব্যক্তি যেমন ককারাদি বর্ণের উচ্চারণ দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করে, অপর ব্যক্তিও তেমনি সেই রূপ ককারাদি বর্ণের সাহায্যেই পুনরায় সেই শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে; ইহাদ্বারা শব্দের উৎপত্তিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎপন্ন পদার্থমাত্রেই অনিত্য; সুতরাং শব্দও অনিত্য (৭১)।

ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে যে শব্দ শ্রুত হয়, সাঙ্খ্য-সম্প্রদায়ের মতে ঘণ্টাই উক্ত শব্দের আশ্রয়। তাঁহারা বলেন, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে ঐ ঘণ্টাতে বেগরূপ সংস্কার ও কম্প জন্মে। পরে ঐ ঘণ্টাকে হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে তখন কম্প ও বেগের ন্যায় শব্দেরও নিবৃত্তি হয়; সুতরাং, ঐ শব্দ কম্প ও সংস্কারের ন্যায় ঘণ্টাশ্রিত। তাঁহাদের মতে শব্দ আকাশাশ্রিত বা আকাশের গুণ নহে। শব্দ আকাশাশ্রিত হইলে ঘণ্টায় হস্তপ্রশ্লেষের দ্বারা শব্দের নিবৃত্তি

---

(৭০) ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥—সাঙ্খ্যসূত্র, অঃ ৫, সূ ৪৫ ॥

স তপোঽতপ্যত, তস্মাত্তপস্তেপানাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তেত্যাদিশ্রুতের্বেদানাং ন নিত্যত্বমিত্যর্থঃ।—ঐ, সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

(৭১) ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ ॥—সাঙ্খ্যসূত্র, অঃ ৫, সূ ৫৮ ॥

উৎপন্নো গকার ইত্যাদিপ্রত্যয়েনানিত্যত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ।—সাঙ্খ্যপ্রবচন ভাষ্য।

হইতে পারে না। এক আধারে হস্তপ্রক্ষেপ করিলে, তাহা অন্য আধারের বস্তুকেও বিনষ্ট করে—একথাও বলা চলে না ; কারণ, তাহা হইলে শব্দায়মান বহু ঘণ্টার মধ্যে যে কোন একটিকে চাপিয়া ধরিলে সঙ্গে সঙ্গে সকল ঘণ্টার শব্দই নিবৃত্ত হইত। বস্তুতঃ এইরূপ হয় না ; অতএব, এই যুক্তিতে সাঙ্খ্য-মতাবলম্বীরা ঘণ্টাকেই শব্দের আশ্রয় মনে করেন, আকাশকে নহে। মহর্ষি বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ হিসাবে সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের এই মতের উল্লেখক্রমে ইহার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকদের ঐ সকল যুক্তি ন্যায়-মত আলোচনা কালে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই স্থানে মহর্ষি বাৎস্যায়নের প্রদর্শিত যে সাঙ্খ্যমতের কথা বলা হইল, বস্তুতঃ তাহা সমুদয় সাঙ্খ্যাচার্য্যের মত নহে। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা যে শব্দের গুণত্বের অনুকূলে এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি কোন কোন সাঙ্খ্যাচার্য্য তাহার দ্রব্যত্বের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা প্রথম অধ্যায়েই বলিয়াছি।

মহর্ষি কপিল যেমন বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তেমনি তাহার পৌরুষেয়ত্বও স্বীকার করেন না—ইহা তাঁহার মতের একটি বৈশিষ্ট্য (৭২)। সাধারণ অভিমত এই যে, যাহা পৌরুষেয়, তাহাই অনিত্য এবং যাহা অপৌরু-ষেয়, তাহাই নিত্য। অতএব, আপাত-দৃষ্টিতে সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের উল্লিখিত কথা দুইটি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে স্বমতের সমর্থনে সাঙ্খ্যেরা যুক্তি দেখান যে, কোন পুরুষ ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্য করে, তাহাই পৌরুষেয়, কিন্তু তাহার অনিচ্ছাকৃত কর্ম্ম পৌরুষেয় নহে। দৃষ্টান্তরূপে তাঁহারা প্রাণীর নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোন মানুষ বা অন্য প্রাণী যখন নিদ্রায় সম্পূর্ণ অচেতন থাকে, তখনও তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় ; অতএব, ঐ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, এবং ইহার উপর তাহার কোন কর্ত্তৃত্বও নাই। বেদও তেমনি পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-সদৃশ। সুতরাং পরমেশ্বরকে বেদের রচয়িতা বলা

---

(৭২) ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ॥—সাঙ্খ্যসূত্র ৫।৬ ॥

(৭৩) যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ম্।—ঐ ৫।৫০ ॥

দৃষ্ট ইবাদৃষ্টেঽপি যস্মিন্ বস্তুনি কৃতবুদ্ধির্ব্বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ববুদ্ধির্জায়তে তদেব পৌরুষেয়মিতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। ন পুরুষোচ্চরিততামাত্রেণ পৌরুষেয়ত্বম্। শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সুষুপ্তিকালীনয়োঃ পৌরুষেয়ত্বব্যবহারাভাবাৎ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন। বেদাস্তু নিঃশ্বাসবদেবাদৃষ্টবশাদ-

যায় না। অতএব বেদের কোন রচয়িতা না থাকায় ইহা অপৌরুষেয় (৭৩)।

শ্রুতি প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, অনাদিকাল হইতে প্রতি সৃষ্টিতে বেদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বেদের রচয়িতা কেহ নাই। প্রত্যেক সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা একবার সেই পূর্ব্বসিদ্ধ বেদকে স্মরণ করিয়া থাকেন (৭৪)। এই সকল শ্রুতিবাক্য দেখিয়াই সম্ভবতঃ সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রায় এই যে, আদিসৃষ্টিতে ব্রহ্মা যখন সর্ব্বপ্রথম বেদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু উক্ত উচ্চারণ তাঁহার ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় তাহার পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করা চলে না।

বেদের প্রামাণ্য সাঙ্খ্যেরাও স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, বৈদিক শব্দ সমূহের অর্থপ্রতিপাদন করিবার যে একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহা দ্বারাই তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রয়োগ ও ফল দেখিয়া যেমন লোকে তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, বেদের বেলাও তেমনি (৭৫)।

সাঙ্খ্যেরা শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে কোন শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, অর্থপ্রতিপাদন-যোগ্যতা-বিশিষ্ট শব্দের প্রামাণ্যই তাঁহাদের অভিপ্রেত (৭৬)।

---

বুদ্ধিপূর্ব্বকা এব স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি। অতো ন তে পৌরুষেয়াঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদ ইত্যাদিরিতি॥ ৫।৫০॥

—সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

(৭৪) ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তাভূদ্ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।

(৭৫) নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্।—সাঙ্খ্যসূত্র ৫।৫১॥

বেদানাং নিজা স্বাভাবিকী যা যথার্থজ্ঞানজননশক্তিস্তস্যা মন্ত্রায়ুর্ব্বেদাদিবদভিব্যক্তেরুপলব্ধেরখিলবেদানামেব স্বত এব প্রামাণ্যং সিধ্যতি, ন কর্ত্তৃযথার্থজ্ঞানমূলকত্বাদিনেত্যর্থঃ।

—ঐ, সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

(৭৬) আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।—সাঙ্খ্যসূত্র ১।১০১।

আপ্তিরত্র যোগ্যতা। তথা চ যোগ্যঃ শব্দস্তজ্জন্যং জ্ঞানং শব্দাখ্যং প্রমাণমিত্যর্থঃ।

—ঐ, সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

## সমালোচনা

সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের উল্লিখিত অভিমত-সমূহ আলোচনা করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সাঙ্খ্যমতেও শব্দ বস্তুতঃ অনিত্য; কেবলমাত্র তাহার ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা যায়।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রের উল্লিখিত উক্তিগুলি দেখিয়া আমি কেন এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। 'স তপোঽতপ্যত' ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার তপস্যার ফলে বেদের উৎপত্তি হয় (অজায়ন্ত)। এই স্থলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—বেদ নিজেই উৎপন্ন হয় না অন্য কেহ তাহাকে উৎপন্ন করে? ব্রহ্মার তপস্যা বেদসৃষ্টির সহায়ক হেতুমাত্র, জনক হেতু নহে। উহা যদি জনক হেতু হইত, তাহা হইলে তাহাতে পঞ্চমীর পরিবর্ত্তে তৃতীয়া বিভক্তি থাকিত। সাঙ্খ্যেরা অন্যত্রও বেদের কার্য্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। কার্য্য বস্তুমাত্রেরই একটি না একটি কারণ থাকে। বেদের কারণ কি? 'এত ইতি বৈ প্রজাপতিঃ......' প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রজাপতিকে শব্দের উচ্চারণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। উচ্চারণ করিতে হইলেই কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ আবশ্যক। বেদ যদি শব্দময় হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণকারী একজনকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি বেদের জ্ঞানস্বরূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই জ্ঞানকে যিনি সর্ব্বপ্রথম ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকেই উহার প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। বেদের রচয়িতা বলিতে আমরা বুঝি—সংস্কৃত ভাষাময় বেদগ্রন্থের রচয়িতা। জ্ঞানের রচয়িতা কেহ না থাকায় জ্ঞানরূপ বেদের অপৌরুষেয়তা আর ভাষাময় বেদের রচয়িতা থাকায় তাহার পৌরুষেয়তা উভয়ই স্বীকার করা যায়। তাই আমরা শ্রুতিতে দ্বিবিধ উক্তিই দেখিতে পাই। সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের অভিপ্রায়টিকেও যদি আমরা উল্লিখিত অর্থে গ্রহণ করি, কেবলমাত্র তাহা হইলেই বেদের কার্য্যতা এবং অপৌরুষেয়তা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে। বেদ শব্দাত্মক; সুতরাং বেদ যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে শব্দও অবশ্যই কার্য্য হইবে।

বেদ বিরাট্ পুরুষের নিঃশ্বাস-স্বরূপ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে বটে, এবং নিঃশ্বাস বিনা চেষ্টায় উৎপন্ন হয়, ইহাও সত্য; তথাপি কেবলমাত্র এই যুক্তিতে বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করা আমরা সঙ্গত মনে করি না।

বেদ যে শব্দময়, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। মীমাংসকেরা এই কারণেই বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেই সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেদের তুলনা করিয়াছেন। নিঃশ্বাস বস্তুতঃ নিত্য নহে; সুতরাং সাঙ্খ্যেরা বেদেরও নিত্যতা স্বীকার করিলেন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, নিঃশ্বাসের অপৌরুষেয়তা বাস্তব না ব্যাবহারিক? নিঃশ্বাসের কার্য্যত্ব সাঙ্খ্যেরাও স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্য থাকিলেই তাহার একটি কারণ থাকে। নিঃশ্বাসের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা অনায়াসেই জানিতে পারি যে, দেহাশ্রিত চৈতন্যই ইহার কারণ। যতক্ষণ দেহে চৈতন্য থাকে, ততক্ষণই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। দেহে চৈতন্য না থাকিলে আর উহা থাকে না। দেহে চৈতন্যের অবস্থিতি মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কোন মানুষ নিজের বা অপরের কণ্ঠরোধ করিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতে পারে। আবার জলে ডুবিয়া যখন কাহারও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তখনও অনেক সময়ে মানুষের চেষ্টায় তাহা পুনরায় উৎপন্ন করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সকল সময়েই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিলোপ এবং অনেক সময়ে তাহার উৎপত্তি মানুষের ইচ্ছাধীন। এমতাবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে অপৌরুষেয় বলা চলে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শব্দময় বেদের পার্থক্যও পরিস্ফুট। বেদোক্ত শব্দসমূহ বিশেষ বিশেষ অর্থ এবং ভাব বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের এইরূপ ক্ষমতা নাই। সুতরাং আমি বলিতে চাই যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দৃষ্টান্তে বেদকে অপৌরুষেয় না বলিয়া এইরূপ বলাই অধিকতর সঙ্গত যে, শব্দময় বেদ বস্তুতঃ কার্য্য এবং পৌরুষেয়; কেবলমাত্র অসাধারণ পুরুষের রচিত বলিয়া তাহাকে অপৌরুষেয় বলা হয়। বেদের নিত্যতা এবং অপৌরুষেয়তা উভয়েই ব্যাবহারিক; কোনটিই বাস্তব নহে। সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ এইরূপ অভিপ্রায়েই তাঁহাদের উল্লিখিত অভিমতগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইলে শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের সহিত তাঁহাদের মতের আর পার্থক্য থাকে না।

বেদের অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করিলে, ঐ সকল আপত্তিও কার্য্যকরী হয় না।

উপরে যে সাঙ্খ্যমতের কথা বলা হইয়াছে, তদনুসারে শব্দের আশ্রয় আকাশ নহে, এবং শব্দ আকাশের গুণও নহে। এই মত স্থাপনের জন্য

সাঙ্খ্যেরা যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িকদের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে। ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে যে শব্দ শ্রুত হয়, ঘণ্টা ঐ শব্দের আশ্রয়—সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের এই মতের বিপক্ষে দুই একটি যুক্তি প্রদর্শন করা আমরা সঙ্গত মনে করি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং আধুনিক শব্দবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যন্ত্রদ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশিষ্ট বেগরূপ সংস্কার আকাশে একপ্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি করে, এবং ঐ তরঙ্গ কর্ণপটহে পৌছিলেই শব্দ শ্রুত হয়। উক্ত বেগ তরঙ্গের আশ্রয় নহে; তাহার উৎপত্তির করণমাত্র। জলাশয়ে আঘাত করিলে যে জলতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহার আশ্রয় কি?—এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই শব্দতরঙ্গের আশ্রয়ও নির্ণীত হইবে। আমরা সকলেই জানি, জলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, জলই তাহার আশ্রয়; আঘাত তাহার করণমাত্র। শব্দতরঙ্গের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। শব্দতরঙ্গ আকাশে উৎপন্ন হয়, এবং আকাশে সম্প্রসারিত হইয়া তাহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং আকাশই শব্দতরঙ্গের আশ্রয়। কোন কৃত্রিম উপায়ে যদি একটি ঘর হইতে আকাশ অপসারণ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, ঐ ঘরে পুনঃ পুনঃ ঘণ্টায় আঘাত করিলেও শব্দ শ্রুত হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি ন্যায়মত আলোচনা কালে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শব্দায়মান বহু ঘণ্টার মধ্যে একটিকে চাপিয়া ধরিলে সেই ঘণ্টাদ্বারা উৎপন্ন বেগরূপ সংস্কার বিনষ্ট হওয়ায় আর নূতন শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় না; কিন্তু অন্যান্য ঘণ্টা দ্বারা উৎপন্ন ঐরূপ সংস্কার অব্যাহত থাকায় তাহাদের দ্বারা আকাশে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হইতে থাকে। সুতরাং এই সম্বন্ধে সাঙ্খ্যেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। বস্তুতঃ শব্দের কারণ বেগ, বেগের কারণ অভিঘাত, এবং অভিঘাতের আশ্রয় ঘণ্টা। অভিঘাতের আশ্রয় এবং শব্দের আশ্রয় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বেদের অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদনের জন্য সাঙ্খ্যেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিবার মত নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন—কোন মানুষ ইচ্ছা করিয়া যে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা প্রমাণ নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহার অনিচ্ছাকৃত শব্দ বেদ অবশ্যই প্রমাণ। ইহার পক্ষে এবং বিপক্ষে দুই দিকেই যুক্তি আছে। মানুষের ইচ্ছাকৃত শব্দ বা বাক্য অপরকে বঞ্চনা করিবার জন্যও প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু সে সহসা ভয়

পাইয়া বা বিস্মিত হইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে যে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে, তাহাতে ঐরূপ বিপ্রলিপ্সা থাকা সম্ভব নহে; সুতরাং উহাদ্বারা যথার্থ বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। হঠাৎ যখন কেহ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন তাহার ভীতিসূচক ধ্বনি শুনিয়া শ্রোতা বুঝিতে পারেন যে, ঐ লোকটি ভয় পাইয়াছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি কাহাকেও প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়া ভয়ের কারণ না থাকিলেও ঐরূপ ধ্বনি উচ্চারণ করে, তাহা হইলে উহা শুনিয়াও তো শ্রোতার মনে একই প্রকারের জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। কোন্ ধ্বনি ইচ্ছাকৃত এবং কোন্‌টি অনিচ্ছাকৃত, শ্রোতা তাহা কি করিয়া বুঝিবেন? আর তাহা বুঝিতে না পারিলে কোন্ শব্দ প্রমাণ এবং কোন্‌টা অপ্রমাণ, তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে?

অপরপক্ষে, মানুষের অনিচ্ছাকৃত শব্দ বা বাক্যও অপ্রমাণ হইতে দেখা যায়। যখন কোন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে, তখন তাহার ঐরূপ শব্দ বা বাক্য ইচ্ছাকৃত হয় না; অথচ তাহা প্রমাণও নহে। সুতরাং সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের উল্লিখিত যুক্তিটিকে আমরা নির্ভুল বলিতে পারিতেছি না।

শব্দের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য মহর্ষি কপিল যে সূত্র করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ যথার্থ অর্থেই রচিত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্যাখ্যাকারগণ ইহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। কপিল বলিয়াছেন, আপ্তোপদেশরূপ শব্দই প্রমাণ। টীকাকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, সূত্রস্থিত 'আপ্ত' শব্দদ্বারা 'আপ্তিবিশিষ্ট' এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হইতেছে, এবং উক্ত আপ্তি-শব্দের অর্থ 'যোগ্যতা'। সুতরাং তাঁহার মতে উল্লিখিত সূত্রের অর্থ—অর্থপ্রতিপাদনযোগ্যতাবিশিষ্ট শব্দই প্রমাণ। পাঠক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখুন—কোন্ শব্দে অর্থপ্রতিপাদনযোগ্যতা আছে, আর কোনটিতে নাই, শ্রোতা তাহা কি করিয়া বুঝিবেন? আকাশ শব্দ সার্থক; আবার কুসুম শব্দও সার্থক; কিন্তু তাহারা একত্র মিলিত হইয়া যখন 'আকাশ-কুসুম' রূপে উচ্চারিত হয়, তখন তো তাহার কোন অর্থই হয় না। যদিও আকাশ-কুসুম শব্দের একটি গৌণার্থ ('অসম্ভব' এইরূপ অর্থ) পাওয়া যায়, তথাপি গৌণার্থ ও অর্থ এক বস্তু নহে। সকল উচ্চারিত শব্দেরই একটি না একটি গৌণার্থ পাওয়া সম্ভব; কারণ, একেবারে নিরর্থক শব্দের উচ্চারণই হয় না (অনর্থকানামপ্রয়োগঃ)।

কেবল মানুষের উচ্চারিত শব্দই নহে; অন্যান্য ইতর প্রাণীর উচ্চারিত শব্দও একটি না একটি অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যখন বিড়াল 'ম্যাও', কুকুর 'ঘেউ' বা গোবৎস 'হাম্বা' শব্দ উচ্চারণ করে, তখন তাহারাও এই শব্দগুলি দ্বারা একটা কিছু মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কখনও এইরূপ শব্দদ্বারা তাহাদের ক্ষুধা, কখনও ব্যথা, কখনও বা আনন্দ প্রকাশিত হয়। মেঘ-গর্জ্জন দুই মেঘের সঙ্ঘর্ষ জ্ঞাপন করে। গাড়ী, জাহাজ বা বিমানের শব্দ তাহাদের আগমন-সংবাদ প্রকাশ করে। প্রতারক ব্যক্তিরা নানারূপ মিষ্টবাক্যে মানুষকে ভুলাইয়া থাকে। অপরাধী প্রায়ই নিজের অপরাধ অস্বীকার করিয়া তাহারই প্রতিপাদনের জন্য বাক্য উচ্চারণ করে। সুতরাং অর্থপ্রতিপাদন-যোগ্যতা-বিশিষ্ট শব্দমাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে কোন শব্দই আর অপ্রমাণ থাকে না। অথচ বঞ্চক বা মিথ্যাবাদীর বাক্যের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না। এই সকল কারণে আমার মনে হয়, মহর্ষি কপিল উল্লিখিত সূত্রে আপ্ত শব্দটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

আপ্তের লক্ষণ অন্যেরা বলিয়াছেন—"ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবরূপ-দোষচতুষ্টয়রহিতত্বমাপ্তত্বম্।" অর্থাৎ যাহার মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা) এবং করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা; যথা—আন্ধ্য, বধিরতা ইত্যাদি) রূপ চারিটি দোষের একটিও নাই, তিনিই আপ্ত। সাধারণ মানুষ এই লক্ষণদ্বারা লক্ষিত হন না। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই উল্লিখিত চারিটি দোষ হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে; অথচ সাধারণ লোকের কথাও অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়। ছাত্রের কাছে শিক্ষকের কথা প্রমাণ। সন্তানের কাছে মাতা-পিতার বাক্য এবং বিদ্যার্থিগণের নিকট গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত পাঠ্য-পুস্তক সর্ব্বদাই প্রমাণরূপে বিবেচিত হয়। এই কারণে আমরা বলিতে চাই যে, যাঁহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করে, তিনিই আপ্ত, এবং এইরূপ আপ্তের বাক্যই প্রমাণ। মৎপ্রণীত শব্দার্থতত্ত্ব নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই শেষোক্ত অর্থে আপ্ত শব্দটিকে গ্রহণ করিলে বেদাদিশাস্ত্রের প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে, এবং বঞ্চনাকারী বা মিথ্যাবাদীর বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয় না। সুতরাং আপ্তোপদেশ শব্দটিকে মহর্ষি কপিল এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি।

## বেদান্তদর্শন

বেদের অন্ত বা চরমভাগ উপনিষৎ নামে বিখ্যাত। উপনিষৎ অবলম্বনে এবং উপনিষদ্‌বাক্যের প্রামাণ্যের ভিত্তিতে যে দর্শন রচিত হইয়াছে, তাহাই বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদান্তদর্শনকে উত্তরমীমাংসাও বলা হয়। পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা উভয়েই আস্তিক্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য রচিত। পূর্ব্বমীমাংসায় বেদের নিত্যতা, অপৌরুষেয়তা ও অবশ্য-প্রামাণ্য স্থাপিত এবং উত্তরমীমাংসায় ঐগুলি দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাস অন্যান্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনের পর বেদান্তদর্শনের ১।৩।২৯ সূত্রে (৭৭) স্পষ্টভাবেই শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন।

পূর্ব্বমীমাংসায় শব্দ, অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসার মতে দেবতার কোন শরীর নাই; তাঁহারা মন্ত্র-স্বরূপ। উত্তরমীমাংসায় দেবতার শরীর স্বীকার করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে আপত্তি উঠিতে পারে যে, দেবতাদের শরীর থাকিলে তাঁহারা জন্ম-মরণের অধীন হইবেন; কারণ, শরীরী প্রাণিমাত্রেরই জন্ম এবং মৃত্যু আছে। দেবতা-দের জন্ম-মৃত্যু থাকিলে তাঁহারা অনিত্য হইবেন এবং দেবতা অনিত্য হইলে তাঁহাদের বাচক শব্দও অনিত্য হইবে। দেবদত্ত নামক লোকটির যখন একটি পুত্র জন্মে, তাহার পরই ঐ পুত্রের 'যজ্ঞদত্ত' বা ঐরূপ একটা কিছু নাম রাখা হয়। যজ্ঞদত্তের জন্মের পূর্ব্বে যেমন সে থাকে না, তেমনি তাহার বাচক শব্দও থাকে না। এইরূপে দেবতার অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে দেবতার বাচক শব্দের অনিত্যত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। দেবতা প্রভৃতি শব্দ এবং তাহাদের বাচক অর্থ উভয়েই যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধও অনিত্য হইতে বাধ্য।

এই সংশয়ের উত্তরে মহর্ষি ব্যাস বেদান্তদর্শনের ১।৩।২৮ সূত্রে (৭৮) বলিয়াছেন যে, দেবতার শরীর স্বীকৃত হইলেও শব্দের নিত্যতা বা প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না; কারণ দেবতা প্রভৃতি সব কিছুই বৈদিক শব্দ হইতে উদ্ভূত। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এবং আচার্য্য রামানুজও তাঁহার শ্রীভাষ্যে

---

(৭৭) অতএব চ নিত্যত্বম্‌॥১।৩।২৯॥

(৭৮) শব্দ ইতি চেন্নাতঃপ্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌॥১।৩।২৮॥

সূত্রকারের এই অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন (৭৯)। পণ্ডিতপ্রবর নলিনীনাথ রায়ও উক্ত ভাষ্যদ্বয়ের বঙ্গানুবাদে এই সকল কথাই বলিয়াছেন [ বেদান্তদর্শন (বসুমতী সাহিত্য মন্দির) দ্রষ্টব্য ]।

এখানে পুনরায় আপত্তি উঠিতে পারে যে, বেদান্তের ১।১।২ সূত্রে (৮০) জগৎকে ব্রহ্মপ্রভব বলা হইয়াছে, আর এখানে বলা হইল 'সব কিছুই শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়'; তাহা হইলে তো মহর্ষি ব্যাসের নিজের উক্তিদ্বয়ের মধ্যেই বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর এই আপত্তিরও সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শব্দ হইতে যে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা শ্রুতি এবং স্মৃতি হইতে জানিতে পারি। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি হইতে কয়েকটি বাক্য এবং স্মৃতি হইতে কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮১)।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শব্দ হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য শব্দসমূহের উচ্চারণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থ (বস্তু) সমূহের সৃষ্টি হইতে থাকে। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের মতে জগৎকে যেমন ব্রহ্মপ্রভব বলা

---

(৭৯) ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্যানপেক্ষত্বাদিতি বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্। ইদানীন্তু বিগ্রহবতী দেবতাভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্ যুগপদনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত, তথাপি বিগ্রহযোগাদস্মদাদিবজ্জনন-মরণবতী সেতি নিত্যস্য শব্দস্যানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রলীয়মানে, যদ্ বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং তস্য বিরোধঃ স্যাদিতি চেৎ, নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ। কস্মাৎ? অতঃ প্রভবাৎ। অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্ দেবাদিকং জগৎ প্রভবতি।—শাঙ্করভাষ্য।

(৮০) জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২॥

(৮১) এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄংস্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ।—শ্রুতিঃ।

স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।—শ্রুতিঃ।

অনাদি-নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥—স্মৃতিঃ

নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥—স্মৃতিঃ

সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥—স্মৃতিঃ

যায়, তেমনি শব্দপ্রভবও বলা যাইতে পারে ; ইহাতে স্ববচন-বিরোধ হয় না।

এখানে পুনরায় আপত্তি উঠিতে পারে যে, জগতের শব্দপ্রভবত্ব না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু তাহারদ্বারাই বা শব্দের নিত্যতা এবং অর্থের সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ কি করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? কারণ ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতির অনিত্যতা শাস্ত্রেই স্বীকৃত আছে, আর মনুষ্য-প্রভৃতির দেহ যে অনিত্য, তাহা তো আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াই থাকি। সুতরাং শব্দ হইতে ইন্দ্র প্রভৃতির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, ইন্দ্র প্রভৃতির উৎপত্তি এবং বিনাশের সঙ্গে তাঁহাদের বাচক শব্দেরও উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। দেবদত্ত প্রভৃতির বিনাশ দেখিয়াও শব্দের অনিত্যতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সংশয়ের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বমীমাংসার মত অবলম্বনে বলিয়াছেন যে, অর্থের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অর্থজাতিতে গৃহীত হয়, অর্থবস্তুতে নহে ; সুতরাং ইন্দ্র, দেবদত্ত, গো প্রভৃতি ব্যক্তির উৎপত্তি-বিনাশ থাকিলেও তাহাদের জাতির উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই। অন্ততঃ, তাহাদের আদি এবং অন্ত প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় তাহাদের ব্যাবহারিক নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য।

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদান্তিকগণ এইভাবে পূর্ব্বমীমাংসার অনুরূপ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে শব্দের নিত্যতা, অর্থের সহিত শব্দের নিত্যসম্বন্ধ এবং শব্দময় বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালের কোন কোন বৈদান্তিক আবার পরিষ্কার ভাবেই শব্দের অনিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের রচিত বেদান্ত-পরিভাষা নামক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে (৮২)।

## সমালোচনা

উপনিষৎ-সমূহে ব্রহ্ম এবং শব্দ উভয়কেই জগতের কারণ বলা হইয়াছে। এই উভয়বিধ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার পরেও সংশয় থাকিয়া যায়। এই বিষয়ে উপনিষৎ ও সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় দৃষ্টান্তদ্বারা পরিষ্কার করিতেছি।

---

(৮২) অস্মাকন্তু মতে বেদো ন নিত্য উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বঞ্চ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।
—বেদান্ত-পরিভাষা, আগম পরিচ্ছেদ।

কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়ার অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে যাহা অবস্থিত থাকে, তাহা উক্ত বস্তু উৎপাদনের সাধক হইলে, তাহাকেই উল্লিখিত বস্তুর কারণ বলা হয়। এই কারণ দ্বিবিধ—(১) কর্ত্তৃস্বরূপ এবং (২) করণ-স্বরূপ। কুম্ভকার যেমন কুম্ভ প্রস্তুত করে, ব্রহ্মও তেমনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং তিনি এই জগতের কর্ত্তারূপ কারণ। আবার কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিবার সময়ে যেমন দণ্ড, চক্র প্রভৃতি স্বরচিত পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করে, ব্রহ্মও তেমনি বিশ্বসৃষ্টির সময়ে স্বরচিত শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন—আপাত দৃষ্টিতে ইহাই উপনিষৎ ও বেদান্তের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। এই কথা স্বীকার করিলে উপনিষদ্‌-বাক্যে স্ববচন-বিরোধ হয় না সত্য, কিন্তু অন্যবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হয়।

উপনিষদে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে সর্ব্বাকার-রহিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত রূপ যে মানুষের চিন্তারও অতীত, তাহাও স্পষ্ট ভাষায়ই বলা হইয়াছে (৮৩)। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—আকারহীন ব্রহ্ম কেমন করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিলেন? কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ না হইলে যে শব্দের উচ্চারণ হয় না, ইহা তো আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আকারহীন ব্রহ্মের কণ্ঠ, তালু ইত্যাদি না থাকায় তাঁহার পক্ষে শব্দ উচ্চারণ করাও অসম্ভব। কোন জড়পদার্থ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না; অথচ সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র জড় পদার্থই যে ছিল, ইহাও বিজ্ঞান-সম্মত।

এই সংশয়ের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, মানুষ যখন প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে, তখন সে এক একটি দ্রব্য দেখিয়াই উহাদের এক একটি নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। উপনিষৎকারের অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মই মানুষের মুখ দিয়া উল্লিখিত শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে সর্ব্বভূতাশয়স্থিত, ইহা তো উপনিষৎসমূহে স্পষ্ট ভাষায়ই বলা হইয়াছে; সুতরাং মানুষের উচ্চারণকে ব্রহ্মের উচ্চারণ বলায় কোন আপত্তি নাই। মানুষ যখন এক একটি নাম দ্বারা এক একটি বস্তুকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন

---

(৮৩) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ। —কেনোপনিষৎ ১।৩
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। —কঠোপনিষৎ ২।৩।১২
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কদাচন॥
—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (ব্রহ্মবল্লী), ৪র্থ অনুবাক।

মানুষের উচ্চারিত সেই শব্দকেই উপনিষৎকার শব্দের করণ বা হেতুস্বরূপ কারণ বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন। উপনিষৎ পৌত্তলিকতা সমর্থন করেন না; সুতরাং ইহাই যে উপনিষৎকারের অভিপ্রায়, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'নামরূপে ব্যাকরবাণি' প্রভৃতি শ্রুতি এই অর্থই প্রকাশ করিতেছেন।

শব্দের বাস্তব নিত্যতা ব্রহ্মসূত্রকারেরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় না। নিত্যতা যে একটিমাত্র পদার্থেই সম্ভব, ইহা ব্রহ্মসূত্রকারও স্বীকার করেন। সৃষ্টির আদিতে যে একমাত্র ব্রহ্মপদার্থই বিদ্যমান ছিলেন—ইহাও বেদান্ত-সম্মত। শব্দ যে বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহা শব্দব্রহ্মবাদের আলোচনাকালে প্রদর্শন করিব। অতএব ব্রহ্মসূত্রের ১।৩।২৯ সূত্রে যে শব্দের নিত্যতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা ব্যাবহারিক নিত্যতাই বুঝিতে হইবে; বাস্তব নিত্যতা নহে।

উপনিষদে যে শব্দের নিত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা উপনিষৎকারও ব্যাবহারিক নিত্যতার কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং শব্দের অনিত্যতা-সম্বন্ধীয় শ্রুতিগুলির সহিত উল্লিখিত উপনিষদ্-বাক্যসমূহের বিরোধ হইতেছে না। শব্দের বাস্তব নিত্যতা যে প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, তাহা বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, 'বেদান্ত-পরিভাষা' নামক গ্রন্থে শব্দের যে অনিত্যতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে; তাহা বস্তুতঃ ব্যাস, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মতের প্রতিকূল নহে।

## যোগদর্শন

যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; কিন্তু শব্দ নিত্য কি অনিত্য—এই সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। বস্তুতঃ পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র সাঙ্খ্যদর্শনেরই অঙ্গস্বরূপ; সুতরাং যে স্থলে পতঞ্জলি পরিষ্কারভাবে কোন পৃথক্ মত প্রকাশ করেন নাই; বুঝিতে হইবে, সেই স্থলে তিনি সাঙ্খ্য-মতই সমর্থন করিয়াছেন। সাঙ্খ্যমতে যে শব্দ নিত্য নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

যোগদর্শনের ১।২৭ (৮৪) সূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি শব্দ এবং অর্থের একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি ব্যাস উল্লিখিত সম্বন্ধের

---

(৮৪) তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।—যোগসূত্র, সমাধিপাদ, ২৭ সূত্র।

নিত্যতার অনুকূলে মত পোষণ করিয়াছেন (৮৫)। তবে, ভাষ্যকার মহর্ষি ব্যাস যে এই ক্ষেত্রে প্রবাহ-নিত্যতার কথাই বলিয়াছেন, কূটস্থনিত্যতার কথা নহে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পাতঞ্জল যোগদর্শনের (৮৬) ব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে।

## বৌদ্ধদর্শন

বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কোন ব্যক্তির উচ্চারণ ব্যতিরেকে যখন আমরা বাক্য শ্রবণ করি না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন না কোন সময়ে কোন মনুষ্যই প্রথম শব্দের উচ্চারণরূপ সৃষ্টি করিয়াছিল। উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের অস্তিত্ব বৌদ্ধাচার্য্যগণ স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহাদের মতে শব্দের উচ্চারণই তাহার সৃষ্টি। বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং শব্দকেও তাঁহারা ক্ষণস্থায়ীই মনে করিয়াছেন। শব্দের এই অনিত্যত্বসাধনে তাঁহারা অনেকটা নৈয়ায়িকদের মতই যুক্তি প্রদর্শন করেন। বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহ নামক গ্রন্থে এবং টীকাকার আচার্য্য কমলশীল উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধাচার্য্যগণের অভিমত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন (৮৭)।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতের মধ্যে আর একটু বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা কেবল মনুষ্য প্রভৃতি সচেতন বস্তুকেই শব্দোচ্চারণের কারণ মনে করেন নাই; অধিকন্তু, পর্ব্বত, কন্দর প্রভৃতি স্থানকেও শব্দের কারণ মনে করিয়াছেন। মনুষ্যাদির উচ্চারিত শব্দ পর্ব্বতাদি হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে প্রতিধ্বনিত হওয়ার ফলেই তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, মনুষ্যের উচ্চারিত শব্দ পর্ব্বতে আহত হইয়া বিলীন হওয়ার পর তথায় অনেকটা অনুরূপ অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ দ্বিতীয় শব্দই পুনরায় কতকটা

(৮৫) সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।—ঐ, ব্যাসভাষ্য
( সম্প্রতিপত্তি = অর্থ )

(৮৬) অবশ্য ইহা কূটস্থ নিত্যের উদাহরণ নহে। ইহাকে প্রবাহনিত্য বলা যায়।—. পাতঞ্জলদর্শন ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ। হরিহরানন্দ আরণ্য, ধর্ম্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর এম্, এ, পি এইচ্ ডি সম্পাদিত। পৃষ্ঠা—৬৯ )

(৮৭) তত্রাকর্ত্তৃকবাক্যস্য সম্ভবার্থাবিসঙ্গতৌ।
তস্মাদসম্ভবি প্রোক্তং প্রথমং শাব্দলক্ষণম্॥—তত্ত্বসংগ্রহ; কারিকা—১৫০০॥
অকর্ত্তৃকস্য হি বাক্যস্য সম্ভবো, বাপিনঃ ক্ষণভঙ্গস্য সাধিতত্বাৎ, বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা বা।—ঐ পঞ্জিকা।

ভিন্ন আকারে আমাদের শ্রবণ পথের পথিক হইয়া থাকে। প্রতিধ্বনি যদি মূল শব্দ হইতে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে মূল শব্দের উচ্চারণ ও প্রতিধ্বনির উচ্চারণের মধ্যে কোন্ পার্থক্য থাকিত না, ইহাই তাঁহাদের যুক্তি (৮৮)।

## আলোচনা

শব্দের বাস্তব অনিত্যতা স্বীকারে বৌদ্ধাচার্য্যগণের সহিত আমার মতের কোন পার্থক্য নাই বটে; কিন্তু শব্দময় বেদের অবশ্য-প্রামাণ্য স্বীকার না করার পক্ষে আমরা কোন অকাট্য যুক্তি দেখিতে পাই না। এই বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে। বেদের প্রামাণ্য স্বীকারের অনুকূল যুক্তি মীমাংসা-দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতের সহিত আমার মতের আর একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, একটি শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তির যুক্তিটিকে আমি বিচারসহ মনে করি না। প্রতিধ্বনি যে অপর শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় না, তাহা বৈশেষিক দর্শনের আলোচনাকালেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পর্ব্বত, কন্দর প্রভৃতি প্রতিধ্বনিরূপ শব্দের উৎপাদক কারণ নহে; তাহার সঞ্চালক মাত্র। একটি বল যখন মাটিতে পড়িয়া উপরদিকে লাফাইয়া উঠে, তখন যেমন মাটি তাহার উৎপাদক হয় না; পর্ব্বতাদিও তেমনি প্রতিধ্বনির উৎপাদক নহে। মাটিতে আহত হওয়ার সময়ে বলের মধ্যে যে বিপরীত বেগ সংক্রামিত হয়, তাহাই তাহাকে উপরদিকে উত্তোলন করে; কিন্তু এই বেগ বলের চালকমাত্র; উৎপাদক বা করণ নহে। পর্ব্বতাদিতে যখন শব্দতরঙ্গ প্রতিহত হয়, তখন সেও তেমনি বিপরীত বেগদ্বারা বিপরীতদিকে চালিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত এবং বেগ উভয়েই শব্দের গতি-পরিবর্ত্তনের হেতু বটে; কিন্তু শব্দের কারণ নহে। মূল শব্দের উচ্চারণ এবং প্রতিধ্বনির উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য থাকার হেতু বৈশেষিকদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

(৮৮) প্রদেশস্থাপি শব্দকারণত্বমস্ত্যেব, পর্ব্বতকুহরাদাবত্তাদৃশশব্দশ্রবণাৎ।

—পঞ্জিকা (১৫২২ কারিকার ব্যাখ্যা)।

## ব্যাকরণ

বৈয়াকরণেরা শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি পাণিনি "তদশিষ্যং সংজ্ঞা-প্রমাণত্বাৎ" সূত্রে শব্দের নিত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" কথাটিদ্বারা শব্দের নিত্যতা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি "নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈঃ" প্রভৃতি কথাদ্বারা শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মহর্ষি পতঞ্জলি একথাও বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য কি কার্য্য—এই বিষয়ে সংগ্রহ নামক (৮৯) আকর গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ের দোষ, গুণ সকল দিকেরই বিচার আছে (৯০)।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পতঞ্জলির পূর্ব্বেও "শব্দ নিত্য না অনিত্য" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন একখানা বিশাল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত আকর-গ্রন্থ মহর্ষি উপবর্ষের রচিত। অন্যদের মতে উহা উপবর্ষেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বস্তুতঃ, উক্ত আকর গ্রন্থখানা বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য হওয়ায় আমরা এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছুই বলিতে পারি না। মহর্ষি পতঞ্জলি উক্ত আকরগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াও শব্দের নিত্যতা বা অনিত্যতা-সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য অথবা কার্য্য যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে—ইহাই উক্ত আকর গ্রন্থের সিদ্ধান্ত (৯১)। পতঞ্জলির এই লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার উল্লিখিত আকরগ্রন্থে শব্দের নিত্যতা এবং অনিত্যতা সম্বন্ধে কেবল আলোচনাই করা হইয়াছে; কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি উক্ত মুনিত্রয়ের মতের উল্লেখক্রমে (৯২) শব্দের

---

(৮৯) বস্তুতঃ 'সংগ্রহ' গ্রন্থের নাম কি না, এই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

(৯০) কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎ কার্য্যঃ। সংগ্রহে এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্য্যো বেতি। তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। —মহাভাষ্য, পস্পশা।

(৯১) তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ। যদ্যেবং নিত্যঃ, অথাপি কার্য্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি। —মহাভাষ্য; পস্পশা।

(৯২) নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ॥
—বাক্যপদীয়ম্। ব্রহ্মকাণ্ড। শ্লোক ২৩॥

নিত্যতার পক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনে যত্নবান্ হইয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্য তাঁহার 'বাক্যপদীয়ম্' গ্রন্থের প্রথমেই শব্দের ব্রহ্মত্ব ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মতে শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; সুতরাং ইহা নিত্য (৯৩)।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি শব্দ-ব্যক্তির নিত্যতা বা ব্রহ্মতা স্বীকার করেন নাই; তিনি শব্দজাতির নিত্যতা ও ব্রহ্মতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভর্ত্তৃহরি শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। শব্দের বাস্তব নিত্যতা ভর্ত্তৃহরির অভিপ্রেত হইলে তিনি শব্দ-ব্যক্তিরও নিত্যত্ব ও ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিতেন। তাহা ছাড়া স্থূল শব্দ-জাতির নিত্যতাও আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির অভিপ্রেত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। তাঁহার লেখা দেখিয়া মনে হয়, তিনি সূক্ষ্ম শব্দজাতিরই নিত্যতা এবং ব্রহ্মতা স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শব্দব্রহ্মবাদের আলোচনাকালে করা হইবে।

বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ যদিও পুনঃ পুনঃ শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন, তথাপি এই নিত্যতাকে তাঁহারা বাস্তব অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই বার্ত্তিকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহা-ভাষ্যকার জানাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ অনিত্য পদার্থেরও যখন আদি এবং অন্ত ঠিক করিয়া বলা যায় না, তখন তাহারও নিত্যতাই স্বীকার করা হয় ( তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন ব্যাহন্যতে ) এইরূপ নিত্যতাকেই ব্যাবহারিক নিত্যতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। শব্দের এইরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রেত। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিও শব্দের এইরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। শব্দ বস্তুতঃ নিত্য বা অনিত্য যাহাই হউক না কেন, প্রাণিজাতির যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা হয়, শব্দেরও সেইরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য—ইহাই আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির সুচিন্তিত অভিমত (৯৪)।

---

(৯৩) অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন, প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥ —ঐ, ঐ, শ্লোক—১॥

(৯৪) নিত্যত্বে কৃতকত্বে বা তেষামাদির্ন বিদ্যতে।
প্রাণিনামিব সা চৈষা ব্যবস্থানিত্যতোচ্যতে॥

—বাক্যপদীয়ম্। ব্রহ্মকাণ্ড শ্লোক—২৮

পরবর্ত্তিকালে নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ প্রাচীন বৈয়াকরণাচার্য্যগণের অভিমত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শব্দের যেরূপ নিত্যতার কথা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারাও ব্যাবহারিক নিত্যতাই বুঝা যায়। শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মহামতি নাগেশ-ভট্ট বলিয়াছেন যে, শব্দ এবং অর্থ বস্তুতঃ ভিন্ন; কিন্তু এই ভিন্নতা সত্ত্বেও তাহাদের অভিন্নবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে এবং উক্ত ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের অভিন্নবৎ প্রতীতিকেই এখানে তাদাত্ম্য বলা হইয়াছে (৯৫)। নিত্যপদার্থ মাত্র একটিই থাকিতে পারে—এই মতটি স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয় যে, শব্দ এবং অর্থের মধ্যে অন্ততঃ একটি অনিত্য। বৈয়াকরণাচার্য্যগণ শব্দ, অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধ প্রত্যেককেই নিত্য বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে; তাঁহারা ব্যাবহারিক নিত্যতার কথাই বলিয়াছেন; বাস্তব-নিত্যতার কথা নহে।

## অলঙ্কার

অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে 'শব্দ নিত্য কি অনিত্য' এই সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কোন আলোচনাই করা হয় নাই। আচার্য্য দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শ' নামক গ্রন্থে ইষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্ন শব্দসমষ্টিকে কাব্যের শরীর বলিয়াছেন (৯৬)। বস্তুতঃ শরীর মাত্রেই অনিত্য; সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, আচার্য্য দণ্ডী শব্দের বাস্তব অনিত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। আলঙ্কারিক-প্রবর মম্মটভট্ট তাঁহার কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাসে "ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ" বলিয়া বৈয়াকরণ-সম্মত স্ফোটবাদ সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও বস্তুতঃ শব্দের অনিত্যতাবাদী। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত আলঙ্কারিক হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁহার তন্ত্রালোক নামক গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত শব্দজ-শব্দ খণ্ডন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা শব্দের অনিত্যতাই সমর্থিত হয়। অভিনবগুপ্তের মতে শব্দ প্রতিবিম্বিত হয়। নিত্যপদার্থের প্রতিবিম্ব থাকা সম্ভব নহে; সুতরাং তাঁহার এই কথাটিদ্বারাই বুঝা যায় যে, তিনি শব্দের অনিত্যতাবাদী।

---

(৯৫) তাদাত্ম্যঞ্চ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদভেদেন প্রতীয়মানত্বম্।

—লঘুমঞ্জুষা (চৌখাম্বা)। পৃষ্ঠা—৩৮॥

(৯৬) শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী। —কাব্যাদর্শ। প্রথম পরিচ্ছেদ।

অভিনবগুপ্ত বলেন—কোন ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হইয়া বৈখরীনাদ-প্রতিপাদ্য স্থূল শব্দ সমীপবর্ত্তী শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত বা বিম্বিত হয়। অতঃপর তাহা হইতে অন্যস্থানে (আকাশাদিতে) প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই বিম্ব-প্রতিবিম্বের মধ্যস্থলে যাহারা অবস্থিত, তাহারা সকলেই শব্দটি শুনিতে পায়। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকেরা যেভাবে এক শব্দ হইতে অন্য শব্দের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় সত্য নহে (৯৭)। তন্ত্রালোক গ্রন্থের তৃতীয় আহ্নিকে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এই সম্বন্ধে স্বকীয় মত পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—দর্পণে যেমন মুখাদির প্রতিবিম্ব পড়ে, শব্দের প্রতিবিম্বও তেমনি আকাশাদিতে পড়িয়া থাকে (৯৮)। আচার্য্য জয়রথ তন্ত্রালোকের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তের এই অভিপ্রায় আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন (৯৯)।

অভিনবগুপ্ত বলেন—কেবলমাত্র বৈখরীনাদব্যঙ্গ্য শব্দই প্রকাশ লাভ করিতে পারে; এবং এই প্রকাশযোগ্য শব্দেরই প্রতিবিম্ব থাকা সম্ভব। ইহা ক্ষণমাত্রস্থায়ী নহে; কারণ উচ্চারণের পর দ্বিতীয় ক্ষণেই সে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র প্রতিবিম্বিত হওয়ার পর অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণে তাহার বিনাশ সম্ভব (১০০)।

পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে রস প্রভৃতিকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করায় বুঝা যায় যে, রস প্রভৃতির ব্রহ্মত্ব বা নিত্যত্বই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল, শব্দের ব্রহ্মত্ব বা নিত্যত্ব নহে।

---

(৯৭) ন চাসৌ শব্দজঃ শব্দ আগচ্ছত্বেন সংশ্রয়াৎ।...... —তন্ত্রালোক ৩।২৫॥

(৯৮) চিত্রত্বাচ্চাস্য শব্দস্য প্রতিবিম্বং মুখাদিবৎ। —ঐ ৩।২৬॥

(৯৯) বস্তুভূত-শব্দজশব্দস্যজাতীয়ত্বানুপপত্ত্যা নাসৌ শব্দজঃ শব্দঃ, তস্মাদ্ যথা মুখস্য দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বমস্তি তথাস্য মুখ্যস্য শব্দস্যাপি নভসীত্যাহ 'অস্য শব্দস্য প্রতিবিম্বং মুখাদিবৎ' ইতি।

—জয়রথকৃত বিবেকটীকা।

(১০০) শব্দো ন চানভিব্যক্তঃ প্রতিবিম্বতি তদ্ধ্রুবম্।

অভিব্যক্তি-শ্রুতী তস্য সমকালং দ্বিতীয়কে॥ —তন্ত্রালোক ৩।৩৩॥

ক্ষণে তু প্রতিবিম্বত্বং শ্রুতিশ্চ সমকালিকা॥ —ঐ, ৩।৩৪॥

ইহ শব্দস্তাবদনভিব্যক্তোঽনুচ্চারিতঃ প্রতিবিম্বাত্মতাং নাভ্যেতি ইতি নূনমসৌ প্রথমে ক্ষণে স্থানকরণাভিঘাতাদভিব্যক্তঃ সন্ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতামবগাহতে; দ্বিতীয়ে ক্ষণে পুনঃ প্রতিবিম্বভাবমবধানঃ শ্রূয়তে। —ঐ, বিবেকটীকা।

## আধুনিক মত

বর্ত্তমান যুগের কোন কোন মনীষীও শব্দের নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন; এবং কেহ কেহ আজও এইরূপ মতই পোষণ করিয়া থাকেন। মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক "The Arctic Home in the Vedas" নামক গ্রন্থে বেদোক্ত শব্দনিত্যতার উল্লেখ ক্রমে উহা সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, শব্দময় বেদ হইতেই যখন সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এই সর্ব্বসৃষ্টির কারণ-স্বরূপ শব্দাত্মক বেদকে নিত্যই বলিতে হইবে (১০১)।

বস্তুতঃ শব্দাত্মক বেদের উৎপত্তির কথা যে বেদেই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য এই যে, আচার্য্য তিলক যদি ব্যাবহারিক নিত্যতার কথা মনে করিয়াই উল্লিখিত উক্তি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমরা একমত; আর যদি শব্দের বাস্তব নিত্যতাই তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহার উল্লিখিত উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। বর্ত্তমান যুগের অন্যান্য যে সকল মনীষী শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত সম্বন্ধেও আমরা একই কথা বলিতে চাই।

---

(১০১) The Veda is therefore, the original word, the source from which everything else in the world emanates, and as such it can not but be eternal.

—The Arctic Home in the Vedas; Page—418

# তৃতীয় অধ্যায়

## স্ফোটবাদ

ভারতীয় শব্দশাস্ত্রে স্ফোটবাদ শব্দটি সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অতি অল্পসংখ্যক লোকই অবগত আছেন। স্ফোটবাদ-সংক্রান্ত চিন্তা কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম ভারতের চিন্তারাজ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে অতি প্রাচীন-কালেও যে ভারতবর্ষে স্ফোটবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হইত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ অথর্ব্ববেদ (১) এবং ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও যে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শব্দের চারিটি অবস্থার উল্লেখ আছে, 'শব্দের স্বরূপ' প্রকরণেই তাহা বলিয়াছি। মহাভারতেও স্ফোটবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

স্ফোটবাদের প্রাচীনত্ব

মহাভারতের ঐ অংশটুকুকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; কারণ, পরবর্ত্তীকালের কোন কোন বিশিষ্ট মনীষীও ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (প্রথম খণ্ড, ১৪৪ শ্লোক) আচার্য্য পুণ্যরাজও মহাভারতের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগীতা হইতে এই সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও স্ফোটশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (২)।

"অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" (৬।১।১২৩) এই পাণিনির সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, পাণিনির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেও ভারতে স্ফোটবাদের আলোচনা হইত। উল্লিখিত পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কাশিকা-ব্যাখ্যাতা আচার্য্য হরদত্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—সূত্রস্থিত স্ফোটায়ন শব্দদ্বারা স্ফোটবাদী

---

১। অথর্ব্ববেদের প্রাচীনতমত্ব সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬ দ্রষ্টব্য।

২। দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্ কৃতিঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতম্; ১০ ম স্কন্ধ, ৮৫ অধ্যায়।

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ ঐ ১২।৬।৪০

বৈয়াকরণাচার্য্যবিশেষকেই বুঝাইতেছে (৩)। পরবর্ত্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মহামতি নাগেশ ভট্টও তাঁহার স্ফোটবাদ নামক গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, ঋষি স্ফোটায়নের মতগুলিই তিনি পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া এই গ্রন্থে লিখিলেন (৪)। উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে প্রতীত হয় যে, পাণিনিরও বহু পূর্ব্বে জনৈক প্রথিতযশাঃ বৈয়াকরণ স্ফোটতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়া 'স্ফোটায়ন' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্যের বিভিন্ন স্থানে স্ফোটবাদের উল্লেখ করিয়াছেন (৫)। পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া স্ফোটবাদকে অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। মহাত্মা মণ্ডন-মিশ্র 'স্ফোটসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে, এবং মহামনীষী বাচস্পতিমিশ্র 'তত্ত্ববিন্দু' নামক পুস্তকে স্ফোটবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ ভট্টজিদীক্ষিত "বৃহদ্‌বৈয়াকরণভূষণ" নামক গ্রন্থে এবং আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট "বৈয়াকরণ-ভূষণসারঃ" নামক গ্রন্থে স্ফোটের স্বরূপ, বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর চিন্তার খোরাক যোগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, নাগেশ ভট্টের 'লঘুমঞ্জুষা' ও 'স্ফোটবাদ' নামক গ্রন্থ দুইখানিতে, শেসকৃষ্ণ-রচিত 'স্ফোটতত্ত্ব-নিরূপণম্', মৌনি-শ্রীকৃষ্ণকৃত 'স্ফোটচন্দ্রিকা,' ভরতমিশ্রকৃত 'স্ফোটসিদ্ধি,' আপদেবকৃত 'স্ফোটনিরূপণম্' প্রভৃতি অন্যান্য মূলগ্রন্থে এবং বহু টীকাপুস্তকেও এই সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। দার্শনিক, আলঙ্কারিক, শাব্দিক প্রায় সকলেই স্ফোটবাদ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর কথা বলিয়াছেন।

স্ফোটবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই স্ফোটের স্বরূপ

---

৩। স্ফোটোঽয়নং যস্য স স্ফোটায়নঃ স্ফোটপ্রতিপাদনপরো বৈয়াকরণাচার্য্যঃ।
—কাশিকা (৬।১।১২৩ সূত্রের ব্যাখ্যা)

৪। প্রথম অধ্যায় পাদটীকা—১৪।

৫। অথবা উভয়তঃ স্ফোটমাত্রং নির্দ্দিশ্যতে।—মহাভাষ্যম্ (কাশীরাজরাজ্যেশ্বরী যন্ত্র) পৃষ্ঠা—৭৪॥

এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ।—ঐ, পৃষ্ঠা—৪৩০॥

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তৎ-স্বভাবতঃ॥—ঐ, ঐ।

অবগত হওয়া আবশ্যক। আচার্য্যগণ স্ফোটশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেন—

স্ফোটশব্দের ব্যুৎপত্তি

যাহা হইতে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাই স্ফোট (৬)। সাধারণতঃ শব্দের উচ্চারণের ফলেই অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বলা যাইতে পারে যে, শব্দের উচ্চারণই স্ফোট।

স্ফোটের উক্ত লক্ষণটি নির্দ্দোষ কি না, তৎসম্বন্ধেই সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে অর্থ বলিতে কি

আলোচনা

বুঝায়, তাহাই প্রথমে স্থির করা আবশ্যক। অভিধানে অর্থশব্দের বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। দুর্গসিংহ প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা ৭টি প্রসিদ্ধ অর্থে তাহার প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা— ১। শব্দের অভিধেয় ২। ধন ৩। কারণ ৪। বস্তু ৫। প্রয়োজন ৬। নিবৃত্তি এবং ৭। বিষয় (৭)। ইহাদের উদাহরণ ক্রমান্বয়ে যথা— ১। এই শব্দের এই অর্থ, ২। তাঁহার প্রচুর অর্থ আছে, ৩। কি অর্থে আসিয়াছ? ৪। ঘটোঽর্থঃ, ৫। সম্মানলাভার্থ বিদ্যাভ্যাস করিবে, ৬। মশকার্থো ধূমঃ এবং ৭। অর্থে দুরাপে কিমুর্ত্ত প্রবাসে ন শাসনেঽবাস্থিত যো গুরুণাম্ (ভট্টি)।

স্ফোট সম্বন্ধে আচার্য্যগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ধন, কারণ, প্রয়োজন, নিবৃত্তি বা বিষয় অর্থে তাঁহারা উল্লিখিত লক্ষণে অর্থ শব্দটিকে গ্রহণ করেন নাই।

নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকেরা বস্তু অর্থে অর্থ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—শব্দের উচ্চারণ ব্যতিরেকেও অর্থের প্রতীতি হইতে পারে। যখন একটি অশ্ব বা অন্য কোন বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন শব্দের উচ্চারণ ব্যতিরেকেও উক্ত অশ্ব বা অপর বস্তুটিকে আমরা জানিতে পারি। উপরে স্ফোটের যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্থিত অর্থ শব্দটি যদি বস্তুর বোধক হয়, তাহা হইলে, শব্দের উচ্চারণ না থাকিলেও স্ফোটের

৬। স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোটঃ।—পরমলঘুমঞ্জুষা।

স্ফুটতি প্রকাশতেঽর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবৎ।—পদার্থদীপিকা।

৭। অর্থোঽভিধেয়ে শব্দানাং ধন-কারণ-বস্তুষু।
প্রয়োজনে নিবৃত্তৌ চ বিষয়ে চ প্রবর্ত্ততে॥

—দুর্গবৃত্তি (কলাপ-ব্যাকরণ, শব্দপ্রকরণ, ১ম সূত্রে)

সত্তা স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ বিশিষ্ট স্ফোটবাদীরা উচ্চারণ-ব্যতিরিক্ত স্থলে স্ফোটের সত্তা স্বীকার করেন নাই (৮)। অঙ্গুল্যগ্র-নির্দ্দিষ্ট স্থানে যখন আমরা কাহাকেও কোন বস্তু প্রদর্শন করি, তখন তাহার ঐ বস্তু-রূপ অর্থের জ্ঞান হয় বটে; কিন্তু তাদৃশ অর্থকে কেহই স্ফোট বলেন না। দূরে কোন বৃক্ষ দেখিয়া যখন শব্দোচ্চারণ-ব্যতিরেকে "ইহা বৃক্ষ" এই প্রকার অর্থজ্ঞান হয়, অথবা দূরাকাশে নিঃশব্দে উড্ডীয়মান পক্ষী দেখিয়া যখন আমরা সেই পক্ষীকে জানিতে পারি, তখন তাদৃশ স্থলেও স্ফোটের স্বীকৃতি দেখা যায় না। সুতরাং আমার মনে হয়, উল্লিখিত লক্ষণে অভিধেয় অর্থেই অর্থ শব্দটিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেখানে শব্দ নাই, সেখানে তাহার অভিধেয়ের প্রকাশ সম্ভব নহে। গো শব্দের অভিধেয়—গরু নামক জন্তুবিশেষ। অশ্বশব্দের অভিধেয়—অশ্বনামক জন্তুবিশেষ। যেখানে গো বা অশ্ব শব্দের উচ্চারণ হয় না, সেখানে তাহাদের অভিধেয়রূপে গরু বা অশ্ব নামক জন্তুর জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে।

---

৮। বাক্যপদীয় গ্রন্থে (দ্বিতীয় কাণ্ড, ৩২৯ শ্লোক) আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

"যস্মিংস্তূচ্চরিতে শব্দে যদা যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
তমাহুরর্থং তস্যৈব নান্যদর্থস্য লক্ষণম্॥"

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মকাণ্ডের ৭৭ তম শ্লোকে উল্লিখিত আচার্য্য প্রাকৃত বা প্রথমোৎপন্ন ধ্বনিকে স্ফোটগ্রহণের হেতুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উচ্চারণ না হইলে ধ্বনি হইতে পারে না; সুতরাং এই স্থলে স্ফোটগ্রহণে উচ্চারণের আবশ্যকতাই ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। আচার্য্য নাগেশও লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ উচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যমা-নাদ-ব্যঙ্গ্য শব্দের অবস্থা বিশেষকে স্ফোট নামে অভিহিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাদৃশ অবস্থার যে স্ফোট সংজ্ঞা হইতে পারে না, তাহা পরে প্রদর্শন করিব। স্ফোটশব্দের ব্যুৎপত্তিও এই বিষয়ে আমাদেরই মতের সমর্থক। স্ফোটের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কালে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—স্ফুট্যতে (প্রকাশ্যতে) যঃ স স্ফোটঃ। উচ্চারণ ব্যতিরেকে শব্দের বা তাহার অভিধেয়রূপ অর্থের প্রকাশ সম্ভব নহে। ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'স্ফোটনং স্ফোটঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাহাদ্বারা শব্দের উচ্চারণকেই বুঝাইবে। আবার অধিকরণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'স্ফুট্যতে (অর্থঃ) অস্মিন্' এইরূপ অথবা অপাদানবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'স্ফুট্যতেঽস্মাৎ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও অনুরূপ অর্থই পাওয়া যাইবে। কারণ, উচ্চারিত শব্দেরই অর্থবোধ হইয়া থাকে। অনুচ্চারিত সূক্ষ্ম শব্দের অর্থপ্রতিপত্তি কোথাও উপলব্ধ হয় না।

যদিও গো বা অশ্ব শব্দের উচ্চারণ না থাকিলেও ঐ সকল জন্তুর যে কোনটিকে দেখিলেই গো অথবা অশ্বের জ্ঞান হয়, তথাপি তাহা গো বা অশ্ব শব্দের অভিধেয় নহে। কেবলমাত্র গো বা অশ্ব শব্দের উচ্চারণের ফলে যে গোত্ব বা অশ্বত্বের জ্ঞান হয়, তাহাই ঐ সকল শব্দের অভিধেয়।

জাতিতে, জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে বা ব্যক্তিবিশিষ্ট জাতিতে, যাহাতেই আমরা শব্দের শক্তি স্বীকার করি না কেন, সর্ব্বত্রই এই যুক্তি খাটিবে। কেবলমাত্র কোন শব্দের উচ্চারণের ফলে যে অর্থের প্রতীতি হইবে, তাহাই ঐ শব্দের অভিধেয়। শব্দোচ্চারণ ব্যতিরেকে দর্শনাদিদ্বারা কোন বস্তুর প্রতীতি হইলে, তখন আর তাহাকে কোন শব্দের অভিধেয় বলা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্ফোটের উল্লিখিত লক্ষণটি নির্দ্দোষই বটে।

যদিও 'অমরকোষ' অভিধানে নিপান (জলাশয়), আগম (শাস্ত্র), তীর্থ ( পবিত্র স্থান ), ঋষিজুষ্ট জল ( ঋষি-সেবিত প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি জলাশয় ), এবং গুরু অর্থেও অর্থশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৯), তথাপি আলোচ্য স্থলে ঐ সকল অর্থের কোনটিই যে গ্রাহ্য নহে, ইহা সহজেই অনুমেয়। অমরকোষের টীকায় আচার্য্য ক্ষীরস্বামী জলাবতরণমার্গ, যাজ্ঞিক, যজ্ঞ এবং পাত্র অর্থেও অর্থ শব্দের প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন বটে ; কিন্তু আলোচ্য স্থলে তাহাদের কোনটির গ্রহণই সম্ভব নহে (১০)।

**স্ফোটলক্ষণে মতভেদ**

যে সকল আচার্য্য শব্দের অবস্থাবিশেষকেই স্ফোট মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যেও স্ফোটের স্বরূপ সম্বন্ধে দ্বিমত দেখা যায়, তন্মধ্যে যে মতটিকে আমরা অধিকতর সমীচীন মনে করি এবং যাহার সম্বন্ধে সিদ্ধ বৈয়াকরণগণ অতিবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, প্রথমে সেই মতটি সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি। অপরমত সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। স্ফোটের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অধিকাংশ স্ফোটবাদী আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শব্দ সাধারণতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রাণীর মূলাধার পদ্মে বিলীন

---

(৯) অর্থোঽভিধেয়ে রৈ-বস্তু-প্রয়োজন-নিবৃত্তিষু।
নিপানাগময়োস্তীর্থমৃষিজুষ্টে জলে গুরৌ ॥—অমরকোষ, নানার্থবর্গ, শ্লোক ৯৬৮.

(১০) ...নিপানং জলাশয়ঃ আগমঃ শাস্ত্রম্। ঋষিজুষ্টং প্রভাস-পুষ্করাদি, যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থমিতি। গুরৌ যথা—তীর্থাপ্তবিদ্যঃ। জলাবতরণমার্গে সত্রিণাধ্বরে পুণ্যক্ষেত্রে পাত্রেঽপি যথা, তীর্থং তদ্ধব্যকব্যয়োঃ ( মনু ৩।১৩০ )। তরত্যনেন তীর্থম্।—ক্ষীরস্বামী।

(দুগ্ধে ঘৃতাদির ন্যায় অব্যক্তভাবে অবস্থিত) হইয়া থাকে। ইচ্ছাপ্রেরিত দেহাভ্যন্তরস্থ কৌষ্ঠ বায়ুদ্বারা মূলাধারপদ্ম হইতে উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্যমান হইয়া সে বাক্‌সংজ্ঞা লাভ করে। মূলাধার পদ্মে থাকা কালে তাহাকে বলা হয়—পরা বাক্ (১১)। ইহাই শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থা। এই পরা বাক্ যখন উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া নাভিদেশ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া 'পশ্যন্তী' সংজ্ঞা লাভ করে। তাহার পর আরও উর্দ্ধদিকে উঠিয়া হৃদয়দেশ প্রাপ্ত হইলে এই পশ্যন্তীবাক্ মধ্যমা বাকে রূপান্তরিত হয়। ইহাই শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থা। অতঃপর আরও উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যখন এই মধ্যমা বাক্ কণ্ঠদেশ প্রাপ্ত হয়, তখন সে পুনরায় রূপান্তরিত হইয়া বৈখরী সংজ্ঞা লাভ করে (১২)। আচার্য্যগণ বলেন—মধ্যমাশক্তিদ্বারা প্রকাশমানা শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থাই স্ফোটের ব্যঞ্জক (১৩)। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয় গ্রন্থে শব্দের এই চারিটি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং আচার্য্য নাগেশ ভট্ট লঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে ইহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেও এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা দেখা যায়।

স্ফোটের বিশ্লেষণ

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী

'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' নামক অলঙ্কার শাস্ত্রীয় গ্রন্থের 'রত্নদর্পণ' নামক টীকায় কিঞ্চিদ্ ভিন্ন প্রকারে শব্দের অবস্থা-চতুষ্টয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় শব্দের প্রথম অবস্থাটির নাম 'পরা' না বলিয়া বলা হইয়াছে 'সূক্ষ্মা' (১৪)। এই সূক্ষ্ম অবস্থাটিকে রত্নদর্পণকারও বিকার রহিত বলিয়া মনে করেন (১৫)। রত্নদর্পণকার রামসিংহ বলেন—উক্ত সূক্ষ্মা বাক্ প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থান করেন (১৬)। রত্নদর্পণ-

রামসিংহের মত

(১১) মূলাধারস্থ-পবনসংস্কারীভূতা মূলাধারস্থা শব্দব্রহ্মরূপা স্পন্দশূন্যা বিন্দুরূপিণী পরা বাগুচ্যতে।—পরমলঘুমঞ্জুষা।

(১২) পরা বাক্ মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা॥ —(পরমলঘুমঞ্জুষাধৃত)

(১৩) মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে।—বাক্যপদীয়।

(১৪) শব্দব্রহ্মণশ্চতস্রো ভিদা ভবন্তি। সূক্ষ্মা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী চেতি।
—রত্নদর্পণ (১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা)।

(১৫) তত্রাবিকারদশা সূক্ষ্মা।—ঐ,

(১৬) সা হি সর্ব্বস্য প্রাণাপানান্তরালবর্ত্তিনী বিগত-প্রাদুর্ভাব-তিরোভাবা সম্যক্ প্রয়োগ-পরিশীলনাত্মনা কর্ম্মযোগেন মননাদিনা, জ্ঞানযোগেন চ সম্যগধিগম্যতে।—ঐ

কারের মতের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সূক্ষ্মা (পরা), পশ্যন্তী এবং মধ্যমা এই তিনটি বাক্‌কেই নিত্য ও অতীন্দ্রিয় মনে করেন (১৭)। বস্তুতঃ এইরূপ মনে করা যে অযৌক্তিক, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শন করিব।

যোগশিখোপনিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে যেমন পশ্যন্তী প্রভৃতি নামের এক একটি হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে, রত্নদর্পণকার রামসিংহও তেমনি তাহাদের নামের এক একটি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মত হইতে রত্নদর্পণকারের মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও দেখা যায়। যোগশিখোপনিষৎ বলেন—শব্দের যে সূক্ষ্মতর অবস্থাটি অবগত হইলে যোগিগণ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, এই বিশেষ গুণের জন্য শব্দের সেই সূক্ষ্ম অবস্থাটিকে পশ্যন্তী নামে অভিহিত করা হয় (১৮)। কিন্তু রত্নদর্পণকারের মতে, পশ্যন্তী বাক্ পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী অবস্থাদ্বয় (সূক্ষ্মা ও মধ্যমা) দর্শন করে (পশ্যতি) বলিয়াই তাহার এইরূপ নাম রাখা হইয়াছে (ক)।

মধ্যমা প্রভৃতি নামের এক একটি ব্যুৎপত্তিও রত্নদর্পণকার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—মধ্যমা বাক্ শব্দের দুইটি পরিণামের (পশ্যন্তী ও বৈখরীর) মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া তাহার এই নাম (খ)। বিখর শব্দের অর্থ—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংঘাত। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংঘাতের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া শব্দের চতুর্থ অবস্থায় সে বৈখরী বাক্ নামে পরিচিত (গ)।

আচার্য্যগণ বলেন—শব্দের পরা এবং পশ্যন্তী নামক সূক্ষ্ম অবস্থাদ্বয় কেবলমাত্র যোগিগণই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষ ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। তন্মধ্যে আবার পরা বাক্‌কে যোগিগণ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সাহায্যে এবং পশ্যন্তী বাক্‌কে সবিকল্পক জ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন (১৯)।

পরা ও পশ্যন্তী

(১৭) তদেতাসামবস্থানামাদ্যাস্তিস্রো নিত্যা অতীন্দ্রিয়াঃ।—ঐ

(১৮) তাং পশ্যন্তীং বিদুর্ব্বিশ্বং যয়া পশ্যন্তি যোগিনঃ।

—যোগশিখোপনিষৎ (নাদলীলামৃত ২৯ পৃষ্ঠায় ধৃত)

(ক) পূর্ব্বাপরে স্বাবস্থে পশ্যতীতি পশ্যন্তীত্যুচ্যতে। —রত্নদর্পণ (১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা)

(খ) সা কিল দ্বয়োঃ পরিণাময়োর্ম্মধ্যে তিষ্ঠতীতি মধ্যমেত্যুচ্যতে। —ঐ

(গ) বিশিষ্টং খমাকাশং রাতি প্রযচ্ছতীতি বিখরো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতঃ। তত্র ভবা বৈখরীতি।—ঐ

(১৯) এতদ্ দ্বয়ং সূক্ষ্মতরমীশ্বরাধিদৈবং যোগিনাং সমাধৌ নির্ব্বিকল্পক-সবিকল্পক-জ্ঞানবিষয় ইত্যুচ্যতে।—লঘুমঞ্জুষা।

ব্রহ্ম যেমন বাক্য ও মনের অগোচর, নাগেশ ভট্ট মনে করেন, এই পরা বাক্‌ও তেমনি বাক্য ও মনের অগোচর। কিন্তু পশ্যন্তী নাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতর অবস্থাটিকে নাগেশভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যেরা মনের গোচর মনে করেন (২০)। হৃদয়দেশে শব্দের মধ্যমা নাম্নী যে অবস্থাটি উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে আচার্য্যগণ বুদ্ধিরও গোচর মনে করেন। অর্থাৎ মধ্যমা বাক্ নাম্নী শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থাটি মন ও বুদ্ধি উভয়েরই গোচর (২১)। পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমা যে যথাক্রমে শব্দের সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্ম অবস্থা আচার্য্য নাগেশ স্পষ্টভাবেই এই কথা বলিয়াছেন (২২)।

নাগেশের ব্যাখ্যা

মধ্যমা

বৈখরীনামে শব্দের যে চতুর্থ আর একটি অবস্থা আছে, তাহা শব্দের স্থুল অবস্থা। কণ্ঠ হইতে যে শব্দ বদন পথে বহির্গত হইয়া অপরের শ্রুতিবিষয় হয়, তাহাই বৈখরী বাক্ (২৩)। নাগেশ ভট্টের মতে বৈখরী বাক্ ব্যান ও উদান বায়ুর সাহায্যে প্রকাশলাভ করে (২৪)

বৈখরী

নাগেশ ভট্ট বলেন—কর্ণপিধানে সূক্ষ্মতর বায়ুর অভিঘাত দ্বারা এবং উপাংশু শব্দ প্রয়োগে শব্দের মধ্যমা নাম্নী অবস্থা শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে (২৫)। এই বিষয়ে আমরা উল্লিখিত আচার্য্যের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না।

---

(২০) তদেব নাভিপর্য্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনাভিব্যক্তং মনোবিষয়ঃ পশ্যন্তীত্যুচ্যতে।
—লঘুমঞ্জুষা।

(২১) ততো হৃদয়পর্য্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনা হৃদয়দেশেঽভিব্যক্ততত্তদর্থবিশেষ-তত্তচ্ছব্দবিশেষোল্লেখিন্যা বুদ্ধ্যা বিষয়ীকৃতা হিরণ্যগর্ভদেবত্যা পরশ্রোত্রগ্রহণাযোগ্যত্বেন সূক্ষ্মা মধ্যমা বাগিত্যুচ্যতে।—লঘুমঞ্জুষা।

(২২) এতদবস্থাত্রয়মপি সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মপ্রণবরূপম্।—লঘুমঞ্জুষা।

(২৩) সৈব চাস্যপর্য্যন্তং গচ্ছতা তেন বায়ুনা কণ্ঠদেশং গত্বা মূর্দ্ধানমাহত্য পরাবৃত্য তত্তৎস্থানেষভিব্যক্তা পরশ্রোত্রেণাপি গ্রহণযোগ্যা বিরাড়ধিদেবত্যা বৈখরী বাক্ ইত্যুচ্যতে।
—লঘুমঞ্জুষা।

(২৪) প্রণব এব ব্যানোদানাভ্যাং সহ বৈখরীরূপং প্রতিপদ্যতে।—লঘুমঞ্জুষা।

(২৫) স্বয়ং তু কর্ণপিধানে সূক্ষ্মতরবায়্বভিঘাতেন উপাংশুশব্দপ্রয়োগে চ শ্রূয়মাণা সেত্যাহুঃ।
—লঘুমঞ্জুষা।

নগেশভট্ট বলিয়াছেন—মধ্যমা বাকের অবস্থিতিস্থল হৃদয়; ইহা পরশ্রবণ-গোচর নহে; কিন্তু ইহা বক্তার স্বকর্ণে শ্রূয়মাণ হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—মধ্যমা বাক্ যে বক্তার স্বকর্ণে শ্রূয়মাণ হয়, তাহা কি উচ্চারিত হওয়ার পর, না উচ্চারিত হওয়ার পূর্ব্বে? উচ্চারণ বলিতে পরশ্রবণগোচর হওয়ার সামর্থ্যকে বুঝায়। ন্যায়ভাষ্যে মহর্ষি বাৎস্যায়নও উচ্চারণের এইরূপ লক্ষণই করিয়াছেন (২৬)। আচার্য্য নাগেশও তাঁহার 'স্ফোটবাদ' নামক গ্রন্থে উচ্চারণের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন যে, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতির সংযোগের ফলে শব্দের যে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হয়, তাহাই শব্দের উচ্চারণ (২৭)। এইরূপ অভিব্যক্তি শ্রবণ-গোচরতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মধ্যমার স্বরূপ

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বৈখরী-ব্যতিরিক্ত মধ্যমা-নাদের উচ্চারণ হওয়া সম্ভব নহে। কণ্ঠপথে যখন বাক্ বদন-সম্মুখে উপস্থিত হয়, কেবলমাত্র তখনই তাহার উচ্চারণ হওয়া সম্ভব। এইরূপ উচ্চারণের সময়ে যে সে বৈখরী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা নাগেশভট্টও স্বীকার করিয়াছেন। উচ্চারণের পূর্ব্বেও মধ্যমা বাকের পক্ষে বক্তার কর্ণপটহে আহত হওয়া অসম্ভব; এবং কর্ণপটহে আহত না হইলে তাহার শ্রবণও হইতে পারে না। হৃদয়-স্থিত মধ্যমাবাক্ বদনপথে বহির্গত না হইয়া (বৈখরী অবস্থা লাভ না করিয়া) কেমন করিয়া বক্তার শ্রবণে আহত হইবে? অতএব, আমাদের বিবেচনায় মধ্যমা বাক্ বক্তার স্বকর্ণেও শ্রূয়মাণ হইতে পারে না। উপাংশুশব্দ প্রয়োগের বেলাও প্রয়োগ কর্ত্তার অন্তরে তাদৃশ শব্দের একটি সূক্ষ্ম অনুভব মাত্র হয়, শ্রবণ নহে—ইহাই আমরা মনে করি।

আচার্য্যগণ বলিলেন—স্ফোটাত্মক শব্দ মধ্যমা নাদের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। আবার একথাও স্বীকার করিলেন যে, মধ্যমাবাক্ হৃদয়দেশে অবস্থান করে। কণ্ঠদেশে শব্দের বৈখরী অবস্থা বিরাজ করে এবং তাহার দ্বারা শব্দ অপরের শ্রবণযোগ্য হয়—এ কথাটিও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। যাহা দ্বারা অর্থের প্রকাশ হয়; তাহাকেই শব্দ বলিলে ধ্বনিবিশেষকেই শব্দ বলিতে হয়; কারণ ধ্বনিবিশেষদ্বারাই অর্থের

স্ফোট সম্বন্ধে আলোচনা

(২৬) দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা ৬০।

(২৭) উচ্চরিতত্বঞ্চ তাল্বোষ্ঠপুটসংযোগাদিজন্যাভিব্যক্তিবিশিষ্টত্বম্।

—স্ফোটবাদ (আড্যার লাইব্রেরী), পৃষ্ঠা—৮৬॥

প্রতীতি হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদও বৈশেষিক দর্শনের ২।১।২১ সূত্রে কেবলমাত্র শ্রবণযোগ্য ধ্বনিরই শব্দত্ব স্বীকার করিয়াছেন (২৮)। শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বে কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশের ইচ্ছা প্রভৃতিদ্বারা বক্তা স্বয়ং অর্থের উপলব্ধি করিতে পারেন বটে; কিন্তু অপরের কাছে তাহার কোন কার্য্য-কারিতা থাকিতে পারে না।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—প্রাকৃত ধ্বনিই স্ফোট গ্রহণের হেতু (২৯)। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ধ্বনির পূর্ব্বে স্ফোটের অবস্থিতি সম্ভব নহে। স্ফোট যে ধ্বনিরূপেই প্রকাশ লাভ করে, তাহাও ভর্ত্তৃহরি স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ আচার্য্য নাগেশের নামে প্রচলিত পরমলঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মধ্যমা ও বৈখরী উভয়ের সংযোগেই নাদের উৎপত্তি হয় (৩০)।

স্ফোট এবং ধ্বনি উভয়েই যদি মধ্যমা ও বৈখরীর সংযোগে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?—এই সংশয়ের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—স্ফোট বলিতে শব্দকে বুঝায়, এবং ধ্বনি বলিতে বুঝায় শব্দের গুণবিশেষকে। মহর্ষি পতঞ্জলি একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহার এই অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ভেরীর

স্ফোট ও ধ্বনি

আঘাত যেমন ভেরীকে আহত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, স্ফোটও তেমনি দেহেন্দ্রিয়ের আঘাতের ফলে উৎপন্ন হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকে। শব্দের অর্থপ্রকাশের নাম স্ফোট এবং তাহার উচ্চ-নীচ অবস্থার নাম ধ্বনি (৩১)।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে করুন, আপনি

---

(২৮) শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ।—কণাদসূত্র ২।২।২১

(২৯) বর্ণস্য (স্ফোটস্য) গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।

—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক—৭৭

(৩০) যুগপদেব মধ্যমা-বৈখরীভ্যাং নাদ উৎপদ্যতে।—পরমলঘুমঞ্জুষা।

(৩১) এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ। কথম্? ভের্য্যাঘাতবৎ। তদ্ যথা—ভের্য্যাঘাতঃ ভৈরীমাহত্য কশ্চিদ্ বিংশতি পদানি গচ্ছতি কশ্চিৎ ত্রিংশৎ কশ্চিচ্চত্বারিংশৎ স্ফোটস্তাবানেব ভবতি। ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ।

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তৎস্বভাবতঃ॥

মহাভাষ্য (কাশীরাজরাজেশ্বরী প্রেস) পৃষ্ঠা—৪৩০॥

কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে দাঁড়াইয়া একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। আপনার চারিদিকে বিভিন্ন প্রকার দূরত্বে কতকগুলি লোক অবস্থিত আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সমীপবর্ত্তী লোকটির কর্ণে আপনার উচ্চারিত শব্দের যে প্রকার তীব্র আঘাত লাগিবে, দূরবর্ত্তী লোকগুলির কর্ণে তদপেক্ষা মৃদু আঘাতই লাগিবে। ফলে নিকটবর্ত্তী লোকটি শুনিবে উচ্চতম ধ্বনি, মধ্যমদূরত্বে স্থিত লোকেরা শুনিবে মধ্যম রকমের ধ্বনি এবং অধিক দূরত্বে স্থিত ব্যক্তিরা শুনিবে অতি মৃদু ধ্বনি। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির কর্ণে এইরূপে একই শব্দের তীব্র-মন্দাদিভেদে বিভিন্ন প্রকার শ্রবণ হইবে, তথাপি তাহার অর্থের কোন পার্থক্য ঘটিবে না। তীব্রভাবে উচ্চারিত অশ্ব শব্দ যে অর্থ বুঝায়, অতি মৃদুভাবে উচ্চারিত অশ্বশব্দটিও ঠিক সেই অর্থটিই বুঝাইয়া থাকে। অশ্বশব্দের এইরূপ অর্থ-প্রকাশনের নামই স্ফোট, এবং তাহার উচ্চ, নীচ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার নামই ধ্বনি। ইহাই মহর্ষি পতঞ্জলির অভিপ্রায়। মহর্ষি পতঞ্জলি ভেরীর আঘাতের সঙ্গে যে ভাবে স্ফোটের তুলনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, স্ফোটের নিত্যতা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিও 'স্ফোটরূপাবিভাগেন ধ্বনের্গ্রহণমিষ্যতে" কথাটিদ্বারা স্ফোট এবং ধ্বনির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার পার্থক্যই স্বীকার করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বলেন—স্ফোটও একপ্রকার ধ্বনিরূপেই প্রকাশ লাভ করে বটে; কিন্তু স্ফোটাতিরিক্ত অন্য একপ্রকার ধ্বনিও আছে। স্ফোট এবং ধ্বনির মধ্যে এইরূপ পার্থক্য দেখাইতে গিয়া ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—ধ্বনি দ্বিবিধ,

ধ্বনি-বৈবিধ্য

প্রাকৃত এবং বৈকৃত। তন্মধ্যে প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোট গ্রহণের হেতু এবং শব্দের উচ্চারণের পর উচ্চ নীচ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে তাহার যে প্রকাশ হয়, উহাই বৈকৃত ধ্বনি (৩২)।

যদিও ভর্ত্তৃহরি এই স্থলে প্রাকৃত ধ্বনিকে স্ফোটগ্রহণের হেতু বলিয়াছেন, তথাপি "কার্য্যকারণয়োরভেদঃ" ন্যায় অনুসারে অন্যস্থলে এই প্রাকৃত (প্রথমোৎপন্ন) ধ্বনিকেই তিনি স্ফোট নামেও অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং

(৩২) বর্ণস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
শব্দস্যোর্দ্ধমভিব্যক্তের্বৃত্তিভেদে তু বৈকৃতাঃ॥
ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে স্ফোটাত্মা তৈর্ন ভিদ্যতে॥
বাক্যপদীয়। ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক ৭৭—৭৮॥

বর্ণস্যেতি বর্ণাদ্যাত্মনা ভাসমানস্য স্ফোটস্য।—প্রকাশটীকা (নারায়ণ দত্তশর্ম্মাকৃত)

বুঝা যায় যে, প্রথমোচ্চারিত ধ্বনিই স্ফোট—ইহাই ভর্তৃহরির অভিপ্রায়। স্ফোট এবং ধ্বনির পার্থক্য-প্রদর্শন প্রসঙ্গে পরমলঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে ভর্তৃহরির অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তথায় বলা

নাগেশের ব্যাখ্যা

হইয়াছে যে, প্রথমোচ্চারিত শব্দই স্ফোটপদবাচ্য। তাহার পর যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহারা বৈকৃত-ধ্বনি-প্রতিপাদ্য স্ফোটেতর শব্দ (৩৩)। আচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, ইচ্ছাপ্রেরিত বায়ুর উর্দ্ধচাপে সূক্ষ্মতম বাক্ মূলাধার হইতে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া যখন বদনপথে বিনির্গত হয়, তখন সেই স্ফোটনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য্যের কথায় ইহাই প্রথমোচ্চারিত শব্দ।

ভর্তৃহরি বলেন—সংযোগ এবং বিভাগরূপ করণের দ্বারা যাহা উপজাত হয়, তাহাই স্ফোট; এবং শব্দজ শব্দগুলিকেই অন্যেরা ধ্বনির উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (৩৪)। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভর্তৃহরি সংযোগ এবং বিভাগকে স্ফোটের করণ বলিয়াছেন এবং একথাও বলিয়াছেন যে, উক্ত করণের দ্বারা স্ফোট উপজাত হয়। ধ্বনিকে তিনি বলিলেন—শব্দজ শব্দ। কারিকার ভাষা দেখিয়া মনে হয়, স্ফোট সম্বন্ধে ভর্তৃহরি যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেরই মত।

স্ফোটাত্মক শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সংযোগাদিদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না; অথচ ভর্তৃহরি বলিলেন—স্ফোট উপজাত হয়। তবে কি স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা ভর্তৃহরির অভিপ্রেত নহে? অথবা

বিবিধ ব্যাখ্যা

উক্ত উপজাত হওয়া কথাটিকে তিনি অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? এই বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। টীকাকার পুণ্যরাজ এই বিষয়ে তিনটি পৃথক্ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহাদের মতে শব্দ অনিত্য, তাঁহারা বলেন—সংযোগাদিদ্বারা প্রথমোচ্চারিত স্ফোটাত্মক শব্দের উৎপত্তিই হইয়া থাকে

---

(৩৩) ধ্বনিস্তু দ্বিবিধঃ—প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ। প্রকৃত্যার্থবোধনেচ্ছয়া স্বভাবেন বা জাতঃ স্ফোটব্যঞ্জকঃ প্রথমঃ প্রাকৃতঃ। তস্মাৎ প্রাকৃতাজ্জাতো বিকৃতিবিশিষ্টশ্চিরস্থায়ী নিবর্ত্তকো বৈকৃতিকঃ।—পরমলঘুমঞ্জুষা।

(৩৪) যঃ সংযোগ-বিভাগাভ্যাং করণৈরুপজায়তে।

স স্ফোটঃ, শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ॥—বাক্যপদীয় ১।১০৩॥

(৩৫)। যাঁহারা শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহারাও দুইটি বিভিন্ন প্রকারে ভর্তৃহরির উল্লিখিত কথাটির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে একদল বলেন—সংযোগ ও বিভাগের ফলে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এবং সেই ধ্বনিদ্বারা পূর্ব্ব হইতে স্থিত স্ফোটাত্মক শব্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষ বলেন—সংযোগ ও বিভাগের ফলে ধ্বনির উৎপত্তি হয়; সেই ধ্বনি হইতে নাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উক্ত নাদদ্বারা পূর্ব্ব হইতে স্থিত স্ফোটাত্মক শব্দ প্রকাশিত হয় (৩৬)

শব্দনিত্যতাবাদীরা মনে করেন—মহাকাশে যেমন সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থায় শব্দ সকল সময়েই অবস্থান করে, প্রাণীর দেহস্থিত মূলাধার-চক্রেও তেমনি সকল সময়েই সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থায় যাবতীয় শব্দ বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে উল্লিখিত প্রথম পক্ষের মতে এইরূপ অব্যক্ত শব্দকেই সংযোগজ বা বিভাগজ ধ্বনি ব্যক্ত করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষের মতে, এতাদৃশ অব্যক্ত শব্দ সংযোগজ বা বিভাগজ বায়ুর ঊর্দ্ধচাপে বিকৃত হইয়া সূক্ষ্ম ধ্বনির আকারে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে। এই অবস্থাটিকে তাঁহারা উল্লিখিত স্থলে ধ্বনি নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতঃপর, এই ধ্বনি যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে, তখন এক প্রকার মৃদু অথচ অদ্ভুত শব্দ হইতে থাকে; ইহারই নাম 'নাদ'। এই নাদই বৈখরী অবস্থায় বদনপথে বিনির্গত হইয়া স্ফোটরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং ধ্বনি হইতে নাদের উদ্ভব, এবং এই নাদদ্বারা অব্যক্ত, সূক্ষ্ম শব্দের স্ফোটাকারে প্রকাশ সম্ভব হয় বলিয়া এই পক্ষ মনে করেন।

শব্দের অনিত্যত্ববাদীরা বলেন—কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগের ফলে উচ্চারণকারীর বদন-সম্মুখস্থ আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন হয়; ইহারই নাম স্ফোট। এই স্ফোট স্থানান্তরে যাইতে পারে না বলিয়া সে অপরের শ্রবণ-গোচর হয় না। অতঃপর, উক্ত স্ফোটাত্মক শব্দের দশদিকে আরও দশটি নূতন শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং তারপর তাহাদের প্রত্যেকের দশদিকে আরও দশটি করিয়া নূতন শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইভাবে শব্দগুলি দশদিকে ধাবিত হইয়া অপরের শ্রবণ-গোচরতা লাভ করে।

অনিত্য-পক্ষ

(৩৫) অনিত্যত্বপক্ষে স্থান-করণ-প্রাপ্তি-বিভাগহেতুকঃ প্রথমাভিব্যক্তো যঃ শব্দঃ স স্ফোট ইত্যুচ্যতে।—পুণ্যরাজটীকা।

(৩৬) নিত্যত্বপক্ষে তু সংযোগবিভাগজ-ধ্বনিব্যঙ্গ্যঃ স্ফোট ইতি কেষাঞ্চিন্মতম্। অন্যেষাং সংযোগ-বিভাগ-ফলজ-ধ্বনিসম্ভূত-নাদাভিব্যঙ্গ্য ইতি মতম্।—পুণ্যরাজটীকা

এই প্রথম শব্দ হইতে অপর যে সকল শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহারাই অপরের শ্রবণগোচর হইয়া ধ্বনি সংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপ শব্দকেই বৈকৃত ধ্বনি বা সাধারণ শব্দ বলা হইয়া থাকে। শব্দের অনিত্যতাবাদীদের এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইলে, স্ফোটাত্মক শব্দ পরশ্রবণগোচর নহে, কেবল ধন্যাত্মক শব্দই পরশ্রবণগোচর—এইরূপ স্বীকার করা অযৌক্তিক হয় না। বস্তুতঃ, এক শব্দ হইতে উল্লিখিত উপায়ে শব্দসন্তানের উৎপত্তি যে বিজ্ঞান-সম্মত নহে, 'শব্দের স্বরূপ' প্রকরণে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

কদম্বকোরক-ন্যায় অনুসারে প্রথমোৎপন্ন শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করিলে শব্দের অনিত্যতাবাদীদের উল্লিখিত যুক্তি (স্ফোটাত্মক শব্দ হইতে শ্রব্য শব্দের উৎপত্তি) প্রযোজ্য হয় বটে; কিন্তু প্রথমোৎপন্ন শব্দ যে অপর দশটি শব্দ সৃষ্টি করিয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার প্রমাণ কি? আমাদের মতে দেহাভ্যন্তরোত্থিত বায়ুর চাপে বদন-সন্নিহিত আকাশে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, এবং উক্ত তরঙ্গটিই দুলিয়া দুলিয়া দশদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইভাবে যখন উক্ত তরঙ্গ ক্রমশঃ মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া অবশেষে আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তখনই আর শব্দশ্রবণের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং উৎপন্ন শব্দটির বিনাশ কেবলমাত্র ঐ তরঙ্গের বিলীন হওয়ার সময়েই হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে নহে। বৈজ্ঞানিকেরাও এই মতই সমর্থন করেন।

নিত্যপক্ষ

শব্দনিত্যতাবাদীরা স্ফোটাত্মক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহাদের মতে স্ফোট ও ধ্বনির উল্লিখিত পার্থক্য কেমন করিয়া সমর্থন করা যাইতে পারে? ভর্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণ কারণশব্দ ও কার্য্যশব্দভেদে শব্দের মধ্যে দুইটি বিভাগ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ফোটাত্মক শব্দই কারণশব্দ এবং শ্রবণগোচর শব্দই কার্য্যশব্দ (৩৭)। ভর্তৃহরি বলেন—একটি অগ্নিশিখা হইতে যেমন অন্যান্য অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়, তেমনি স্ফোটাত্মক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে (৩৮)। ভর্তৃহরি

(৩৭) দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ শব্দবিদো বিদুঃ।
একো নিমিত্তং শব্দানামপরোঽর্থে প্রযুজ্যতে ॥—বাক্যপদীয়ম্, ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক—৪৪ ॥

(৩৮) অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্ ॥—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড; শ্লোক—৪৬ ॥

মনে করেন—অরণিদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা সেই অরণিদ্বয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। অরণি-

ভর্ত্তৃহরির অভিপ্রায়

দ্বয়ের সঙ্ঘর্ষের ফলে উক্ত সূক্ষ্ম অগ্নি স্থূলতা লাভ করিয়া আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, এবং তখন সে নিজেকে প্রকাশ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্রব্যকেও প্রকাশিত করে। ঠিক এইভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরে, ( মূলাধার চক্রে ) অতি সূক্ষ্মভাবে শব্দ অবস্থান করে। শব্দ উচ্চারণের ইচ্ছা হইলে জিহ্বা, তালু প্রভৃতির সংযোগের ফলে সেই সূক্ষ্ম শব্দ স্থূলতা লাভ করিয়া বদন-বিকাশে উচ্চারিত হয়। এইভাবে উচ্চারিত হওয়ার পরেই সে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজ প্রতিপাদ্য অর্থটিকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। উচ্চারণের পূর্ব্বাবস্থায় শব্দ যখন বুদ্ধিতে অবস্থান করে, তখনই সে কারণশব্দরূপে বিবেচ্য এবং উচ্চারণের পর তাহার যে অবস্থা আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, তাহাই কার্য্যশব্দ।

ভর্ত্তৃহরি-প্রদর্শিত অগ্নিশিখার দৃষ্টান্তটি উত্তমরূপে বিবেচনা করিলে স্ফোট এবং স্ফোটেতর উভয়বিধ শব্দেরই একজাতীয়তা প্রতিপন্ন হয়। উল্লিখিত দ্বিবিধ শব্দের মধ্যে একটিকে নিত্য বলিলে অপরটিকেও নিত্য বলিতে হয়; এবং একটি অনিত্য হইলে অপরটিও অনিত্য হইয়া পড়ে। একটি অগ্নিশিখা হইতে অপর যে সকল অগ্নিশিখার উদ্ভব হয়, তাহারা কি পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্নিশিখার বিনাশের পর উৎপন্ন হয়—না, তাহারই এক একটি পরিবর্ত্তিত অবস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে? —অগ্নিশিখার উৎপত্তি-প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই এই প্রশ্নের সমাধান হইবে। যখনই কোন দাহ্যপদার্থের সহিত অগ্নির যোগ হয়, তখনই উক্ত দাহ্য-পদার্থের এক একটি অংশ দগ্ধ করিয়া অগ্নি এক একটি শিখারূপে আত্ম প্রকাশ করে। প্রথম অংশটুকু দগ্ধ করিবার সময়ে যে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় অংশ দগ্ধ করিবার কালে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। তখন দ্বিতীয় আর একটি নূতন অগ্নিশিখারই উদ্ভব হইয়া থাকে। এই ভাবে, প্রত্যেকটি অগ্নিশিখাই সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া

---

শব্দোঽত্র ধ্বনিঃ। স চ দ্বিবিধ উত্তরোত্তরশব্দানাং কারণরূপ আদ্যঃ কার্য্যরূপ উত্তরশ্চ। তত্রাদ্যঃ স্ফোটব্যঞ্জকঃ স্ফোট এব বা।—পুণ্যরাজটীকা ( ব্রহ্মকাণ্ড, ১০৪ শ্লোক )

স্ফোটাদেবোপজায়স্তে জ্বালা জ্বালান্তরাদিব।—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক—১০৭॥

আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। দাহ্যপদার্থটুকু সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া গেলে তখন আর অগ্নিশিখার উদ্ভব হয় না; সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, দাহ্য পদার্থের দহনই অগ্নিশিখার উৎপত্তির কারণ; এবং দাহ-কার্য্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখার বিনাশও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি অগ্নিশিখাই যে উৎপত্তি-বিনাশশীল, একথা স্বীকার করাই যুক্তি-সঙ্গত হইবে। শব্দের উৎপত্তিও যদি অগ্নিশিখার উৎপত্তির অনুরূপ হয়, তাহা হইলে স্ফোট এবং স্ফোটেতর সকল শব্দকেই কার্য্য বলা উচিত।

অরণিদ্বয়ের অথবা দেশলাই এর বাক্স ও তাহার কাঠির সঙ্ঘর্ষের পূর্ব্বেও অগ্নি সূক্ষ্ম অদৃশ্য অবস্থায় অরণিদ্বয়ের মধ্যে অথবা দেশলাই এর কাঠি ইত্যাদির অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে; এবং শব্দও এইভাবে উচ্চারণের পূর্ব্বে মানুষের দেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করে—এইরূপ যুক্তিও বিচারসহ হইবে না। কারণ, ঐরূপ সূক্ষ্ম অবস্থায় অগ্নি বা শব্দের অবস্থিতি স্বীকার করিলেও তাদৃশ অবস্থায় কেহই তাহাদিগকে অগ্নি বা শব্দ নামে অভিহিত করেন না। গগনমণ্ডলে যে সময় শব্দ অশ্রব্য (Inaudible) অবস্থায় বিরাজ করে, সেই সময়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ শব্দের এইরূপ সূক্ষ্ম তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গ না বলিয়া বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ (electrical waves) নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভর্ত্তৃহরির প্রকৃত অভিমত যাহাই হউক না কেন, শব্দনিত্যতা-বাদীরা কোন শব্দেরই উৎপত্তি অথবা বিনাশ স্বীকার করিতে পারেন না।

মীমাংসক প্রভৃতি বিশিষ্ট শব্দনিত্যতাবাদীদের মতে, যে শব্দ প্রথমে বক্তার বদনসকাশে আবির্ভূত হয়, সে ই বেগচালিত হইয়া শব্দতরঙ্গরূপে দশদিকে ধাবিত হইয়া থাকে। যখন বক্তার মুখের কাছে থাকে, তখন সে অপরের শ্রবণগোচর হয় না বটে, কিন্তু অপরের শ্রবণদেশে পৌঁছা-মাত্রই সে তাহার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দনিত্যতারাদীদের

**নিত্যপক্ষের বৈবিধ্য**

মতে স্ফোট এবং ধ্বনির মধ্যে কোনরূপ ভেদ কল্পনা করিতে হইলে তাহার গতিলাভের পূর্ব্বাবস্থা এবং পরাবস্থাদ্বারা উক্ত কাল্পনিক বিভাগ প্রদর্শন করা যাইতে পারে; এতা-ধিক পার্থক্য দেখানো সম্ভব নহে।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তী নামক শব্দের বিভাগত্রয়ের মধ্যে আবার নানাবিধ অবান্তর বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন (৩৯)। টীকাকার পুণ্যরাজ এই বিষয়ে আচার্য্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উল্লিখিত ভেদসমূহের মধ্যে কতকগুলির উদাহরণ দেখাইয়াছেন। আচার্য্য পুণ্যরাজ

বৈখরীর বিভাগ

বলেন—বৈখরী-প্রতিপাদ্য শব্দমাত্রেই অপরের শ্রবণ-গোচর হয়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সাধুশব্দ, অসাধুশব্দ এবং দুন্দুভি-বেণু-বীণাদির শব্দ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (৪০)।

পুণ্যরাজ বলেন—মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য শব্দের মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও

মধ্যমাতে ভেদকল্পনা

তাহার মধ্যে ভেদ বা ক্রমশক্তি আরোপিত হইয়া থাকে। ইহা বুদ্ধিমাত্রগোচর, এবং অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত (৪১)।

এইভাবে আচার্য্য পুণ্যরাজ পশ্যন্তীবাকের মধ্যেও কয়েকটি অবান্তর

পশ্যন্তীর বিভাগ

পরা অবিভক্ত

বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরা বাকের মধ্যে কোন বিভাগ প্রদর্শন করা হয় নাই; কারণ আচার্য্যমতে ইহা বিভাগরহিত, নিত্য এবং ব্রহ্মস্বরূপ।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি যে শব্দের মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ কল্পনা করিয়া তাহাদের একটিকে প্রাকৃত এবং অপরটিকে বৈকৃত নামে অভিহিত করিলেন,

আলোচনা

ইহার কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব। যে শব্দ মনুষ্যাদির ইচ্ছামাত্র তাহাদের কণ্ঠতাল্বাদি-সংযোগের ফলে প্রকাশিত বা উৎপন্ন হয়, তাহাই কি প্রাকৃত শব্দ? ভর্ত্তৃহরি স্ফোটাত্মক শব্দকে প্রাকৃত শব্দ নামে অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা বুদ্ধিতে অবস্থান করে এবং অপরের শ্রবণগোচর হয় না। ভর্ত্তৃহরি ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত স্ফোটাত্মক শব্দ কণ্ঠতাল্বাদি সংযোগের

---

(৩৯) বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্ত্যাশ্চৈতদদ্ভুতম্।
অনেকতীর্থভেদায়াস্ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্॥ – ঐ, ঐ, শ্লোক ১৪৪॥

(৪০) যস্যাঃ শ্রোত্রবিষয়ত্বেন প্রতিনিয়তং শ্রুতিরূপং সা বৈখরী শ্লিষ্ট ব্যক্ত-বর্ণসমুচ্চারণ-প্রসিদ্ধসাধুভাবা ভ্রষ্টসংস্কারা চ দুন্দুভি-বেণু-বীণাদিশব্দরূপা চেত্যপরিমিতভেদাঃ।—পুণ্যরাজটীকা

(৪১) মধ্যমা অন্তঃসন্নিবেশিনী পরিগৃহীতক্রমেব বুদ্ধিমাত্রোপাদানা সূক্ষ্মা প্রাণবৃত্ত্যনুগতা প্রতিসংহৃতক্রমা সত্যপ্যভেদে সমাবিষ্টক্রমশক্তিঃ। – পুণ্যরাজটীকা।

ফলে উচ্চারণকারীর বদন সকাশে উৎপন্ন হয়। আচার্য্যের এই সকল লেখা দেখিয়া মনে হয়, মনুষ্যাদির স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে স্ফোটাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয় বলিয়াই তিনি ইহাকে প্রাকৃত ধ্বনি বলিয়াছেন। অপরপক্ষে স্ফোট-ব্যতিরিক্ত শব্দগুলিকে তিনি স্বভাবতঃ উৎপন্ন মনে করেন না।

ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোটগ্রহণের হেতু। পুণ্যরাজ প্রভৃতি টীকাকারেরা ইহার ব্যাখ্যাকালে প্রাকৃত ধ্বনি এবং স্ফোটকে অভিন্নরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন [ পাদটীকা ৩২ এবং ৩৮ ]। বস্তুতঃ স্ফোট স্বয়ং প্রাকৃত ধ্বনি হউক, বা প্রাকৃতধ্বনিদ্বারা প্রকাশিতই হউক, উভয় অবস্থাতেই সংশয়ের অবকাশ থাকে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই ধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় আবশ্যক। লৌকিক ব্যবহার হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ণদ্বারা যাহা শোনা যায়, তাহাই ধ্বনি। যাহা আমরা শুনিতে পাই না, তাহাকে কখনও শব্দ বা ধ্বনি বলি না। লৌকিক ব্যবহারের এই সাক্ষ্য মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় যে, স্ফোট যদি পরশ্রবণগোচর না হয়, তবে তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না; এবং ধ্বনিদ্বারা তাহার প্রকাশও সম্ভব নহে। লৌকিক ব্যবহার এবং অনুভব হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শব্দমাত্রেই পরশ্রবণ-গোচর। অতএব, পরশ্রবণগোচর শব্দ যদি ধ্বনিপদবাচ্য হয়, তাহা হইলে শব্দমাত্রেই ধ্বনি।

শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বাবস্থা যদি স্ফোট হয়, এবং মধ্যমারূপিণী বাক্‌কেই যদি স্ফোটরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে ধ্বনিবিশেষ-স্বরূপ বা ধ্বনিবিশেষের দ্বারা প্রকাশমান বলা চলে না; কারণ যাহার উচ্চারণই হয় নাই, সে ধ্বনিত্ব লাভ করিবে কেমন করিয়া? যাহার প্রকাশই হয় নাই, তাহাকে ধ্বনিবিশেষের দ্বারা প্রকাশমানই বা কিরূপে বলা হইবে? এই বুদ্ধিস্থিত শব্দকে ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যেরা কারণশব্দ বলিয়াছেন। উচ্চারণের পূর্ব্বে সূক্ষ্ম অবস্থায় স্থিত মধ্যমাবাক্‌রূপী স্ফোটকে যদি কারণশব্দ বলা যায়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান পশ্যন্তী বাক্‌কেই বা স্ফোটের কারণ বলা হইবে না কেন? এইরূপে, পরা বাক্‌কে পশ্যন্তী বাকের কারণরূপে কল্পনা করিয়া তাহারও কারণরূপে মনুষ্যাদির ইচ্ছাকে স্থাপন করা যাইতে পারে। সুতরাং আমি বলিতে চাই যে, হয় সূক্ষ্ম বাক্‌কে স্থূল বাকের কারণ-রূপে স্বীকার না করা উচিত; আর যদি সূক্ষ্ম বাক্ তিনটির মধ্যে একটির

কারণতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বাকী দুইটিকেও তাহাদের এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

সাধারণ শব্দগুলিকে ভর্ত্তৃহরি কি কারণে বৈকৃত ধ্বনি নামে অভিহিত করিলেন, তাহাই বর্ত্তমানে আলোচনা করিতেছি। কোন স্বাভাবিক অবস্থা যখন অস্বাভাবিক অবস্থার রূপান্তরিত হয়, তখনই তাহাকে 'বিকার' বলা হয়। কোনরূপ বিকারের ফলে যাহা উৎপন্ন, তাহাকেই বৈকৃত বলা যায়। সাধারণ শব্দগুলির উৎপত্তি কি বাস্তবিকই কোনরূপ বিকারের ফলে হইয়া থাকে? আমরা কিন্তু এইরূপ বলিবার মত কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। কণ্ঠ-তাল্বাদির সংযোগ বা মুখসঞ্চালন প্রভৃতিকে বিকার বলিলে, শব্দমাত্রেই বৈকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু, স্ফোট-নিরূপণ প্রসঙ্গে আচার্য্যেরা উল্লিখিত চেষ্টাকে প্রাকৃতিক বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি ধ্বনিকে শব্দজশব্দরূপে বর্ণনা করায় বুঝা যায়, স্ফোটশব্দের বিকারকেই তিনি ধ্বনি মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ধ্বনি যদি অনুচ্চারিত মধ্যমা বাগ্‌রূপী স্ফোটের বিকার হয়, তাহা হইলে স্ফোটকেও পশ্যন্তীবাকের বিকার বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি মানিয়া লইলে, পশ্যন্তী পরা বাকের বিকার এবং পরা বাক্ ইচ্ছাপ্রেরিত বায়ুর বিকার হইয়া পড়ে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি বলিতে চাই যে, সাধারণ শব্দগুলিকে শব্দজ শব্দ না বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

আচার্য্যেরা অর্থ-প্রতিপাদন-সমর্থ শব্দের স্ফোটত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কোন শব্দের উচ্চারণ ব্যতিরেকে তাহাদ্বারা অর্থবোধ হওয়া সম্ভব নহে। যাহা কাহারও শ্রবণ গোচরই হইল না, তাদৃশ সূক্ষ্ম শব্দ কেমন করিয়া অপরের অর্থবোধ জন্মাইবে? স্ফোট ও ধ্বনি হিসাবে যদি শব্দের মধ্যে দুইটি বিভাগ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে বরং সার্থক শব্দগুলিকে স্ফোট বলিয়া নিরর্থক শব্দগুলিকে ধ্বনি বলিলে, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। মেঘগর্জ্জনাদি নিরর্থক শব্দের স্ফোটসংজ্ঞা হইবে না; কারণ তাহারা 'স্ফুটত্যর্থো যস্মাৎ স স্ফোটঃ' এই লক্ষণের অন্তর্গত নহে। কিন্তু সার্থক শব্দমাত্রেই এই লক্ষণের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের স্ফোটসংজ্ঞা হওয়ার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকিবে না।

মনুষ্যের উচ্চারিত শব্দমাত্রেই স্ফোট—এমন কথাও বলা চলে না; কারণ মনুষ্যেরাও হাই তোলার কালে বা অন্য সময়ে কখন কখন নিরর্থক শব্দ

উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূলাধার হইতে উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ যে সকল শব্দ মনুষ্যের বদনপথে বিনির্গত হয়, তাহাদের সকলেই স্ফোটপদবাচ্য নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ আচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, যখন কোন লোক জ্ঞাত অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া শব্দ উচ্চারণ করে, তখনই সেই শব্দ স্ফোটপদবাচ্য হয় (৪২)।

আমাদের অনুভব হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সার্থক ও নিরর্থক সকল শব্দই মনুষ্যের একই প্রকার প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ফোটবাদীরাও কার্য্যতঃ মনুষ্যের উচ্চারিত শব্দগুলিকেও সার্থক এবং নিরর্থক ভেদে দ্বিবিধ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ভেরীনাদ বা বীণা, বেণু প্রভৃতির নিক্বণ ইত্যাদি যে স্ফোটাত্মক সাধারণ শব্দ হইতে ভিন্ন, আচার্য্য বিশ্বনাথও তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে ইহাই বলিয়াছেন (৪৩)।

স্ফোটের অপর লক্ষণ

কোন কোন আচার্য্য আবার স্ফোটের ভিন্নরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণ-জনিত স্মৃতির সহিত সম্বদ্ধ চরম-বর্ণের উচ্চারণের নাম 'স্ফোট'। এই মতে অশ্ব শব্দ উচ্চারণ করিলে সমগ্র অশ্বশব্দটিরই স্ফোট সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অ, শ্, ব্, অ এই চারিটি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণে কোন অর্থ হয় না বলিয়া ঐরূপ পৃথক্ উচ্চারণকে স্ফোট বলা হয় না। যদিও শ্ এর উচ্চারণের সময়ে প্রথমোচ্চারিত অ এর উচ্চারণ থাকে না, তথাপি তাহার একটি স্মৃতি বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের মনেই থাকে। অতএব, ব্ এর উচ্চারণের সময়ে অ এবং শ্ এই উভয় বর্ণের উচ্চারণ-জনিত স্মৃতি থাকিয়া যায়। এইভাবে শেষ অ এর উচ্চারণে সমগ্র অশ্বশব্দের উচ্চারণ হইয়া অর্থ প্রতিপাদিত হয় বলিয়া এইরূপ সমগ্র শব্দের উচ্চারণটিকেই স্ফোট নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যে স্থলে একটিমাত্র বর্ণও অর্থপ্রতিপাদন করিতে সমর্থ, সেইস্থলে এইরূপ স্মৃতি স্বীকার করা আবশ্যক হয় না। আবার সমগ্র বাক্যের উচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী

---

(৪২) বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শব্দৈর্নার্থঃ প্রকাশ্যতে। —বাক্যপদীয়।

জ্ঞাতমর্থং বিবক্ষোঃ পুংস ইচ্ছয়া জাতেন প্রযত্নেন যোগে এব মূলাধারস্থ-পবনসংস্কারঃ তদভিব্যক্তং শব্দব্রহ্ম...।—লঘুমঞ্জুষা (চৌখাম্বা); পৃষ্ঠা—১৭৪॥

(৪৩) শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ, মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।

কণ্ঠসংযোগাদিজন্যাবর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥—ভাষাপরিচ্ছেদ ; কারিকা—১৬৪॥

যাবতীয় শব্দের স্মৃতির সহিত শেষ শব্দস্থিত প্রত্যেকটি বর্ণের স্মৃতি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ উল্লিখিত অর্থে স্ফোটশব্দটিকে গ্রহণ করিলে তাহাকে আর সূক্ষ্ম বা মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য বলা চলে না। মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য সূক্ষ্ম শব্দ পর-শ্রবণগোচর হয় না বলিয়া ভর্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। তাঁহারা একথাও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বৈখরীনাদব্যঙ্গ্য স্থূল শব্দই পরশ্রবণগোচর হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণের পূর্ব্বে তাহাদের উচ্চারণজনিত স্মৃতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। আবার যে কোন বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ হইলেই তাহা পর-শ্রবণগোচর হইবে। উচ্চারণ-ব্যতিরেকে যেমন শব্দের অর্থ-প্রতিপাদন-ক্ষমতা জন্মে না, ঠিক তেমনি উচ্চারিত শব্দের পরশ্রবণ-গোচরতাও অস্বীকার করা চলে না। এইরূপ অর্থপ্রতিপাদন-সমর্থ পরশ্রবণগোচর উচ্চারিত শব্দের সূক্ষ্মত্ব স্বীকার করিবার মত কোন যুক্তিও নাই। বক্তার নিজ কর্ণে যে শব্দ পৌঁছিতে পারে, তাহা যতই মৃদু হউক না কেন, তদীয় বদন-সন্নিহিত পরকর্ণেও অবশ্যই পৌঁছিবে। সুতরাং মৃদুভাবে উচ্চারিত শব্দকে মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য এবং স্ফোটাত্মক বলিয়া তীব্রভাবে উচ্চারিত শব্দকে বৈখরীনাদব্যঙ্গ্য স্থূল ধ্বনি বলিবার পক্ষেও কোন যুক্তি দেখা যায় না। আর অর্থপ্রতিপাদন-ক্ষমতা যেমন মৃদু শব্দের মধ্যে থাকে, তেমনি তীব্রশব্দের মধ্যেও তাহা অবশ্যই বিরাজ করে।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণের স্মৃতি-সংবলিত চরম বর্ণের উচ্চারণই স্ফোট

দ্বিতীয় মতের প্রাচীনত্ব

—এই মতটি কোন সময়ে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। তবে ইহা যে অতি প্রাচীন, পুরাতন গ্রন্থসমূহে এই মতের আলোচনা দেখিয়া তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পাণিনির আবির্ভাবেরও পূর্ব্বে যে, স্ফোটায়ন, উপবর্ষ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, এইরূপ স্ফোটবাদ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে আচার্য্য শবরস্বামী এইরূপ স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সম-সাময়িক অন্যান্য গ্রন্থেও এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ন্যায়শাস্ত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেদান্তভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও এই স্ফোটবাদের বিপক্ষে যুক্তি

প্রদর্শন করিয়াছেন। আস্তিক দর্শনসমূহের বিভিন্ন টীকাগ্রন্থে স্ফোটবাদ সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়; এমন কি বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকেরাও স্ফোটবাদ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। বৌদ্ধ-দার্শনিক শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহ নামক গ্রন্থে এবং আচার্য্য কমল-শীল উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে বৌদ্ধাচার্য্যগণের যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৈয়াকরণদের লেখা প্রায় সমুদয় সমালোচনা-গ্রন্থেই স্ফোটবাদের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণকে এই সম্পর্কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) যাঁহারা মধ্যমানাদ-ব্যঙ্গ্য সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিশেষকে স্ফোট নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং (২) যাঁহারা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণের স্মৃতি-সংবলিত চরম বর্ণের উচ্চারণকেই স্ফোট বলিয়াছেন।

দ্বিবিধ স্ফোটবাদ

বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থেও শব্দের স্বরূপ এবং বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল সুচিন্তিত উক্তি আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, স্ফোটের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি মত অতিশয় প্রাচীন। তবে অতি প্রাচীনকালে এই শ্রেণীর আলোচনাকে স্ফোটবাদ বলা হইত কি না, তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না।

তন্ত্রশাস্ত্রেও স্ফোটবাদের উল্লেখ এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনা আছে। 'সারদা-তিলক' নামক সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থে শব্দ ও অর্থভেদে দ্বিবিধ স্ফোটের উল্লেখক্রমে তাহার বিপক্ষে যুক্তি দেখানো হইয়াছে (৪৪)। অন্যান্য তন্ত্রেও এই সম্বন্ধে বিবিধ উক্তি দেখা যায়। প্রাণতোষণীতন্ত্র নামক সংগ্রহ-গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর ৺রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "যাহা হইতে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাই স্ফোট" এইরূপ অর্থেই স্ফোট শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন (৪৫)।

তন্ত্র

আলঙ্কারিকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরীয় আচার্য্য মম্মট ভট্ট তাঁহার

(৪৪) শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জড়ত্বাদুভয়োরপি॥—সারদাতিলক, ১ম পটল।

(৪৫) স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি স্ফোটঃ।—প্রাণতোষণীতন্ত্র।

কাব্যপ্রকাশ নামক গ্রন্থে উক্ত দ্বিতীয় অর্থেই স্ফোটশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (৪৬)। পণ্ডিতপ্রবর ৺মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার 'আদর্শটীকা' নামক কাব্যপ্রকাশের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত অর্থেই স্ফোটশব্দটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৪৭)।

অলঙ্কার

কাব্যপ্রকাশকার মূলে বলিয়াছেন—

"ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।"

—প্রথম উল্লাস ; কারিকা—৪ ॥

ইহার ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন—"বুধৈর্বৈয়াকরণৈঃ"। তাহা হইলে কি এই সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের নিজস্ব কোন মত নাই?—এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উপজাত হয়। আদর্শটীকাকার তাঁহার ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও আলঙ্কারিকেরা এই মতই স্বীকার করেন, তথাপি প্রাচীন বৈয়াকরণেরা বহু পূর্ব্বেই এইরূপ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়ায় বিশেষ করিয়া তাঁহাদের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে (৪৮)।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ভাষ্যসমূহে (৪৯) বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার স্ফোট সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মা ভোজরাজ যদিও নিয়তক্রমবিশিষ্ট শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য একার্থ-প্রতিপাদক বর্ণসমষ্টিকেই শব্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি ক্রমরহিত স্ফোটাত্মক শব্দ-স্বীকারেও তাঁহার আপত্তি নাই বলিয়াই তাঁহার লেখা হইতে বুঝা যায়। মহারাজ ভোজদেব শব্দেরই স্ফোটত্ব স্বীকার করিয়াছেন,

ভোজরাজ

---

(৪৬) বুধৈর্বৈয়াকরণৈঃ প্রধানভূতস্ফোটরূপব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকস্য শব্দস্য ধ্বনিরিতি ব্যবহারঃ কৃতঃ।
—কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস।

(৪৭) বুধৈর্বৈয়াকরণৈরিতি। আশুবিনাশিনাং ক্রমিকাণাং মেলকাভাবাদনেকবর্ণঘটিত-কলসাদিপদস্য জ্ঞানাসম্ভবাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণানুভবজন্য-সংস্কারসচিব্যানুভূয়মানচরমবর্ণস্য পদব্যঞ্জকত্বং তৈরুচ্যতে। পদস্য স্ফোটপরিভাষা-চরম-বর্ণস্য ধ্বনিপরিভাষা চ তৈঃ কৃতা। অর্থবোধকত্বাদ্ বর্ণাপেক্ষয়া পদং প্রধানং তচ্চ স্ফোটাখ্যব্যঙ্গ্যমেবং তদ্‌ব্যঞ্জকস্য শব্দস্যেতি চরমবর্ণরূপশব্দস্যেত্যর্থঃ।—আদর্শ টীকা।

(৪৮) অত্র কারিকাস্থস্য বুধপদস্য আলঙ্কারিকবুধপরত্বেঽপি ধ্বনিব্যবহারসংবাদপ্রদর্শনার্থং বৈয়াকরণরূপবুধানাং মতং দর্শয়তি বুধৈর্বৈয়াকরণৈরিতি।—আদর্শ টীকা।

(৪৯) বিভূতিপাদ, ১৭ শ সূত্রের ভাষ্য।

অর্থের নহে। তাঁহার মতে স্ফোটাত্মক শব্দগুলিকে পদ এবং বাক্য ভেদে দ্বিধা বিভক্ত করা যাইতে পারে (৫০)।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে শব্দের অর্থ-প্রতিপাদনে কেবলমাত্র সঙ্কেতই সহায়তা করে; অতএব, সঙ্কেতের দ্বারাই অর্থবোধ হওয়ায় স্ফোট নামে অন্য কিছু স্বীকার করা অনাবশ্যক। ন্যায়দর্শনের ২।১।৫৫ সূত্রে মহর্ষি গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শনের ৭।২।২০ সূত্রে মহর্ষি কণাদ এইরূপ সঙ্কেত বা সময়ের কথা বলিয়াছেন এবং বৈশেষিক দর্শনের ২।২।২১ সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাত্মা শঙ্কর মিশ্র পরিষ্কার ভাষায় স্ফোটের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের উল্লিখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন (৫১)।

স্ফোটের বিরুদ্ধ পক্ষ

ন্যায় ও বৈশেষিক

ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত উক্ত সঙ্কেতের বিরুদ্ধে শবরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য শবরস্বামী তাঁহার মীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরেচ্ছাকেই সঙ্কেত বলিয়া স্বীকার করিলে প্রশ্ন উঠিবে—ঈশ্বর যখন কোন বিশেষ শব্দদ্বারা বিশেষ অর্থ বুঝান, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ শব্দের অর্থবোধ সামর্থ্যরূপ একটি সঙ্কেত ইহার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল; নতুবা ঈশ্বর কেন একটি বিশেষ অর্থ বুঝাইবার জন্য বিশেষ একটি শব্দ গ্রহণ করিবেন? এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে সঙ্কেতের আদি পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এতাদৃশ অনবস্থারূপ দোষ হইতে মুক্ত থাকার জন্য সঙ্কেত স্বীকার না করাই উচিত।

অনাদি-সঙ্কেত

শবরস্বামী প্রভৃতি মীমাংসকদের উল্লিখিত যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য মহাত্মা জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী নামক গ্রন্থে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের যুক্তিটি সুন্দর হয় নাই। তিনি অন্য কোনরূপ যুক্তি না পাইয়া ঈশ্বরের লোকাতীত ক্ষমতার দোহাই

জয়ন্ত ভট্ট

---

(৫০) শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো নিয়তক্রমবর্ণাত্মা নিয়তৈকার্থপ্রতিপত্তিবিচ্ছিন্নঃ যদি বা ক্রমরহিত-স্ফোটাত্মা ধ্বনিসংস্কৃত-বুদ্ধিগ্রাহ্য, উভয়থাপি পদরূপো বাক্যরূপশ্চ, তয়োরেকার্থ-প্রতিপত্তৌ সামর্থ্যাৎ। —ভোজবৃত্তি ( পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, সূত্র ১৭ )

(৫১) সঙ্কেতবদ্বর্ণত্বং পদত্বম্। তথা চ সঙ্কেতবলাদেব পদার্থপ্রতীতৌ কিং স্ফোটেন।
—উপস্কার ( ২।২।২১ সূত্রের ব্যাখ্যা )।

দিয়াছেন। এইরূপ যুক্তি কেবলমাত্র আস্তিকগণই মানিয়া লইতে পারেন ; নাস্তিকদের কাছে ইহার কোন মূল্য নাই।

ন্যায়বৈশেষিক-সম্মত উল্লিখিত সঙ্কেতের দ্বারা বস্তুতঃ স্ফোটবাদীদের মত খণ্ডিত হয় নাই। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকেরা বলিয়াছেন "এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থ বুঝাইবে—এবংবিধ ঈশ্বরেচ্ছাই সঙ্কেত," আর স্ফোটবাদীদের মতে উক্ত শব্দটিই স্ফোটাত্মক। অতএব, স্ফোট না থাকিলে ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত সঙ্কেতের গ্রহণই হইতে পারিবে না। আমরা স্ফোট অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। তবে আমাদের বিবেচনায় স্ফোট ও সার্থক শব্দ বস্তুতঃ অভিন্ন। ইহা থাকিলেই সঙ্কেত গৃহীত হইতে পারে ; নতুবা নহে।

আলোচনা

স্ফোটাত্মক শব্দ, সঙ্কেত এবং অর্থ ইহাদের প্রত্যেকটিই অপরটি হইতে ভিন্ন। স্ফোটাত্মক শব্দ বলিতে অর্থপ্রকাশ-সমর্থ শব্দকে বুঝায়। সঙ্কেত বলিতে আমরা বুঝি শব্দের অর্থপ্রকাশ-সামর্থ্যকে ; আর অর্থ বলিতে বুঝি শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থ-বিশেষকে। স্ফোটাত্মক শব্দের প্রতীতি প্রত্যক্ষ ; কারণ, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ইহার প্রতীতি হয়। অপর পক্ষে অর্থপ্রতীতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ; ইহা সম্পূর্ণ পরোক্ষ।

স্ফোট, সঙ্কেত, অর্থ

সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে গিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—স্ফোটবাদীরা যে স্ফোটের কথা বলেন, তাহা কি প্রতীত হইয়া অর্থ প্রতিপাদন করে ? না, প্রতীত না হইয়াই অর্থপ্রতিপাদন করিয়া থাকে ? যদি বলা হয়, স্ফোট প্রতীত হইয়া অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে ইহার উত্তর এই যে, বর্ণসমূহের আনুপূর্ব্বী (যথাক্রমে অবস্থিতি) দ্বারাই অর্থ প্রতিপাদিত হওয়ায় বস্তুতঃ স্ফোটের প্রতীতি উপলব্ধ হয় না। আর, স্ফোট প্রতীত না হইয়াই অর্থ প্রতিপাদন করে—এমন কথাও বলা চলে না ; কারণ যাহার প্রতীতিই হইল না, সে অর্থপ্রতিপাদন করিবে কেমন করিয়া ? সাঙ্খ্যদর্শনের ৫।৫৭ সূত্রে সূত্রকার এবং উহার ভাষ্যে মহাত্মা বিজ্ঞানভিক্ষু সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের উল্লিখিত মত ও যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন (৫২)।

সাঙ্খ্যদের যুক্তি

---

(৫২) প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ।—সাংখ্যসূত্র (৫।৫৭)

স শব্দঃ কিং প্রতীয়তে ন বা ? আদ্যে যেন বর্ণসমুদায়েনানুপূর্ব্বীবিশেষবিশিষ্টেন সোঽভিব্যজ্যতে, তস্যৈবার্থপ্রত্যায়কত্বমস্তু কিমন্তর্গড়ুনা তেন। অন্ত্যে ত্বজ্ঞাতস্ফোটস্য নাস্ত্যর্থপ্রত্যায়নশক্তিরিতি ব্যর্থা স্ফোটকল্পনা।—ঐ, সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

বস্তুতঃ সাংখ্যেরা যাহাকে আনুপূর্ব্বী বলিয়াছেন, তাহাকেই স্ফোটবাদীরা স্ফোট নামে অভিহিত করিয়াছেন ; সুতরাং উভয় মতের মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই।

মীমাংসকেরাই স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে অধিক কথা বলিয়াছেন। মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেকখানি গ্রন্থেই স্ফোটবাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। আচার্য্য শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যে স্ফোটবাদ খণ্ডনে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভট্ট কুমারিল তাঁহার গ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকে স্ফোটবাদের বিপক্ষে বহু কথা-বলিয়াছেন। শ্লোকবার্ত্তিকের ন্যায়রত্নাকর নামক টীকায় আচার্য্য পার্থসারথিমিশ্র কুমারিল ভট্টের মত সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু উল্লিখিত পার্থসারথিমিশ্র মহোদয় তাঁহার রচিত শাস্ত্রদীপিকা নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

মীমাংসা

কুমারিল

পার্থসারথিমিশ্র

কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকেরা স্ফোটের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ভট্ট কুমারিল বলেন—বর্ণব্যতিরিক্ত স্ফোট নামে কোন কিছু অর্থের প্রত্যায়ক হয় না। যদি স্ফোট নামে কিছু থাকিত, তাহা হইলে ঘট ইত্যাদির ন্যায় অবশ্যই তাহা প্রত্যক্ষ হইত (৫৩)।

কুমারিলের যুক্তি

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার তত্ত্ববিন্দু নামক গ্রন্থে মীমাংসকসম্মত অভিহিতান্বয়বাদ সমর্থন পূর্ব্বক স্ফোটবাদ খণ্ডনের জন্য বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের যুক্তিগুলিতে অভিনবত্ব আছে। এই কারণে আমরা তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিগুলির দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিব। স্ফোটবাদের বিপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শন প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র বাক্যার্থনিরূপণে পাঁচটি বিভিন্ন মতের উল্লেখক্রমে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত পাঁচটি মত যথা—

বাচস্পতি

(১) সমগ্র বাক্যটিই অর্থবোধ করায়। বাক্যের কোন অবয়ব নাই। বর্ণ, পদ প্রভৃতির দ্বারা বাক্যের অবয়ব-কল্পনা অলীক এবং ভ্রমাত্মক (অন্বিতাভিধানবাদীদের মত)।

---

(৫৩) নার্থস্য বাচকঃ স্ফোটো বর্ণেভ্যো ব্যতিরেকতঃ।
ঘটাদিবন্ন দৃষ্টেন বিরোধো ধর্ম্ম্যসিদ্ধিতঃ॥
মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক ; স্ফোটবাদ প্রকরণ, শ্লোক—১৩৩

(২) পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণ, পদ ও পদার্থের অনুভব-জনিত-সংস্কার-সংবলিত অন্ত্যবর্ণের জ্ঞান বাক্যার্থপ্রতীতি করায় (প্রাচীন মীমাংসক ও স্ফোটবাদীদের মত)।

(৩) বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণ, পদ এবং পদার্থের অনুভবের ফলে স্মৃতিদর্পণে (মানসপটে) বর্ণমালা আরূঢ় হইয়া সমগ্র বাক্যের অর্থ প্রতিপাদন করে (সাঙ্খ্যমত)।

(৪) পদগুলিই আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও পরস্পর-সন্নিধ্যবশতঃ বাক্যার্থ বুঝাইয়া থাকে (আলঙ্কারিক মত)।

(৫) প্রথমে প্রত্যেকটি পদ নিজ নিজ অর্থ বুঝায়। অতঃপর ঐ সকল পদার্থের অন্বয়ের ফলে বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে (অভিহিতান্বয়বাদীদের মত) (৫৪)।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, আচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র উল্লিখিত পাঁচটি মতের মধ্যে স্ফোটবাদীদের মতের উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাচীন-মীমাংসক-সম্মত 'সংস্কার' এবং স্ফোটবাদীদের স্বীকৃত 'স্মৃতি' এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বাচস্পতিমিশ্র মনে করেন না। তাঁহার মতে সংস্কার থাকিলে স্মৃতি অবশ্যই থাকিবে। এই কারণেই তিনি প্রাচীন মীমাংসক এবং স্ফোটবাদী এই উভয়ের মত হিসাবেই উল্লিখিত দ্বিতীয় মতটি প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কার খণ্ডন প্রসঙ্গে স্মৃতিরও খণ্ডন করিয়া তাহার পরই আচার্য্য মিশ্র উল্লিখিত তৃতীয় মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে আমরা তাঁহার উল্লিখিত অভিপ্রায় জানিতে পারি।

কেবল বাচস্পতিমিশ্রই নহেন, অন্যান্য কোন কোন আচার্য্যও স্মৃতি ও সংস্কারের অপরিহার্য্য সম্পর্ক হেতু বৈয়াকরণদিগকেও সংস্কারবাদী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তহিসাবে

স্মৃতি ও সংস্কার

(৫৪) কেচিদাহুরনবয়বমেব বাক্যমনাদ্যবিদ্যোপদর্শিতালীকবর্ণপদবিভাগমস্যা নিমিত্তমিতি। পারমার্থিক-পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ-পদ-পদার্থানুভবজনিত-সংস্কারসহিতান্ত্যবর্ণবিজ্ঞানমিত্যেকে। প্রত্যেক-বর্ণ পদ-পদার্থানুভাবিত-ভাবনানিচয়-জন্মলব্ধ-স্মৃতিদর্পণারূঢ়া বর্ণমালেত্যন্যে। পদান্যেবাকাঙ্খিত যোগ্য-সন্নিহিতার্থান্তরান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনীত্যপরে। পদৈরেব সমভিব্যাহারবদ্ভিরভিহিতাঃ স্বার্থা আকাঙ্খা-যোগ্যতা-সন্নিধিসধ্রীচীনা বাক্যার্থধীহেতব ইত্যাচার্য্যাঃ।

—তত্ত্ববিন্দু ( E. G. Lazarus & Co, Benaras ) পৃষ্ঠা-১-২।

বাক্যপদীয়ের ( ব্রহ্মকাণ্ড ; ৮৫ শ্লোকের ) পুণ্যরাজ-টীকা এবং কাব্যপ্রকাশের আদর্শ-টীকার উল্লেখ করা যাইতে পারে (৫৫)।

সংস্কারের অর্থবোধ-জনকতা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য বাচস্পতি-মিশ্র প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—এই সংস্কার শব্দদ্বারা প্রতিপক্ষ কি বুঝেন ? স্মৃতির কারণ-বিশেষ, না আর কিছু (৫৬) ? অতঃপর, এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তিনি বলিয়াছেন—বিভিন্ন শাস্ত্রে সংস্কারকে স্মৃতি-জ্ঞানের হেতুরূপেই বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সংস্কার একমাত্র আত্মাতেই থাকিতে পারে ; সুতরাং বর্ণ বা পদ প্রভৃতির মধ্যে সংস্কার থাকা সম্ভব না হওয়ায় এইরূপ সংস্কারকে অর্থবোধের কারণরূপে স্বীকার করা চলে না (৫৭)।

আচার্য্য পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—যাঁহারা সংস্কারকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের কারণ মনে করেন, তাঁহাদের মতে উক্ত সংস্কার পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতি উৎপাদন করিয়া অর্থবোধ জন্মায় ; না এইরূপ স্মৃতি উৎপাদন না করিয়াই অর্থবোধ জন্মায় (৫৮) ? ইহার উত্তর হিসাবে তিনি বলিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতি উৎপাদনকালে অর্থবোধেরও উৎপাদন হওয়া অসম্ভব ; কারণ, মনের সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহাতে একসঙ্গে দুইটি জ্ঞানের উপস্থিতি হইতে পারে না। আর পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতি ব্যতিরেকেই অর্থবোধ কল্পনাও সম্ভব নহে ; কারণ তাহা হইলে যে কোন শব্দ হইতে যে কোন অর্থের বোধ হইত (৫৯)।

---

(৫৫) পাদটীকা—৪৭ ॥

(৫৬) পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতোঽন্ত্যো বর্ণঃ প্রত্যায়কোঽর্থস্য, তেন তথৈব একানুভবকল্পনেতি চেন্ন, বিচারাসহত্বাৎ। কো নু খল্বয়ং সংস্কারোঽভিমতঃ আয়ুষ্মতঃ ? কিং স্মৃতিবীজমন্যো বা ?—তত্ত্ববিন্দু ; পৃষ্ঠা ৫—৬ ॥

(৫৭) অপি চ, সংস্কার ইতি চ বাসনেতি চ ভাবনেতি চ প্রাচীনানুভবজনিতমাত্মনঃ সামর্থ্যভেদমেব স্মৃতিজ্ঞানপ্রসবহেতুমাচক্ষতে, ন তস্যৈবার্থপ্রত্যয়প্রসবশক্তিঃ শক্যা কল্পয়িতুম্। সা খল্বভিধেয়ধীপ্রসবোন্নীতসম্ভাবা ফলবত্যান্যস্যৈব যুক্তা কল্পয়িতুম্, ন পুনরতদ্বতাম্।

—তত্ত্ববিন্দু, পৃষ্ঠা ৬ ॥

(৫৮) স চ চরমপদতদর্থসম্বন্ধস্মৃতিমাধায় বাক্যার্থধিয়মাদধীতানাধায় বা ?

—তত্ত্ববিন্দু। পৃষ্ঠা—১৫ ॥

(৫৯) আধায় চেত্তদ্ধেতুভাবনোদ্বোধসময়ে স্বজন্যসংস্কারকারণবিনাশভ্রাতশ্রুতিরশ্রূয়মাণঃ সম্বন্ধস্মৃতিসময়ে কথং তৎকারী বাক্যার্থপ্রত্যয়মাদধীত ? ন চ তদসহকারিণো বাক্যার্থধীহেতুভাব ইতি সাম্প্রতম্। অস্মরণে তদনুভববৈয়র্থ্যেনাগৃহীতসঙ্গতেরপি প্রথমশ্রাবিণো ভিত্তি প্রাসেন

এতদ্ব্যতীত স্মৃতি এবং সংস্কার এই উভয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতিপাদনের সাহায্যেও বাচস্পতিমিশ্র সংস্কার এবং স্মৃতি উভয়েরই অর্থবোধ-জননে অসামর্থ্যের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন শ্লোকের উল্লেখক্রমে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরবর্ণের উচ্চারণ কালে পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতি বা সংস্কার কোনটাই থাকিতে পারে না (৬০); সুতরাং স্ফোটবাদীদের মতটি ঠিক নহে বলিয়াই তিনি মনে করেন। এই বিষয়েও তিনি একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, মেঘান্ধকার রজনীতে বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণমাত্র অবস্থান করে, স্মৃতি বা সংস্কারও তেমনি মানুষের মনে ক্ষণকাল মাত্রই অবস্থান করিতে পারে (৬১)।

কেবল বাচস্পতি মিশ্রই নহেন; অন্যান্য আস্তিক এবং নাস্তিক দার্শনিকেরাও স্মৃতি ও সংস্কারের ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন (৬২)। ভাষা-পরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থেও মনের অণুত্বের যুক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানদ্বয়ের যুগপৎ উপস্থিতির অভাবই মনের অণুত্বের প্রতি প্রমাণ (৬৩)।

প্রশস্তপাদ প্রভৃতি কোন কোন আচার্য্য বলেন—একাধিক জ্ঞানের এক কালে উৎপত্তি সম্ভব না হইলেও তাহাদের সহাবস্থান সম্ভব। তাঁহাদের

---

ভিদুরমিতি বাক্যার্থপ্রত্যয়প্রসঙ্গাৎ। ন চান্ত্যবর্ণোদ্বোধিতসংস্কারাধীনজন্মা স্মৃতিরনুভবেন সহ যুগপদুৎপত্তুমর্হতি। ন চ ন্যায্যো যুগপদুৎপাদঃ প্রত্যয়ানাং করণস্য প্রত্যয়পর্য্যাসে সামর্থ্যাৎ।
—তত্ত্ববিন্দু; পৃষ্ঠা—১৫ ১৬॥

(৬০) নান্ত্যবর্ণশ্রুতিঃ স্মৃত্যানীতা বাক্যার্থবোধিনী।
ন স্মৃতিস্তদপেক্ষত্বাদ্ যৌগপদ্যং ন চানয়োঃ॥

স খল্বন্ত্যো বর্ণঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণ-পদ-পদার্থ-বিজ্ঞানজনিতবাসনানিচয়সচিব-শ্রবণেন্দ্রিয়-সমধিগত-জন্মস্মরণগ্রহণরূপাবাপ্তবৈচিত্র্যসদসদ্বর্ণনির্ভাস প্রত্যয়বিপরিবর্ত্তী বাক্যার্থধীহেতুরূপেয়তে।
—তত্ত্ববিন্দু; পৃষ্ঠা—১৫॥

(৬১) ন চ তাবন্তং কালমস্তি প্রথমোৎপন্ন-ধ্বনিজনিতসংস্কারভেদো যতঃ পুনরপি বর্ণবিষয়বিজ্ঞানং জনয়েৎ। যথাহুঃ—

ক্ষণিকং সাধনং চাস্য বুদ্ধিরপ্যনুবর্ত্ততে।
মেঘান্ধকারশর্ব্বর্য্যাং বিদ্যুজ্জনিতদৃষ্টিবৎ॥—তত্ত্ববিন্দু; পৃষ্ঠা—১৬॥

(৬২) ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে॥—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ; বৌদ্ধদর্শন।

(৬৩) সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মনঃ উচ্যতে।
অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে।—ভাষাপরিচ্ছেদ; কারিকা—৮৫॥

যুক্তি এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটিকে বিনষ্ট না করিয়া পরবর্ত্তী জ্ঞান তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত পরবর্ত্তী জ্ঞান ক্ষণেকের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের একই সঙ্গে একত্র অবস্থান করে। এই সময়ে উভয় জ্ঞানের সঙ্ঘর্ষের ফলে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, কেবলমাত্র তখনই পরবর্ত্তী জ্ঞান তাহার স্থানটি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষি প্রশস্তপাদ এই প্রসঙ্গে বধ্য-ঘাতকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাঘ্র যখন হরিণকে বিনাশ করে, তখন হরিণের সঙ্গে তাহার একটি সঙ্ঘর্ষ হয়। উভয়ে একত্র অবস্থান না করিলে এই সঙ্ঘর্ষ হইতে পারে না; আর সঙ্ঘর্ষ না হইলে হরিণের বিনাশও হইতে পারে না। মহর্ষি প্রশস্তপাদের মতে জ্ঞানদ্বয়ের সহাবস্থানও এইভাবেই হইয়া থাকে।

বধ্যঘাতক দৃষ্টান্ত

এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—ব্যাঘ্র যখন হরিণকে বধ করে, তখন তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হয় বটে; কিন্তু সহাবস্থান হয় বলিয়া স্বীকার করিব কেন? ব্যাঘ্র ও হরিণ পাশাপাশি থাকে বলিয়াই তো প্রতীয়মান হয়। হরিণ যে ভূমিটুকুর উপর দণ্ডায়মান থাকে, ব্যাঘ্র তো ঠিক সেই ভূমিটুকুর উপরই দণ্ডায়মান থাকে না। হরিণের দেহটিকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করে বটে; কিন্তু তাহা তো স্থানরূপ আধারের আধেয় মাত্র। অতএব এইরূপ বলাই কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে যে, পরবর্ত্তী জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটিকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার স্থানটি দখল করিয়া লয়?

এই প্রসঙ্গে জ্ঞানের আশ্রয় কি এবং কিসের সাহায্যে তাহার উপলব্ধি হয়, ইহাও স্থির করা আবশ্যক। ন্যায়বৈশেষিক মতে জ্ঞানের আশ্রয় আত্মা এবং মন জ্ঞানোপলব্ধির করণ, এই মনের অতি সূক্ষ্মতাই ন্যায়বৈশেষিকসম্মত। ন্যায়বৈশেষিক মতে আত্মা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তাহার মধ্যে একাধিক জ্ঞানের সহাবস্থান সম্ভব।

এখানেও প্রশ্ন উঠে—উপনিষৎসমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি, জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে আত্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কেবলমাত্র পরমাত্মাই বিভু বা সর্ব্বব্যাপী ( all pervading )। জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম। বহিঃস্থিত জ্ঞান মানুষের অন্তঃস্থ মনের দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। মানুষের জ্ঞান তাহার অন্তঃস্থিত জীবাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া আমরা মনে করি। এই জীবাত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাহাতে এক-

সঙ্গে একাধিক জ্ঞানের অবস্থিতি কল্পনা করা অসম্ভব। উপনিষৎ বলেন—মানুষের চিন্তাশক্তি যে ক্ষুদ্রতম পদার্থ কল্পনা করিতে পারে, জীবাত্মা তাহার চেয়েও ক্ষুদ্র (অণোরণীয়ান্)। অতএব, এত সূক্ষ্ম আত্মায় একসঙ্গে একাধিক জ্ঞান কেমন করিয়া অবস্থান করিবে ?

তাহা ছাড়া জ্ঞানোপলব্ধির করণ মন অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই ন্যায়বৈশেষিক মতে স্বীকৃত হইয়াছে। একটি তীক্ষ্ণাগ্র সূঁচদ্বারা যেমন একসঙ্গে একাধিক বস্তু বিদ্ধ করা সম্ভব নহে, তেমনি অতিসূক্ষ্ম মনোদ্বারাও এককালে একাধিক জ্ঞানের উপলব্ধি সম্ভব নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। একস্থানে অনেকগুলি কাগজ বা পদ্মপত্রাদি রাখিয়া যখন একটি সূঁচ দ্বারা একই চাপে তাহাদিগকে বিদ্ধ করা হয়, তখনও উক্ত সূঁচ একটির পর একটি করিয়াই কাগজ বা পদ্মপত্র বিদ্ধ করিয়া থাকে। মনও তেমনি একটি জ্ঞানের উপলব্ধির পরই অপর জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে; অতএব মনুষ্যোপলব্ধ জ্ঞানদ্বয়ের সহাবস্থান বা সহোপলব্ধি কোনটিই সম্ভব নহে।

সাঙ্খ্যমতে জ্ঞানের আশ্রয় মন এবং তাহা বিভু; সুতরাং তাঁহাদের এই মত স্বীকার করিলে মনের মধ্যে একাধিক জ্ঞানের সহাবস্থান সম্ভব। মহর্ষি প্রশস্তপাদ সাংখ্যমতাবলম্বী নহেন; সুতরাং তাঁহার বধ্যঘাতক দৃষ্টান্তটি আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে।

আমাদের অনুভবদ্বারাও আমরা একাধিক জ্ঞানের সহোৎপত্তি বা সহাবস্থান উপলব্ধি করি না; পরবর্ত্তী জ্ঞান কি ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করিতেছি। মনে করুন—একটি বালক এমন একটি আধারের উপর এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছে, যাহার আয়তন ছেলেটির পায়ের আয়তনের ঠিক সমান। অপর একটি বালক আসিয়া দণ্ডায়মান বালকটিকে এক ধাক্কায় তাহার আধারভূত কাষ্ঠখণ্ডের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া নিজে উহার উপর দণ্ডায়মান হইল। এক্ষেত্রে কি আমরা বলিব যে, উভয় বালক একই কাষ্ঠখণ্ডের উপর একসঙ্গে অবস্থান করিয়াছে ? নিশ্চয়ই আমরা এইরূপ বলিব না। এক্ষেত্রে যেমন উভয় বালকের মধ্যে সজ্ঘর্ষ হইলেও একই আধারে উভয়ের অবস্থিতি এককালে হয় না, ঠিক তেমনি মনুষ্যোপলব্ধ জ্ঞানদ্বয়ের অবস্থিতিও একাধারে এককালে হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

স্মৃতিসমারূঢ়া বর্ণমালাকে অর্থজ্ঞানের কারণ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন,

বাচস্পতিমিশ্রের মতে তাঁহাদের মতটিও কল্পনাগৌরব প্রভৃতি বিবিধ দোষে দুষ্ট (৬৪)। এতদ্ব্যতীত উল্লিখিত প্রথম (অন্বিতাভিধানবাদীদের) এবং চতুর্থ (আলঙ্কারিকদের) মত দুইটির বিপক্ষেও বাচস্পতিমিশ্র বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ সকল মতের সঙ্গে স্ফোটবাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকায় তাহাদের সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনা করিলাম না।

বাক্যস্ফোট ও পদস্ফোট

বাচস্পতি মিশ্রের মতে, বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের পৃথক্ অর্থ থাকায় বাক্যস্ফোট কল্পনা অনাবশ্যক। পদের অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণের কোন পৃথক্ অর্থ না থাকায় তিনি পদস্ফোট স্বীকারেরও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন না। যে স্থলে একটিমাত্র বর্ণ অর্থবোধ করায়, তথায় উক্ত বর্ণের পদত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে: সুতরাং বর্ণস্ফোট স্বীকারও তাঁহার মতে অনাবশ্যক। তত্ত্ববিন্দু গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য গঙ্গাধর শাস্ত্রী একটি শ্লোকদ্বারা বাচস্পতিমিশ্রের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন (৬৫)। বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যেকটি পদই অর্থের অভিধায়ক; বাক্য অর্থের অভিধায়ক নহে; বাক্যার্থ লাক্ষণিক (৬৬)। তিনি বলেন—পদগুলি যে সার্থক, পদশব্দের ব্যুৎপত্তিই তাহার প্রমাণ (৬৭)।

আমরা আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—পদার্থসমূহ বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের এক একটি পৃথক্ অর্থ আছে বটে; কিন্তু জ্ঞানের ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব হেতু পরবর্ত্তী পদার্থের বোধের সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থের বোধ থাকে না। ঐ সময়ে পূর্ব্বপদার্থের স্মৃতি বা সংস্কার থাকে বলিয়াও বাচস্পতি মিশ্র বলিতে পারেন না; কারণ স্মৃতি বা সংস্কারের ক্ষণমাত্র-স্থায়িত্বই তিনি স্বীকার

---

(৬৪) গৌরবাদ্ বিষয়াভাবাত্তদ্বদ্ধেয়েব ভাবতঃ।
বাক্যার্থধিয়মাধত্তে স্মৃতিস্থানাক্ষরাবলী ॥—তত্ত্ববিন্দু; পৃষ্ঠা—১৬ ধৃত।

(৬৫) স্ফোটেঽথ বাক্যচরমাক্ষরসর্ব্ববর্ণাবলোঃ পদেষু চ নিরস্ত পথা নবেন।
সংস্কারিতেষ্বিহ হি বস্তুষু সুপতিঙন্তৈঃ শাব্দপ্রমাজনকতা নিরধারি মিশ্রৈঃ।
—৺গঙ্গাধরশাস্ত্রিকৃত তত্ত্ববিন্দুভূমিকা।

(৬৬) তস্মাদভিধাতৃত্বমপি নান্বিতাভিধান ইতি কল্পনালাঘবাদাকাঙ্ক্ষাদিলক্ষণসহকারি-প্রত্যাসন্নৈশ্চ সমভিব্যাহৃত-পদস্মারিতৈঃ পদার্থৈঃ প্রত্যাসত্ত্যা গম্যমানো বাক্যার্থো লাক্ষণিকঃ শাব্দশ্চেতি রমণীয়ম্। —তত্ত্ববিন্দু; পৃষ্ঠা—৩৪॥

(৬৭) পদং পদ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা।—ঐ; পৃষ্ঠা—১২॥

করিয়াছেন। অতএব, দ্বিতীয় পদের অর্থবোধের সময়ে প্রথম পদার্থের উপস্থিতি সম্ভব না হওয়ায় পদার্থ হইতে বাক্যার্থকে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাক্যে-স্ফোট খণ্ডনের জন্য বাচস্পতিমিশ্র যে যুক্তিটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। এই সম্বন্ধে আরও যুক্তি পরে প্রদর্শন করিব।

পদস্ফোটের অনুকূলে সেনা, বন প্রভৃতির যে দৃষ্টান্তটি প্রতিপক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা খণ্ডনের জন্যও বাচস্পতি মিশ্র প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতিপক্ষের যুক্তিটির উল্লেখক্রমে তাহার খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—সেনা বলিতে যেমন হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতির সমষ্টিকে, অথবা বন বলিতে যেমন অশ্বত্থ, চম্পক, অশোক, খদির প্রভৃতির সমষ্টিকে বুঝায়, গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দও তেমনি মিলিতভাবে গকারাদি বা অকারাদি বর্ণগুলির সমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং পদস্ফোট স্বীকার্য্য। অর্থাৎ সেনা বা বন বলিতে যেমন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির বা অশ্বত্থ, চম্পক ইত্যাদির জ্ঞানের সহিত সংযুক্তভাবে উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের সামগ্রিক অর্থ বুঝা যায়, গো প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণেও তেমনি গ প্রভৃতি বর্ণের সংস্কারের সহিতই সমগ্র শব্দটির অর্থ উপলব্ধ হয়। প্রতিপক্ষের এইরূপ যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে সেনা, বন প্রভৃতির অর্থবোধ এবং গো, অশ্ব ইত্যাদি শব্দের অর্থবোধ একপ্রকার নহে। সেনা বা বন শব্দের অর্থ বুঝিবার সময় হস্তী প্রভৃতির বা অশ্বত্থ ইত্যাদির জ্ঞান থাকে; কিন্তু গো, শব্দের অর্থবোধে গ প্রভৃতি বর্ণ এইরূপ কোন পৃথক্ অর্থ বুঝায় না। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রতিপক্ষের উল্লিখিত যুক্তি অচল। গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দ এক একটি অবিভক্ত জন্তুকেই বুঝায়। ইহাদের উচ্চারণে গকারাদি বর্ণের পৃথক্ অর্থ উপলব্ধ না হওয়ায় পদস্ফোট-স্বীকার অনাবশ্যক (৬৮)। বস্তুতঃ আচার্য্য

---

(৬৮) ন বয়মেকাবভাসপ্রত্যয়মেকবস্তুব্যবস্থিতৌ প্রমাণয়ামঃ কিন্তু ব্যপদেশমাত্রম্। ভবতি হি করিতুরগাদিষশ্বত্থচম্পকাশোকখদিরধবকিংশুকাদিষু নানাত্বেঽপি কথঞ্চিদেকমুপাধিমাশ্রিত্য সেনা বনমিতি ব্যপদেশমাত্রং লৌকিকানাম্। ন চৈতাবতা সেনা বনং বা করিচম্পকাদ্যবয়ব-সমবায্যেকমবয়বি প্রসিধ্যতি। তথৈব গকারাদয়োঽপি পূর্ব্বোপলব্ধি-বিপরিবর্ত্তিনো রূপাদন্যূনাধিকা একস্যাং স্মৃতৌ প্রথমানাঃ সন্তোঽপি পদমিতি ব্যপদেশ-ভেদেনৈকানুব্যাধবন্তো ভবিতুমর্হন্তি উপাধিবিরহাৎ। —তত্ত্ববিন্দু; পৃষ্ঠা—১১॥

মিশ্রের এই যুক্তিদ্বারা প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে বটে; কিন্তু পদস্ফোট খণ্ডিত হয় না।

এক একটি বর্ণ যখন এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝায়, তখন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বর্ণ উচ্চারণের কোনরূপ স্মৃতি বা সংস্কার না থাকায় বর্ণস্ফোট স্বীকারও অনাবশ্যক বলিয়া বাচস্পতি মিশ্র মনে করেন।

আমাদের বিবেচনায়—যাহার উচ্চারণে কোন অর্থের প্রতীতি হয়, তাদৃশ ধ্বনির স্ফোট সংজ্ঞা স্বীকার করিতে আপত্তি করার কোন কারণ নাই। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণগুলির স্মৃতি বা সংস্কারের সহিত অন্ত্যবর্ণের প্রতীতি যে সর্ব্বত্রই স্ফোটে থাকিবে, এইরূপ নিয়মকেও আমরা বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকার কবিতে পারি না। একটিমাত্র বর্ণের উচ্চারণে যখন কোন অর্থের প্রতীতি হয়, তখন উল্লিখিত নিয়ম কার্য্যকরী হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উক্ত নিয়মটি বর্ণস্ফোট-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য স্ফোটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা স্ফোটের মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ স্বীকার করি, তাহা পরে প্রদর্শন করিব।

নিজ মত

নৈয়ায়িক প্রবর ৺গোপীনাথ তর্কাচার্য্য কাতন্ত্র পরিশিষ্টের [ সন্ধিপ্রকরণ, ১০৬ সংখ্যক ( চিতীবার্থে ) সূত্রের ] ব্যাখ্যায় স্ফোটবাদ সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন। স্ফোটবাদের বিপক্ষে তাঁহার প্রদর্শিত নিম্নলিখিত যুক্তিদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

গোপীনাথ তর্কাচার্য্য

(১) 'গৌঃ' পদটির উচ্চারণের পর বর্ণ ভিন্ন আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না। যদি স্ফোট থাকিত, তাহা হইলে স্ফোটেরও উপলব্ধি হইত। অতএব উপলব্ধির অভাবহেতু শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম প্রভৃতির ন্যায় স্ফোট একটি অবাস্তব কল্পনামাত্র (৬৯)।

**(২)** স্ফোটবাদীরা বলেন—তন্তুরূপ অবয়বের অনুভবের পর যেমন পটরূপ অবয়বীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তেমনি পদান্তর্গত বর্ণরূপ প্রত্যেকটি অবয়বের

---

(৬৯) নন্বু গৌরিত্যুচ্চারণানন্তরং বর্ণব্যতিরিক্তমপরং ন কিঞ্চিদুপলভামহে, বর্ণা এব কেবলং প্রতিপাদ্যন্তে। ততশ্চানুপলভ্যমানত্বাৎ স্ফোটরূপং নাম নাস্ত্যেবেতি শশশৃঙ্গবদিতি; তদুক্তম্—

"শপথৈরপি নাদেয়ং বচনং স্ফোটবাদিনাম্।
নভঃকুসুমমস্তীতি কোঽভিদধ্যাৎ সচেতনঃ ॥" ইতি

—কাতন্ত্রপরিশিষ্ট ( সন্ধিসূত্র ১০৬ )

অনুভবের পর স্ফোটরূপ অবয়বীর উপলব্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্ফোটবাদীদের এই যুক্তি ঠিক নহে ; কারণ, কোন পদ বা পদার্থ-জ্ঞানের সময়ে "এই পদ বা পদার্থটি অমুক অমুক বর্ণবিশিষ্ট" এইরূপ জ্ঞান হয় না। সুতরাং বর্ণ ও স্ফোটের মধ্যে অবয়ব-অবয়বি-সম্বন্ধ কল্পনা অযৌক্তিক। বর্ণসমূহ মিলিয়া একটি শব্দের সৃষ্টি হয় এবং সেই শব্দ হইতে অর্থবোধ হইয়া থাকে। অতএব, যদি স্ফোটের সঙ্গে কাহারও অবয়ব-অবয়বি-ভাব-সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে শব্দ এবং স্ফোটের মধ্যেই তাহা করা উচিত। অর্থাৎ ঐরূপ যুক্তি দেখাইতে হইলে শব্দকে অবয়ব এবং স্ফোটকে অবয়বী বলিতে হয়। কিন্তু শব্দ ও স্ফোটের মধ্যে এইরূপ অবয়ব-অবয়বি-ভাব অনুভব-বিরুদ্ধ। অতএব স্ফোট বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই (৭০)।

এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তর্কাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিয়তব্যূহ ( পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে বর্ণগুলির অবস্থিতি ) ই অর্থের প্রতিপাদক। সুতরাং তাঁহার মতে স্ফোট-স্বীকার অনাবশ্যক (৭১)। নিয়তব্যূহ বলিতে তর্কাচার্য্য মহাশয় বর্ণগুলির সমূহাত্মক জ্ঞানকে বুঝিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, পদের অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকায় অন্ত্যবর্ণ-জ্ঞান-সময়ে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বর্ণের স্মৃতি থাকা সম্ভব নহে ; তাঁহাদের বিপক্ষে তর্কাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তি এই যে, একপদগঠকত্ব হেতু পদের অন্তর্গত বর্ণগুলিরও একটা সম্বন্ধ আছে (৭২)।

বস্তুতঃ, সম্যগ্‌রূপে বিশ্লেষণ করিলে স্ফোটবাদীদের মত হইতে গোপীনাথ তর্কাচার্য্যের মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। গোপীনাথ তর্কাচার্য্য নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণকালে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের একটি সংস্কার থাকে ; এবং এই সংস্কারজনিত স্মৃতির ফলে অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণকালে তাহার সহিত

আলোচনা

---

(৭০) তস্মাদ্ যথা তন্তুমনুভবানন্তরমবয়বী প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ পটস্তদ্বৎ সকলবর্ণানুভবানন্তরমনুভূয়মানঃ স্ফোটঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ একোঽবয়বী বর্ণাভিব্যঙ্গ্য ইতি স্ফোটবাদিনঃ। তদযুক্তং, বর্ণবদপ্রতিভাসমানত্বাৎ। যদি স্ফোটোঽস্থাস্যৎ তদা শব্দবদুপলম্ভোঽপ্যভবিষ্যৎ, অর্থপ্রতীতেরন্যথাসম্ভবাচ্চ। —কাতন্ত্রপরিশিষ্ট ( সন্ধিসূত্র—১০৬ )।

(৭১) অতঃ শব্দং প্রতি নিয়তব্যূহ এবার্থপ্রত্যায়ক ইতি নাতিরিক্তোঽনুভববিরোধী কশ্চন স্ফোটনামা কাল্পনিকোঽঙ্গীক্রিয়ত ইতি। —ঐ

(৭২) ন চান্ত্যবর্ণজ্ঞানসময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ণানাং কথং স্মৃতিরসম্বন্ধাৎ, ন হ্যমীষাং কশ্চিদিহ সম্বন্ধোঽনুভূয়তে ইতি বাচ্যম্, একপদনিবন্ধনস্য বর্ণানাং সম্বন্ধস্যাবগমাদিতি। —ঐ

পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণসমূহের একটি স্মৃতিজ্ঞানবিশিষ্ট সমূহাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমূহাত্মক জ্ঞানই অর্থবোধের হেতু (৭৩)। স্ফোটবাদীরাও বলিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণোচ্চারণের স্মৃতিবিশিষ্ট অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ অর্থ প্রতিপাদন করে; সুতরাং তাঁহারাও এইরূপ সমূহাত্মক জ্ঞানকে অস্বীকার করেন নাই। অতএব, স্ফোটবাদীদের সহিত গোপীনাথ তর্কাচার্য্যের এই বিবাদকে "কেবলং নামমাত্রে বিবাদঃ" বলা যাইতে পারে।

মনের অতিশয় সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহাদ্বারা এককালে জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি এবং জীবাত্মার অতিশয় সূক্ষ্মত্বহেতু তাহাতে জ্ঞানদ্বয়ের সহাবস্থান কোনটিই সম্ভব নহে বলিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মৃতি এবং অনুভূতি দুইটি পৃথক্ জ্ঞান; অতএব, এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতি এবং পরবর্ণের অনুভব এই উভয়ের সহাবস্থান কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব—একটি বৃক্ষ দেখিবার সময়ে যেমন আমরা উহার এক একটি অংশ ক্রমেই উহাকে অবলোকন করিয়া থাকি, অথচ বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ অবলোকনের পর আমাদের অন্তরে এককালে সমগ্র বৃক্ষটির জ্ঞান জন্মে, শব্দোচ্চারণেও তেমনি শব্দস্থিত প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণের পর সমগ্র শব্দটিরই একটি অখণ্ড জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এইরূপ সমূহাত্মক জ্ঞানটি অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণকালে একদাই উৎপন্ন হয়। তখন আর পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতি ও পরবর্ণের অনুভূতিকে পৃথগ্ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কারণেই স্ফোটবাদী বৈয়াকরণগণ এইরূপ অখণ্ড উচ্চারণ এবং তজ্জনিত অখণ্ড জ্ঞানকে স্ফোটনামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ স্ফোটাত্মক শব্দের জ্ঞানকালে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের কোন জ্ঞান থাকে না; তথাপি যে পূর্ব্ববর্ণের স্মৃতির সহিত পরবর্ণের অনুভবের কথা বলা হয়, ইহা শুধু বুঝিবার সুবিধার জন্য।

উল্লিখিত দ্বিতীয় (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণ-স্মৃতিসংবলিত চরম বর্ণের উচ্চারণই স্ফোট) মতের সমর্থকদের আর একটি প্রধান যুক্তি এই যে, একই বর্ণসমষ্টিদ্বারা গঠিত বিভিন্ন শব্দে যখন গঠক বর্ণগুলির উচ্চারণক্রমে পার্থক্য থাকে, তখন তাহাদের অর্থের মধ্যেও বিপুল পার্থক্য থাকিয়া যায়। র্, অ, ম্, আ এই চারিটি বর্ণদ্বারা

আনুপূর্ব্বী

(৭৩) পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণকৃতাতিশয়োঽন্ত্যবর্ণেন সহ সঙ্গচ্ছতে। অতিশয়শ্চ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণানুভবজনিতসংস্কারঃ। তথা চান্ত্যবর্ণ-জ্ঞানসময়ে স্মৃতিজ্ঞানবিশিষ্টং সমূহজ্ঞানমুৎপদ্যতেঽন্ত্য-বর্ণগ্রহণকালে ভূতবর্ণানামনুসন্ধানাৎ। —ঐ।

যেমন রমাশব্দ উচ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি তাহাদের মধ্যে একটু ক্রমবিপর্য্যয় করিয়া অ এর স্থানে আ এবং আ এর স্থানে অ কে উচ্চারণ করিলে রামশব্দ উচ্চারিত হয়। রমা বলিতে একটি মেয়েকে বুঝায়; কিন্তু রাম বলিতে বুঝায় একটি ছেলেকে। রমা বলিতে আমরা বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীকে এবং রাম বলিতে দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপী নারায়ণের অবতারকেও বুঝিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায়ই উল্লিখিত শব্দ দুইটি পৃথক্ থাকিয়া পৃথক্ অর্থই বুঝাইয়া থাকে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, শব্দের গঠক বর্ণগুলি সমান হইলেও তাহাদের উচ্চারণের ক্রমভেদে শব্দ ও অর্থের বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণ-স্মৃতি-সংবলিত চরম বর্ণের উচ্চারণকে স্ফোট বলিলে আর রাম শব্দে রমাকে বা রমাশব্দে রামকে বুঝাইবার প্রশ্ন উঠে না। এইরূপ স্ফোটলক্ষণ স্বীকার করিলে রাম এবং রমা দুইটি পৃথক্ শব্দরূপেই গৃহীত হয় এবং তাহাদের অর্থেও পার্থক্য থাকার পক্ষে আর কোন অন্তরায় থাকে না। এই যুক্তিগুলি মন্দ নহে।

কিন্তু যাঁহারা মধ্যমা-নাদব্যঙ্গ্য শব্দকে স্ফোটনামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও তো রাম ও রমা এই উভয়কে এক শব্দ বলেন নাই। তাঁহারাও অর্থপ্রতিপাদনসমর্থ বর্ণসমষ্টিরই শব্দত্ব স্বীকার করিয়া তাদৃশ শব্দেরই অবস্থা-বিশেষকে স্ফোট নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতেও রাম শব্দ হইতে রমা শব্দ ভিন্ন; কারণ রাম শব্দের উচ্চারণ হইতে রমা শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন প্রকারের। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যতঃ উভয় পক্ষই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণ-স্মৃতি-সংবলিত চরম বর্ণের উচ্চারণের ফলে যখন কোন অর্থের উপলব্ধি হয়, কেবলমাত্র তখনই তাদৃশ শব্দের স্ফোটত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে উভয় পক্ষের মতের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই বটে; কিন্তু অন্য দিকে চিন্তা করিলে উভয় মতের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। এক পক্ষ উচ্চারণেরই স্ফোটত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু অপর পক্ষের মতে, উচ্চারণের পূর্ব্বাবস্থাই স্ফোট সংজ্ঞা লাভ করে। মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য শব্দ যে পরশ্রবণগোচর হয় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। যাঁহারা মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য শব্দের স্ফোটত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে, শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাই স্ফোট নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের অর্থ-প্রতিপাদন-সামর্থ্য না থাকায় তাহার স্ফোট সংজ্ঞা স্বীকার করিলে 'স্ফুটত্যর্থোঽস্মাৎ' এই

আলোচনা

ব্যুৎপত্তি ব্যর্থ হয়। সম্ভবতঃ, এই কথা চিন্তা করিয়াই অন্যেরা যুগপৎ মধ্যমা ও বৈখরী নাদের দ্বারা শব্দের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, উচ্চারণের সময়ে আমরা শব্দের যে রূপ অনুভব করি, তাহা কেবলমাত্র বৈখরী-নাদব্যঙ্গ্য। মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য শব্দ মানুষের মুখের বাহিরে আসিতে পারে না, এবং ফলে তাহার অর্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যও থাকে না। বৈখরী নাদের সঙ্গে মধ্যমানাদের সংযোগ কল্পনা করিলে, তাহাদের সঙ্গে পশ্যন্তীবাকের এবং তাহাদের সকলের সঙ্গে পরা বাকেরও সংযোগ কল্পনার বিষয় উপজাত হয়। আমরা এরূপ সংযোগ-স্বীকারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে ব্রহ্মকাণ্ডের ৮৫ সংখ্যক শ্লোকে (৭৪) এবং টীকাকার পুণ্যরাজ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্ফোট-নিরূপণ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বপূর্ব্ব-বর্ণোচ্চারণ-স্মৃতি-সংবলিত চরম-বর্ণের অস্তিত্ব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন (৭৫)। সুতরাং ভর্ত্তৃহরির স্বীকৃত মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক শব্দ যে অর্থপ্রতিপাদন-সমর্থ এবং অপর পক্ষের প্রদত্ত লক্ষণের দ্বারাও লক্ষিত, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমরা যে স্ফোটাত্মক শব্দকে মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য মনে করি না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, স্ফোটের স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে যে দুইটি মত দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নাই; এবং উভয় মতের সমন্বয়-সাধন সম্ভব। কিন্তু এই দুইটি পক্ষ ছাড়া তৃতীয় আর একটি পক্ষ আছে, যাহার মতে অর্থেরই স্ফোট সংজ্ঞা হয়। এই মতেই 'স্ফুট্যতে যঃ সঃ স্ফোটঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে। ইঁহারা মনে করেন, শব্দের উচ্চারণের ফলে অর্থ প্রকাশিত হয়, অতএব অর্থই স্ফোট। এই বিষয়ে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্ফোট পদটির বুৎপত্তির উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।

---

(৭৪) নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ।
আবৃত্তিপরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্য্যতে ॥ —ব্রহ্মকাণ্ড, শ্লোক-৮৫ ॥

(৭৫) নাদৈর্নিভির্বীজং ব্যক্তপরিচ্ছেদানুগুণসংস্কারঃ ততশ্চান্ত্যো ধ্বনিঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সংস্কারসহকৃতায়ামাবৃত্তিপ্রাপ্তযোগ্যতাপরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দস্বরূপং সন্নিবেশয়তি।
—ঐ, পুণ্যরাজটীকা।

"অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ ॥৩।৩।১৯॥" এই পাণিনির সূত্র অনুসারে আমরা কর্ম্মবাচ্যে বা অপাদানবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া স্ফোট পদটি সাধিতে পারি। আবার "ভাবে ॥৩।৩।১৮॥" এই পাণিনির সূত্র অনুসারে ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়াও পদটি সাধন করা যাইতে পারে।

স্ফোট শব্দের ব্যুৎপত্তি

নাগেশভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপাদানবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া স্ফোটশব্দের সাধন করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—"স্ফুটত্যর্থো-ঽস্মাদিতি স্ফোটঃ"। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে অর্থপ্রতিপাদন-সমর্থ-শব্দেরই স্ফোট সংজ্ঞা হয়। আবার কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া "স্ফুট্যতে (প্রকাশ্যতে) যঃ স স্ফোটঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিলে শব্দ এবং অর্থ উভয়েরই স্ফোটসংজ্ঞা হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া "স্ফোটনং স্ফোটঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিলেও শব্দের প্রকাশ বা উচ্চারণের যেমন স্ফোটসংজ্ঞা হইতে পারে, অর্থের প্রকাশ বা উপলব্ধিরও তেমনি স্ফোটসংজ্ঞা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাতন্ত্রপরিশিষ্টের ব্যাখ্যাকার মহাত্মা গোপীনাথ তর্কাচার্য্য অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়াও স্ফোটশব্দ সাধন করা যাইতে পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (৭৬)। এই মতটি স্বীকার করিলে "স্ফুট্যতে (প্রকাশ্যতে) (অর্থঃ) অস্মিন্" এইরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা শব্দকেই বুঝা যায়।

স্ফোট-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য্যগণ সকলেই শব্দের উৎপত্তি-প্রকার এবং তাহার ক্রমভেদ অবলম্বনে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই এই প্রসঙ্গে অর্থের ক্রমভেদাদি সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। সুতরাং নিঃসন্দেহেই বুঝা যায় যে, শব্দের প্রকারবিশেষের স্ফোটসংজ্ঞাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। মধ্যমানাদের বা মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য সূক্ষ্ম-শব্দের পক্ষে যে অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নহে, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং শব্দের স্বরূপ বা উচ্চারণের মধ্যে যতই বিভাগ কল্পনা করা হউক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার স্ফোটসংজ্ঞা হইবে না। যে স্থলে একটিমাত্র বর্ণের উচ্চারণই অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থ, সেখানে একটি বর্ণেরও স্ফোটসংজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে

(৭৬) স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিত্যপাদানে ঘঞ্, 'ব্যঞ্জনাচ্চ' ইত্যধিকরণে বা।

—কাতন্ত্রপরিশিষ্ট, সন্ধিপ্রকরণ; ১০৬ (চিতীবার্থে) সূত্রের ব্যাখ্যা।

যতটি বর্ণ উচ্চারিত হইলে পর অর্থের প্রতীতি হইবে, ততটি বর্ণের উচ্চারণ-সমষ্টিই একযোগে স্ফোটসংজ্ঞা লাভ করিবে। নিরর্থক ভেরীনাদ প্রভৃতি শব্দের অর্থপ্রতিপাদন-ক্ষমতা না থাকায় তাহাদের স্ফোটসংজ্ঞা হইবে না।

স্ফোটবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার স্ফোটের মধ্যে কয়েকটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। বৈয়াকরণাচার্য্য ভট্টজি দীক্ষিত তাঁহার রচিত "বৃহদ্-বৈয়াকরণ-ভূষণ" নামক কারিকাময় গ্রন্থে অষ্ট প্রকার স্ফোটের উল্লেখ-ক্রমে ইহাদের সমর্থনে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ কৌণ্ডভট্ট পিতৃব্যের বিরচিত কারিকাগুলির একখানা উত্তম ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "পদার্থদীপিকা" নামক উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট বহু বিচারের সাহায্যে স্ফোটের অষ্টপ্রকারতাই সমর্থন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট তাঁহার রচিত "বৈয়াকরণ-ভূষণসার" নামক গ্রন্থেও স্ফোটের অষ্টপ্রকারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার সমর্থনে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্ফোটের বিভাগ

উল্লিখিত আচার্য্যগণ বলেন—বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট ও বাক্যস্ফোট ভেদে প্রথমতঃ স্ফোটাত্মক শব্দগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। উক্ত তিনটির প্রত্যেকটিকে আবার ব্যক্তিস্ফোট ও জাতিস্ফোটভেদে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। এই ছয়টির সহিত অখণ্ড পদস্ফোট এবং অখণ্ড বাক্যস্ফোট নামক স্ফোটের বিভাগদ্বয়কে যোগ করিলে স্ফোটাত্মক শব্দগুলি মোট ৮টি বিভাগে বিভক্ত হয়। মহামতি নাগেশও তাঁহার স্ফোটবাদ নামক গ্রন্থে এইভাবেই স্ফোটের অষ্টবিধত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন (৭৭)।

বর্ণস্ফোট

সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণই সার্থক। একাক্ষরকোষ প্রভৃতি অভিধানে প্রতিটি বর্ণের অর্থও প্রদর্শিত আছে। কোন ব্যক্তি যখন অ, আ প্রভৃতি স্বর বা ক, খ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের যে কোন একটিকে উচ্চারণ করে, তখন এই একটিমাত্র বর্ণের উচ্চারণকে বর্ণস্ফোট বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারিত বর্ণবিশেষের উচ্চারণকে বর্ণব্যক্তি-স্ফোট এবং বিভিন্নব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে একই বর্ণের উচ্চারণগুলিকে সমষ্টিগত ভাবে বর্ণজাতিস্ফোট বলা হইয়া থাকে। উল্লিখিত নিয়মে

---

(৭৭) ননু কঃ স্ফোটো নামেতি চেৎ ; শৃণু—(১) বর্ণস্ফোটঃ (২) পদস্ফোটঃ, (৩) বাক্যস্ফোটঃ (৪-৫) অখণ্ড-পদবাক্যস্ফোটঃ ; (৬-৮) বর্ণপদবাক্যভেদেন ত্রয়ো জাতিস্ফোটা ইতি বৈয়াকরণসিদ্ধান্তঃ। —স্ফোটবাদঃ, পৃষ্ঠা—১ ॥

ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারিত পদবিশেষের উচ্চারণকে পদব্যক্তিস্ফোট এবং বিভিন্ন লোকের উচ্চারিত একই পদের বিভিন্ন উচ্চারণের সমষ্টিকে পদজাতিস্ফোট বলা হয়। বাক্যস্ফোটের বেলাও এই নিয়ম।

পদস্ফোট

কোন কোন সময়ে দুই বা ততোধিক পদ সমাসবদ্ধ হইয়া একটিমাত্র পদে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাদের উচ্চারণকালে সমাসমধ্যগত প্রত্যেকটি পদের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ না হইয়া এক সঙ্গে সম্পূর্ণ যৌগিক পদটিরই উচ্চারণ হয়; এই কারণে আচার্য্যেরা ঈদৃশ পদের উচ্চারণকে অখণ্ড-পদস্ফোট বলিয়া থাকেন। যৌগিক বা মিশ্র বাক্যগুলিতে বিভিন্ন ক্ষুদ্রবাক্যসমূহ মিলিত হইয়া একসঙ্গে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এই কারণে আচার্য্যেরা ঈদৃশ মিশ্র বা যৌগিক বাক্যের উচ্চারণকে অখণ্ড-বাক্যস্ফোট নামে অভিহিত করেন। কখন কখন একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধও এইরূপ অখণ্ড-বাক্যস্ফোট নামে অভিহিত হইতে পারে। বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা সম্ভবতঃ এই কথা ভাবিয়াই বাক্যসমষ্টিকে মহাবাক্য নামে অভিহিত করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ প্রভৃতি বিশাল গ্রন্থগুলিকে মহাবাক্যের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাক্যস্ফোট

অখণ্ড-পদস্ফোট

অখণ্ড-বাক্যস্ফোট

অখণ্ড-স্ফোটের সমর্থনে আচার্য্য নাগেশ তাঁহার স্ফোটবাদ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—কতকগুলি বর্ণের সমষ্টিকে একটি পদ এবং কয়েকটি পদের সমষ্টিকে একটি বাক্য বলা হয়। ঘট, পট প্রভৃতি এক একটি পদ, এবং 'ঘটটি লইয়া আস' 'পটটি লইয়া আস' প্রভৃতি এক একটি বাক্য। এই সকল স্থলে কখনও সমগ্র পদ এবং কখনও সমগ্র বাক্য হইতেই অর্থবোধ হওয়ায় অখণ্ড-পদস্ফোট এবং অখণ্ড-বাক্যস্ফোট অবশ্য স্বীকার্য্য (৭৮)।

নাগেশের যুক্তি

বস্তুতঃ নাগেশ ভট্টের এই যুক্তি কেবলমাত্র পদস্ফোট এবং বাক্যস্ফোট স্বীকারের জন্যই প্রযোজ্য; অখণ্ড স্ফোটের জন্য নহে। নাগেশ ভট্ট উল্লিখিত গ্রন্থের আরম্ভেই স্ফোটের ক্রমভেদ প্রদর্শন প্রসঙ্গে পদস্ফোট ও বাক্যস্ফোট

---

(৭৮) বর্ণমালায়াম্ 'একং পদম্', 'একং চ বাক্যম্' ইত্যাদি প্রতীতেঃ 'তদেবেদং পটপদং, তদেবেদং ঘটমানয়েতি বাক্যম্' ইত্যাদি প্রতীতেশ্চ বর্ণাতিরিক্তমেকমখণ্ডং প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-বিভাগ-রহিতং পদং বাক্যং চ বর্ণব্যঙ্গমবশ্যং স্বীকার্য্যম্। —স্ফোটবাদ, পৃষ্ঠা ৭০—৭১ ॥

হইতে অখণ্ড-পদস্ফোট এবং অখণ্ড-বাক্যস্ফোটকে পৃথগ্‌ভাবে গণনা করিয়াছেন। পট, ঘট প্রভৃতিকে অখণ্ডপ-দস্ফোট বলিলে সাধারণ পদস্ফোট কোথায় হইবে? এইভাবে 'ঘটমানয়', 'পটং নয়' প্রভৃতিকে অখণ্ড-বাক্যস্ফোট বলিলে সাধারণ বাক্যস্ফোটের উদাহরণও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বিভক্তিহীন ঘট, পট প্রভৃতি শব্দের সাধারণ পদস্ফোট সংজ্ঞা হইবে—একথাও বলা চলে না; কারণ বিভক্তিহীন প্রাতিপদিকের পদসংজ্ঞাই হয় না। মহর্ষি পাণিনি "সুপ্‌তিঙন্তং পদম্‌" সূত্রটিদ্বারা এই কথাই জানাইয়াছেন। আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মাও কলাপ-ব্যাকরণে "পূর্ব্বপরয়োরর্থোপলব্ধৌ পদম্‌" সূত্রটিদ্বারা দৃঢ়ভাবে ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। যদিও "স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে" সূত্রটিদ্বারা মহর্ষি পাণিনি স্থলবিশেষে বিভক্তিহীন প্রাতিপদিকেরও পদসংজ্ঞা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তাদৃশ স্বীকৃতি যে কেবলমাত্র পদসাধনের সুবিধার জন্যই স্থান-পরিগ্রহ করিয়াছে; অন্য কোন কারণে নহে—ব্যাখ্যাকারগণ স্পষ্ট ভাষায়ই এই কথা বলিয়াছেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আমরা সমাসবদ্ধ পদকে অখণ্ড-পদস্ফোটের এবং যৌগিক ও মিশ্র বাক্যগুলিকে অখণ্ড-বাক্যস্ফোটের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিলাম।

নৈয়ায়িকেরা যদিও স্থলবিশেষে বিভক্তিহীন শব্দেরও পদত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তথাপি "বৃত্তিমত্ত্বং পদত্বম্‌" এইরূপ পদের লক্ষণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৃত্তি বা অর্থপ্রতিপাদন-সামর্থ্য না থাকিলে তাদৃশ শব্দের পদত্ব হইবে না। অর্থপ্রতিপাদনসামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র বিভক্তিযুক্ত শব্দেই থাকে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে—গো, অশ্ব প্রভৃতি এক একটি শব্দ বিভক্তিহীন অবস্থায় উচ্চারিত হইলেও তো শ্রোতার অন্তরে এক একটি জন্তুর জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে; সুতরাং বিভক্তিহীন সার্থক শব্দের পদত্ব স্বীকার করিব না কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিব—বিভক্তিহীন গো প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে শ্রোতার অন্তরে একটি অস্পষ্ট জ্ঞানমাত্র জন্মিয়া থাকে; বিভক্তিযুক্ত হইলেই তাদৃশ শব্দ পূর্ণজ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ। এই বিষয়ে সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ বলিয়া আমরা অনুভব করি। নৈয়ায়িকেরা যদি বিভক্তিহীন শব্দেরও পদত্ব স্বীকার করিতে চান, তাহা হইলে করিতে পারেন; কিন্তু আমরা উহা অনুভব

করি না বলিয়া তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিব না। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা আমাদের অনুভবেরই কথা।

একটিমাত্র বর্ণও যে অনেক সময়ে সার্থক হয়, মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার বার্ত্তিকে এই কথা বলিয়াছেন (৭৯)। মহর্ষি পতঞ্জলি উক্ত বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় উদাহরণদ্বারা ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ই প্রভৃতি ধাতু, অ প্রভৃতি প্রাতিপদিক, ঐ প্রভৃতি বিভক্তি, অ প্রভৃতি প্রত্যয়, অ, ই, উ প্রভৃতি নিপাত—ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইতে সমর্থ। এই সকল কথা মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে স্পষ্টভাষায়ই বলিয়াছেন (৮০)। সুতরাং কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ বর্ণস্ফোট স্বীকার করিতেন বলিয়াই মনে হয়।

বর্ণস্ফোটের সমর্থক

যখন কয়েকটি বর্ণ মিলিয়া এক একটি পদ গঠিত হয়, তখন ঐ পদের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না—এই যুক্তিতে স্ফোটবাদিগণ পদস্ফোটও স্বীকার করেন। পদস্ফোটের সমর্থনে আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট তাঁহার পদার্থদীপিকা নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

অর্থবোধের অনুকূল শক্তি বর্ণসমষ্টিতেই থাকে; বর্ণসমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণে নহে। প্রতিবর্ণে শক্তি স্বীকার করিলে ধনং, বনং প্রভৃতি পদে ন্ লোপের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। ধন বা বন শব্দের অন্তর্গত ন্ এর যদি পৃথক্ অর্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্থবত্তা-নিবন্ধন প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইবে; এবং প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইলে "নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য" এই পাণিনিসূত্র অনুসারে ন্ এর লোপ হইয়া যাইবে। এইরূপ অনর্থ নিবারণের জন্য বর্ণসমষ্টির

পদস্ফোট ও কৌণ্ডভট্ট

(৭৯) অর্থবন্তো বর্ণাঃ, ধাতু-প্রাতিপদিক-প্রত্যয়-নিপাতানামেকবর্ণানামর্থদর্শনাৎ।

—বার্ত্তিক।

(৮০) অর্থবন্তো বর্ণাঃ। কুতঃ ? ধাতুপ্রাতিপদিক-প্রত্যয়-নিপাতানামেকবর্ণানামর্থদর্শনাৎ। ধাতব একবর্ণা অর্থবন্তো দৃশ্যন্তে—এতি, অধ্যেতি, অধীতে ইতি। প্রাতিপদিকান্যেকবর্ণান্যর্থবন্তি—আভ্যাম্, এভিঃ, এষু। প্রত্যয়া একবর্ণা অর্থবন্তঃ। নিপাতা একবর্ণা অর্থবন্তঃ—অ অপেহি, ই ইন্দ্রং পশ্য, উ উত্তিষ্ঠ, অ অপক্রাম।

—পাতঞ্জল-মহাভাষ্য (কাশীরাজরাজেশ্বরী যন্ত্র); পৃষ্ঠা—৮৪—৮৫॥

অর্থবোধকতা স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপে সমগ্র পদেরই অর্থবত্তানিবন্ধন পদস্ফোটও অবশ্য স্বীকার্য্য (৮১)।

বাক্যস্ফোটের অনুকূল যুক্তি এই যে, বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থ হইতে সমগ্র বাক্যার্থটি ভিন্ন। 'রাম বনে যাইতেছে' বলিলে রাম নামক ব্যক্তিনিষ্ঠ বনগমনরূপ ক্রিয়া বুঝায়; উক্ত বাক্যস্থিত প্রতিটি পদের অর্থ হইতে এই বাক্যার্থটি ভিন্ন। সমগ্র বাক্যটিই এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া বাক্যস্ফোটও অবশ্য স্বীকার্য্য। বাক্যস্ফোটের সমর্থনে আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট পদার্থদীপিকা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মীমাংসকেরা যদি বলেন, অর্থ-প্রতিপাদনশক্তি পদার্থাংশে জ্ঞাত এবং অন্বয়াংশে অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে আমরাও বলিব—পদের শক্তি জ্ঞাত এবং বাক্যের শক্তি অজ্ঞাত থাকে (৮২)। এইভাবে স্ফোটবাদবিরোধী মীমাংসকদিগকে কটাক্ষ করিয়া আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট বাক্য-স্ফোট সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য্য নাগেশও তাঁহার 'স্ফোটবাদ' নামক গ্রন্থে বাক্যস্ফোটের সমর্থনে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

বাক্যস্ফোটের সমর্থন

আচার্য্য নাগেশ বলেন—'হরেঽব', 'বিষ্ণোঽব' প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণ কালে সন্ধি পৃথক্ না করিয়াই শ্রোতারা ঐ সকল বাক্যের অর্থ বুঝিয়া থাকেন। সন্ধি সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞানই নাই, তাদৃশ ব্যক্তিকেও উল্লিখিত বাক্যগুলির অর্থ বুঝিতে দেখা যায়। আবার উল্লিখিত বাক্যগুলির অর্থবোধের সময়ে প্রতিটি পদের কোন পৃথক্ অর্থও উপলব্ধ হয় না; কেবলমাত্র সমগ্র বাক্যটিরই অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব, পদাতিরিক্ত বাক্যস্ফোট স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক (৮৩)।

নাগেশ

---

(৮১) অয়মভিপ্রায়ঃ—অর্থবোধানুকূলা শক্তির্বর্ণসমূহে এব ন প্রত্যেকম্। তথা সতি ধনং বনমিত্যাদৌ ন্লোপাপত্তেঃ। প্রত্যেকং বর্ণানামর্থবত্ত্বেন প্রাতিপদিকত্বে সিদ্ধে 'ন্লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য' ইতি নস্য তদন্তপদত্বাৎ। তথা প্রত্যেকং সুবুৎপত্তৌ শ্রবণাপত্তিঃ। কিং চ প্রত্যেকং শক্তিমত্ত্বে প্রত্যেকং বর্ণাদর্থবোধাপত্তিঃ। সর্ব্বেষাং বাচকশক্তিমত্ত্বাৎ।

—পদার্থদীপিকা ( ৬৪ তম কারিকার ব্যাখ্যা )।

(৮২) যদি চান্বিতে শক্তিঃ পরং চান্বয়াংশে সৈবাজ্ঞাতা পদার্থাংশে চ সৈব জ্ঞাতোপযুজ্যতে ইতি কুব্জশক্তিবাদ ইত্যভ্যুপগমস্তর্হ্যস্মাকমপি বাক্যশক্তিরজ্ঞাতা পদশক্তিস্তু জ্ঞাতৈব তথেতি।

—পদার্থদীপিকা ( ৬৬ তম কারিকার ব্যাখ্যা )।

(৮৩) 'হরেঽব', 'বিষ্ণোঽব' ইত্যাদৌ প্রাগুক্তরীত্যা পদয়োঃ স্পষ্টমজ্ঞানেঽপি সমুদায়শক্ত্যা

মহামতি কৃষ্ণমাচার্য্যও সুবোধিনী টীকায় নাগেশ ভট্টের উল্লিখিত অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন (৮৪)। বাক্যস্ফোটের সমর্থনে যুক্তি দেখাইতে গিয়া কৃষ্ণমাচার্য্য বলিয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ-জ্ঞানরহিতা কোন গৃহিণীও "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" এইরূপ বাক্যের অর্থ বুঝিয়া মাণবককে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিবার সময় গৃহিণী পৃথক্ পৃথক্ পদের অর্থ বুঝেন না; কিন্তু সমগ্র বাক্যের অর্থটিকেই একসঙ্গে বুঝিয়া থাকেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাক্যস্ফোট স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক (৮৫)।

কৃষ্ণমাচার্য্য

আমাদের বিবেচনায় নাগেশ ভট্টের এই যুক্তিটি ভাল হয় নাই। বস্তুতঃ 'হরেঽব' 'বিষ্ণোঽব' প্রভৃতি বাক্যে লুপ্ত অকারের আংশিক উচ্চারণের ফলেই সম্বোধনপদ এবং ক্রিয়াপদ উভয়ের অর্থ প্রতীত হয় বলিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি। লুপ্ত অকারের উচ্চারণ যদি একেবারেই না করা হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পদযুগলের অর্থবোধ করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে।

আলোচনা

মহাত্মা কৃষ্ণমাচার্য্যের যুক্তিটিও আমাদের মনঃপূত হইতেছে না। সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ-জ্ঞানহীনা কোন নারী 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' কথাটি শুনিয়া ইহার অর্থ বুঝিয়াই ভিক্ষা দেন কি না—ইহা বিবেচ্য। কোন বোবা ভিক্ষুক যখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়, তখনও তো গৃহস্থপত্নী কোনরূপ শব্দোচ্চারণ না শুনিয়াও তাহার বেশভূষা এবং দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। মৌনী সন্ন্যাসীরাও যে কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ না করা সত্ত্বেও ভিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব, আমার বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মচারীর বেশভূষা

---

বোধাৎ সমুদায়স্যৈব বিশিষ্টবাক্যার্থে শক্তিরিতি বাক্যস্ফোটঃ।

—স্ফোটবাদ (আড্যার লাইব্রেরী), পৃষ্ঠা—১০॥

(৮৪) যো হি ব্যাকরণ-ব্যুৎপত্তিরহিতঃ সোঽপি 'হরেঽব' ইতি বাক্যস্য হরিকর্তৃকাবনমর্থং জানাতি। পরং তু হরে ইত্যস্য হরিরর্থঃ, অবেতি পদস্যাবনমর্থ ইতি ন জানাতি, অবেতি পদচ্ছেদ-জ্ঞানস্যৈবাভাবাৎ।—সুবোধিনী টীকা (স্ফোটবাদ, আড্যার লাইব্রেরী), পৃষ্ঠা—৩১॥

(৮৫) 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' ইতি বালোচ্চারিতেন বাক্যেন ব্যাকরণজ্ঞানগন্ধশূন্যায়া গৃহিণ্যা ভিক্ষাযাচনরূপবাক্যার্থবোধো ন স্যাৎ। ততশ্চ ভিক্ষাদানে সা ন প্রবর্ত্তেত। অতো ন সর্ব্বত্র বাক্যার্থবোধে পদশক্তিজ্ঞানস্য হেতুত্বমিতি বক্তুং শক্যম্। তস্মাদ্ বাক্যশক্তিরপি স্বীকার্য্যেতি ভাবঃ। —ঐ, পৃষ্ঠা—৩৭॥

এবং ভিক্ষার ঝুলিসহ দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়াই গৃহস্থপত্নী তাহাকে ভিক্ষাপ্রার্থী বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং ইহারই ফলে, সে কোন শব্দ উচ্চারণ করুক বা না করুক তাহাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এই বাক্যের অর্থ বুঝিয়া যে তিনি ভিক্ষা দেন না, তাঁহার পদার্থ-জ্ঞানহীনতাই ইহার প্রমাণ। তবে উল্লিখিত বাক্যান্তর্গত 'ভিক্ষাং' শব্দটি শুনিয়া তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে, সে ভিক্ষা চাহিতেছে। এখানেও কেবলমাত্র ভিক্ষা শব্দটির অর্থ তিনি জানেন বলিয়াই ইহা বুঝিতে পারেন; সুতরাং এই স্থানেও বাক্যার্থ-জ্ঞানের অভাবহেতু তাহার কারণতা-কল্পনার যুক্তিও অনুভববিরুদ্ধ। উল্লিখিত আট প্রকার স্ফোটের মধ্যে একমাত্র বাক্যস্ফোটই বাস্তব এবং অবশিষ্ট সাতটি কাল্পনিক—ইহাই ভট্টজি দীক্ষিত এবং কৌণ্ডভট্ট মনে করেন (৮৬)। ভট্টজিদীক্ষিত এবং কৌণ্ডভট্ট উভয়েই বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বেও স্ফোটের অবান্তর বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

প্রকৃতি ও প্রত্যয় উভয়ে মিলিয়া পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি এবং প্রত্যয় প্রত্যেকেরই সার্থকতা কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি সুপ্রাচীন আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতি এবং প্রত্যয় বস্তুতঃ পদের এক একটি অংশ এবং ইহারা বর্ণাত্মক। সুতরাং পদের বর্ণাত্মক অংশগুলির সার্থকতা স্বীকার করিলে বর্ণস্ফোট দ্বারাই পদার্থের প্রতিপাদন হওয়ায় আর পদস্ফোট স্বীকারের আবশ্যক হয় না। এই কারণে পদস্ফোটের সমর্থক ভট্টজিদীক্ষিত, কৌণ্ডভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রত্যয়ের পৃথক্ অর্থ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয় উভয়ে মিলিয়াই সমগ্র পদার্থের প্রতীতি জন্মায়।

কৌণ্ডভট্ট

মহর্ষি পাণিনি "লঃ কর্ম্মণি" প্রভৃতি সূত্রে লকারের বাচকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন—এই কথা বলিলেও তিপ্ প্রভৃতির বাচকতা স্বীকার্য্য হয় না; কারণ লকার এবং তিপ্ প্রভৃতি এক নহে—এইরূপ একটি মতও আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। (পদার্থ-

---

(৮৬) বাক্যস্ফোটোঽতিনিষ্কর্ষে তিষ্ঠতীতি মতস্থিতিঃ।

সাধুশব্দেঽন্তর্গতা হি বোধকা ন তু তৎস্মৃতাঃ॥—বৃহদ্বৈয়াকরণভূষণম্। কারিকা—৬১॥

যদ্যপি বর্ণস্ফোটঃ পদস্ফোটো বাক্যস্ফোটোঽখণ্ড-পদবাক্যস্ফোটো বর্ণ-পদ-বাক্য-ভেদেন ত্রয়ো জাতিস্ফোটা ইত্যষ্টৌ পক্ষাঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধা ইতি বাক্যগ্রহণমনর্থকং দুরর্থকঞ্চ, তথাপি বাক্যস্ফোটাতিরিক্তানামন্যেষামবাস্তবত্ববোধনায় তদুপাদানম্। অতএব আহ অতিনিষ্কর্ষে ইতি।

—পদার্থদীপিকা ( ঐ ব্যাখ্যা )।

দীপিকা, ৬৪ তম কারিকার ব্যাখ্যা )। কৌণ্ডভট্ট বলেন—বস্তুতঃ লকারদ্বারা তিপ্ প্রভৃতিকেই বুঝানো হইয়াছে এবং এই লকারের অর্থবোধনশক্তি অন্বয় মাত্রে সীমাবদ্ধ। গোশব্দের উচ্চারণমাত্র গরু নামক জন্তুর জ্ঞান হয়। তাহার সঙ্গে বিভক্তির যোগ হইলে কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি সম্বন্ধমাত্র বোধিত হয়। 'গৌর্ধাবতি' বলিলে কর্ত্তৃসম্বন্ধ এবং 'গামানয়' বলিলে কর্ম্মসম্বন্ধ বোধিত হইয়া থাকে। এইরূপে গৌর্ধাবতি বলিলে একটি গরু ধাবিত হইতেছে বুঝায়; কিন্তু 'ধাবতঃ' বা 'ধাবন্তি' বলিলে দুই বা ততোধিক প্রাণী ধাবিত হইতেছে, বুঝ যায়। ইহা দ্বারা ধাবন ক্রিয়ার ভেদ হয় না; কেবলমাত্র তাহার সঙ্গে অন্বিত কর্ত্তার দ্বিত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি প্রতীত হইয়া থাকে। এই যুক্তি মানিয়া লইলে আর সুপ্, তি প্রভৃতির বাচকতা স্বীকার করার আবশ্যক হয় না। তাহাদের বাচকতা স্বীকার করিলেও ইহা সম্বন্ধমাত্রের বাচকতাই হইবে; কোন বস্তুর বাচকতা নহে।

এতদ্ব্যতীত বিভক্তি বা প্রত্যয়ের বাচকতার বিপক্ষে আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট অন্যান্য যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—সু প্রভৃতি বা তিপ্ প্রভৃতি বিভক্তি সংখ্যায় বহু এবং বিভিন্ন ব্যাকরণে বিভিন্নরূপে পঠিত হওয়ায় তাহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং এই সকল বিভক্তির বাচকতা স্বীকার করিলে অনন্তশক্তি-কল্পনা প্রভৃতি দোষ উপজাত হয় (৮৭)।

ভট্টজি দীক্ষিত বলেন—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে যে অর্থবোধ হয়, তাহা বাস্তব নহে; বস্তুতঃ অখণ্ড ( সমগ্র ) পদ এবং অখণ্ড বাক্য হইতেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। পঞ্চকোশাদিবাক্যে যেমন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহায়রূপ অবাস্তব পদার্থকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও তেমনি অখণ্ডপদ বা বাক্যের অর্থবোধের সহায়ক প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতিকেই অর্থের বোধক বলা হইয়াছে (৮৮)।

ভট্টজি

---

(৮৭) অত্র দর্শনান্তরাভিনিবেশিনঃ প্রয়োগসমবায়িনস্তিবাদয়ো ন বাচকাস্তেষাং বহুত্বাদনন্তশক্তিকল্পনাপত্তেঃ। শক্ততাবচ্ছেদকত্বকল্পনাপ্যনেকেষু স্যাদিতি গৌরবং চ। —পদার্থদীপিকা ( ৬২ তম কারিকার ব্যাখ্যা )।

তথা হি রাম ইত্যত্র বিসর্গেণ কিং সিঃ স্মর্ত্তব্যঃ। কিং সুঃ। কিং বা রুঃ। কালাপিনাং সিঃ। আস্মাকীনৈঃ সুঃ। অপরৈশ্চ রুঃ। ...ঐ, ঐ।

(৮৮) পঞ্চকোশাদিবত্তস্মাৎ কল্পনৈষা সমাশ্রিতা॥ ৬৯॥
উপেয়-প্রতিপত্ত্যর্থা উপায়া অব্যবস্থিতাঃ ॥৭০॥—বৃহদ্বৈয়াকরণভূষণম্।

যথা পঞ্চকোশা অপি সর্ব্বাধার-ব্রহ্ম-বোধনায়োক্তাঃ ন তু বাস্তবমেষাং ব্রহ্মত্বং তথৈব প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিভির্বিচারোঽপ্যখণ্ডস্ফোটবোধনোপায় ইতি ভাবঃ। —পদার্থদীপিকা ( ঐ ব্যাখ্যা )

আচার্য্য নাগেশও তাঁহার 'স্ফোটবাদ' নামক গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। নাগেশভট্ট রেখাগবয়ন্যায় এবং পঞ্চকোশাদি-বাক্যের উদাহরণের সাহায্যে উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—যে ব্যক্তি কখনও গবয় নামক জন্তু দেখে নাই, তাহাকে উক্ত জন্তু চিনাইবার জন্য কেহ গবয়ের একটি রেখাচিত্র আঁকিয়া দেখায়। পরে যখনই ঐ ব্যক্তি বনে গবয় দেখে, তখন পূর্ব্বদৃষ্ট রেখাচিত্রের সাদৃশ্যহেতু সে গবয়কে চিনিতে পারে (৮৯)। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যে "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি কথাদ্বারা অন্ন প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহাও এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়কমাত্র বলিয়াই নাগেশ ভট্ট মনে করেন।

রেখাগবয়-ন্যায়

পদের মধ্যে যে প্রকৃতি-প্রত্যয় কল্পনা করা হয়, তাহা ঐরূপ রেখাগবয়ের ন্যায় অর্থবোধের সহায়কমাত্র; কিন্তু বাস্তব নহে—ইহাই নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি স্ফোটবাদীদের অভিমত।

পঞ্চকোশাদিবাক্য

কৌণ্ডভট্ট বলেন—উক্ত প্রকার গৌণব্যবহারে দোষ নাই। একটি শিশুকে যখন গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখাইয়া বলা হয়—ইহা গরু, ইহা অশ্ব, ইহা হস্তী ইত্যাদি; তখন মিথ্যা বস্তুর সাহায্যেই তাহাদিগকে সত্য বস্তু জানানো হইয়া থাকে। পরে ঐ সকল প্রতিকৃতির সাদৃশ্য হেতু গবাদি জন্তু দেখিলেই তাহারা চিনিতে পারে। অর্থ-বোধের ব্যাপারে যে প্রকৃতি-প্রত্যয়কে বোধক বলা হইয়াছে, ইহাও তেমনি প্রকৃত অর্থের বোধক না হইলেও অর্থবোধের সহায়ক বটে। গবাদি জন্তুর প্রতিকৃতিকে যেমন গো প্রভৃতি শব্দদ্বারাই প্রকাশ করা হয়, অর্থবোধের সহায়ক প্রকৃতি-প্রত্যয়কেও তেমনি অর্থের বোধকরূপে বলা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার লোকব্যবহারসিদ্ধ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত। আচার্য্য ভর্তৃহরিও বাক্যপদীয়-গ্রন্থে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন (৯০)।

গৌণ-ব্যবহার

আমাদের বিবেচনায় প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোন বস্তু, গুণ বা ক্রিয়ার বাচক হয় না বটে; কিন্তু সম্বন্ধমাত্রের বাচক হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধও আবার কখন কর্ত্তৃ, কর্ম্ম প্রভৃতি কারকের এবং

নিজ মত

---

(৮৯) প্রকৃতি-প্রত্যয়কল্পনা রেখাগবয়ন্যায়েন। তদ্বোধিতমখণ্ডং প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-বিভাগানাশ্রয়ং পদাদিবোধকমিত্যখণ্ডপদবাক্যস্ফোটাবিত্যাহুঃ।—স্ফোটবাদ, পৃষ্ঠা—৯৬।

(৯০) উপায়াঃ শিক্ষ্যমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥—বাক্যপদীয়।

কখনও বা একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যার বোধ জন্মায়। 'রামঃ গচ্ছতি' বলিতে 'রামঃ' পদের সু বিভক্তি কর্ত্তৃকারক এবং একত্বরূপ সম্বন্ধের বাচক হয়। এইরূপ 'গচ্ছতি' পদের তি বিভক্তিও উল্লিখিত দ্বিবিধ সম্বন্ধই বুঝাইয়া থাকে। 'রামস্য ঘটঃ' বলিতে ষষ্ঠী বিভক্তি স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধের এবং প্রথমা বিভক্তি কর্ত্তৃত্ব ও একত্ব সম্বন্ধের বোধক হয়। অন্যত্রও এই ভাবেই বিভক্তি ও প্রত্যয় সমূহ একটা না একটা সম্বন্ধের বাচক হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাদের বাচকতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা অযৌক্তিক।

আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট পদার্থদীপিকা নামক গ্রন্থে ৬৮ তম কারিকার ব্যাখ্যায় অখণ্ডস্ফোটবাদী পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবে কৈয়টের নাম এবং ৭১ তম কারিকার ব্যাখ্যায় জাতিস্ফোটবাদী পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবে বোপদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য কৈয়ট এবং বোপদেব উক্ত মতদ্বয়ের সমর্থনে নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বেও উল্লিখিত মতদ্বয়ের অস্তিত্ব ছিল—এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার 'বার্ত্তিক' গ্রন্থে এবং মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্বভাবতঃই এইরূপ ধারণা জন্মে যে, উল্লিখিত আচার্য্যদ্বয়ের পূর্ব্বেও শব্দের শক্তিগ্রহ জাতিতে হয়, অথবা ব্যক্তিতে হয়—এই সম্বন্ধে বৈয়াকরণদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। প্রাচীন বৈয়াকরণ ব্যাড়ির মতে শব্দের শক্তিগ্রহ হয় দ্রব্যে (৯১)। আবার অন্য কেহ কেহ জাতিতে শক্তিগ্রহও স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য কৈয়টও মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় এইরূপ পূর্ব্বাচার্য্যসম্মত জাতিশক্তিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন (৯২)। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃকও বাক্যপদীয় গ্রন্থে জাতিশক্তিবাদ সমর্থিত হইয়াছে (৯৩)। মীমাংসকেরা যে জাতিশক্তিবাদী, ইহা অতি সুবিদিত। কিন্তু মীমাংসকেরা স্ফোটবাদ সমর্থন করেন না বলিয়া তাঁহাদের কথা আমরা ছাড়িয়াই দিলাম। তবে প্রাচীন বৈয়াকরণ আচার্য্যগণের লেখায় জাতিশক্তি-

---

(৯১) দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ।—বার্ত্তিক।

(৯২) দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে, দ্রব্যমভিধীয়তে ইতি।

—মহাভাষ্য (পৃষ্ঠা-৫৪৩)।

দ্রব্যাভিধানমিতি। জাতের্ব্ব্যক্তিবিকল্পাক্ষমত্বেনাভাবং মন্যমানো ব্যাড়ির্দ্রব্যমেব শব্দেনাভিধীয়তে ইতি মন্যতে।—কৈয়ট (ঐ ব্যাখ্যা)।

(৯৩) সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।

জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥

বাদের সমর্থন থাকায় এবং উহার খণ্ডনেরও প্রয়াস দৃষ্ট হওয়ায়, বোপদেবকেই আমরা জাতিস্ফোটের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকার করিতে পারি না। বোপদেবের লেখা হইতেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার জাতিতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিলে প্রসঙ্গতঃ অখণ্ডস্ফোট স্বীকারেরও বিষয় উপস্থিত হয়। সুতরাং কৈয়টকেও আমরা অখণ্ডস্ফোটের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

মীমাংসকেরা যেমন বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, আচার্য্য কৌণ্ডভট্টও তেমনি বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন (৯৪)। বস্তুতঃ স্ফোটবাদী বৈয়াকরণ হিসাবে কৌণ্ডভট্ট যে কোন বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ, স্ফোটাত্মক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের নিত্যত্ব স্ফোটবাদীদের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং এই স্থলে কৌণ্ডভট্ট যে বর্ণনিত্যতার কথা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা স্ফোটাত্মক বর্ণের নিত্যতাই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া আমরা মনে করি। এই নিত্যতাকেও ব্যাবহারিক নিত্যতা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বর্ণ বা শব্দের বাস্তব নিত্যতা যে স্বীকার্য্য নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

বর্ণনিত্যতাবাদ

ভর্ত্তৃহরি যেমন বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শব্দতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ভট্টজিদীক্ষিতও তেমনি "বৃহদ্-বৈয়াকরণ-ভূষণম্" নামক গ্রন্থের শেষ শ্লোকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (৯৫)। ভর্ত্তৃহরি যে অর্থে শব্দতত্ত্ব শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন, আচার্য্য ভট্টজিদীক্ষিতও সেই অর্থেই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাক্যপদীয়ের ব্যাখ্যায় যেমন কোন কোন টীকাকার শব্দতত্ত্ব শব্দটিদ্বারা শব্দজাতিকে বুঝিয়াছেন, আচার্য্য কৌণ্ডভট্টও তেমনি "বৃহদ্ বৈয়াকরণভূষণম্" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অনুরূপ অর্থেই উক্ত শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কৌণ্ডভট্ট পরিষ্কার ভাষায়ই একথা বলিয়াছেন যে, শব্দজাতির যে নিত্যত্ব স্বীকার করা হয়,

ভট্টজি

কৌণ্ডভট্ট

---

তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা, তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ ॥—বাক্যপদীয়।

(৯৪) তস্মান্নিত্যা এব বর্ণাঃ।—পদার্থদীপিকা (৭০ তম কারিকার ব্যাখ্যা)

(৯৫) ইত্থং নিরূপ্যমাণং যচ্ছব্দতত্ত্বং নিরঞ্জনম্।
ব্রহ্মৈবেত্যক্ষরং প্রাহুস্তস্মৈ পূর্ণাত্মনে নমঃ ॥—৭৪ ॥ —বৃহদ্ বৈয়াকরণভূষণম্।

তাহা বাস্তব নহে; বাস্তব অর্থে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য। এই কারণেই তিনি বলেন—পরমার্থতঃ স্ফোট বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায় (৯৬)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৌণ্ডভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ অখণ্ডপদ-স্ফোট এবং অখণ্ড-বাক্যস্ফোটের মধ্যে ব্যক্তি ও জাতিভেদে দুইটি বিভাগ কল্পনা করেন নাই। বস্তুতঃ, যে যুক্তিতে পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার স্ফোটকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সেই যুক্তিতে শেষোক্ত দুই প্রকার স্ফোটকেও দুইভাগে বিভক্ত করা উচিত। সমাসবদ্ধ রাজপুত্র, কর্ণার্জ্জুন, সিদ্ধমনোরথ প্রভৃতি পদগুলিকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উচ্চারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহাদের মধ্যে ব্যক্তি ও জাতিরূপে বিভাগদ্বয় কল্পনা না করার কোন যুক্তি দেখি না। অখণ্ড-বাক্যস্ফোটের বেলাও ঠিক এই যুক্তিই খাটে। একটি সম্পূর্ণ উপাখ্যান বা সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ যখন বাক্য বা মহাবাক্যরূপে বিবেচিত হয়, তখনও তাহার উচ্চারণে ব্যক্তি ও জাতিভেদে দুইটি বিভাগ থাকা সম্ভব। একজন লোকের মুখে শুনিয়া গল্পগুলি অন্যান্য লোকেরাও ঠিক একই ভাষায় বিভিন্ন স্থানে পুনরায় উচ্চারণ করিয়া থাকে—ইহা আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করি। আবার গীতা, চণ্ডী, মেঘদূত প্রভৃতি সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিও অনেকে কণ্ঠস্থ করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং অখণ্ড-পদস্ফোট এবং অখণ্ড-বাক্যস্ফোটের মধ্যেও ব্যক্তি ও জাতিভেদে বিভাগদ্বয় স্বীকার করিয়া স্ফোটাত্মক শব্দগুলিকে মোট ১০ ভাগে বিভক্ত করা আমরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

স্ফোটবিভাগে নিজমত

---

(৯৬) তস্মাদবিদ্যাদশায়ামুক্তরীত্যা জাতিরেব স্ফোটঃ। নিষ্কর্ষে তু ব্রহ্মৈব স্ফোট ইতি ভাবঃ।—পদার্থদীপিকা (ঐ ব্যাখ্যা)।

# চতুর্থ অধ্যায়

## শব্দব্রহ্মবাদ

শব্দই ব্রহ্ম—এইরূপ মতবাদকেই শব্দব্রহ্মবাদ বলা হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ-কেশরী আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিই শব্দব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত। ভর্ত্তৃহরি শব্দব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তিনি ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন ;

শব্দব্রহ্মবাদের প্রাচীনত্ব

কারণ, অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও ব্রহ্মরূপে শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মরূপে শব্দের উল্লেখ আছে ( ১ )।

যদিও কোন কোন শ্রুতিতে ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে ওঙ্কারের অভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্য এইরূপ বলা হয় নাই। ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক—এই কথাটুকু বুঝাইবার জন্যই উক্ত প্রকার শ্রুতি কথিত হইয়াছে। ওঙ্কাররূপ প্রণবকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রণবের জপ করিলে তাহারই ফল স্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

শ্রুতির তাৎপর্য্য

মুণ্ডকোপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ করিতে হইলে প্রণবকে ধনুঃরূপে এবং আত্মাকে শররূপে ব্যবহার করা আবশ্যক (২)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও প্রণবকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সাধনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩)।

প্রণব-ব্যতিরিক্ত অন্য শব্দও যে ব্রহ্ম নহে, তাহাও অন্যান্য শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলেন—প্রজাপতি ( সৃষ্টিকর্ত্তা ) 'এত' শব্দ

---

(১) ওমিতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।৮ ॥
ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। —মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥১॥
এতদ্ বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। —প্রশ্নোপনিষৎ ; ৫ম প্রশ্ন।
ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। —ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।১।১।
অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ। —বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ব্রহ্মকাণ্ড ১।৫,৩ ॥

(২) প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৪ ॥

(৩) স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢবৎ ॥ - শ্বেতাশ্বতর উপ ১।১৪ ॥

উচ্চারণ করিয়া দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিলেন (৪)। অতএব, প্রজাপতি বা সৃষ্টিকর্তা হইতে শব্দের পার্থক্যই স্বীকৃত হইল। আমরা যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করি, তখন যেমন সেই শব্দ ও আমরা অভিন্ন হই না, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম এবং শব্দও অভিন্ন নহে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ( দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ) শব্দাত্মক বেদকে ব্রহ্মের নিঃশ্বাস-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মূলে আছে "অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ" আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যায় মহাভূত শব্দের পরমাত্মা রূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদে পরব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, মূলের 'মহতো ভূতস্য' শব্দ দুইটি ব্রহ্মপদার্থেরই বোধক। শব্দ যদি ব্রহ্মের নিঃশ্বাস-সদৃশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বলা চলিবে না; কারণ মানুষের নিঃশ্বাসকে কেহই মানুষ নামে অভিহিত করেন না। এতদ্ব্যতীত উল্লিখিত স্থলেই বৃহদারণ্যক শ্রুতি আর্দ্রকাষ্ঠ-সম্ভূত ধূমের সহিত শব্দের তুলনা করিয়াছেন। আর্দ্রকাষ্ঠ এবং ধূম অভিন্ন পদার্থ নহে; অতএব, এই উপমাদ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রতিপাদন করাই উল্লিখিত শ্রুতির অভিপ্রায়।

শব্দ ও ব্রহ্মের পার্থক্য

শ্রুতি

শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; কিন্তু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন (৫)। কঠোপনিষৎ বলেন—ব্রহ্ম একমাত্র মনোদ্বারা উপলভ্য (৬)। শব্দকে কিন্তু আমরা মনোদ্বারা উপলব্ধি করি না; শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারাই শব্দের গ্রহণ করিয়া থাকি। তাহা ছাড়া কঠোপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক (৭)। অতএব, উল্লিখিত শ্রুতি-সমূহ হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে, শব্দের বাস্তব ব্রহ্মত্ব শ্রুতিতে স্বীকৃত হয় নাই।

---

(৪) দ্বিতীয় অধ্যায়; পাদটীকা—৮১।

(৫) যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥ —কেনোপনিষৎ ১।৮॥

(৬) মনসৈবেদমাপ্তব্যম্। —কঠোপনিষৎ ২।১।১১॥

(৭) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্...। —কঠোপনিষৎ ১।৩।১৫॥

কেবল শ্রুতিতেই নহে; বিভিন্ন পুরাণে (৮), তন্ত্রশাস্ত্রের নানাস্থানে (৯) এবং মহাভারত প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও ব্রহ্মরূপে শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতেও শ্রীভগবান্ "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" কথাটিদ্বারা শব্দব্রহ্ম-বাদেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রুতির ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং শ্রুতিতে যে কারণে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও সেই কারণেই অনুরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পুরাণ, তন্ত্র, মহাভারত

মনু-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৩ তম শ্লোকে একাক্ষর প্রণবকে পরব্রহ্ম বলিয়া (একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম) এবং ৮৪ তম শ্লোকে তাহাকে অক্ষর বলিয়া (অক্ষবং ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ম্) অভিহিত করা হইয়াছে বটে; কিন্তু একাক্ষর প্রণবকে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় মনে করিয়াই যে উল্লিখিত প্রকার উক্তি করা হইয়াছে, কুল্লূক ভট্ট প্রভৃতি টীকাকারেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

মনু

তন্ত্রশাস্ত্রেও শব্দ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অর্থেই শব্দব্রহ্ম শব্দটিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত তন্ত্র সারদা-তিলকের প্রথম শ্লোকেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী যে তেজোময় দেবতা সকলের অন্তরে চৈতন্যরূপে বিরাজ করেন, তিনিই শব্দব্রহ্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন (১০)। প্রথম পটলের ১৩শ শ্লোকেও তিনি পরিষ্কার

সারদা-তিলক

---

(৮) যঃহং সর্ব্বাণি ভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু॥ —ভাগবত; ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়।
আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্।
গাত্রান্তিস্রস্ত্বর্দ্ধমাত্রং নাদাখ্যং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ —লিঙ্গপুরাণ, ১৭শ অধ্যায়।

(৯) ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥ —সারদাতিলক; ১ম পটল॥
আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥ —কুলার্ণব তন্ত্র॥
ক্রিয়াশক্তি-প্রধানায়াঃ শব্দ-শব্দার্থ-কারণম্।
প্রকৃতেবিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরম্॥ —রাঘবভট্টধৃত॥
চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ। —সারদাতিলক ১।১৩।

(১০) শব্দব্রহ্ম যদূচিরে সুকৃতিনশ্চৈতন্যমন্তর্গতম্।
তদ্বোঽব্যাদনিশং শশাঙ্কসদনং বাচামধীশং মহঃ॥

ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের মতেও সর্ব্বভূতের মধ্যস্থিত চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম (শব্দ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)।

রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্মই শব্দ ব্রহ্ম (১১)। অতিসূক্ষ্ম পরাবাকের মধ্যে কোনরূপ গুণ কল্পনা করা যায় না; কিন্তু উচ্চারিত শব্দের মধ্যে তীব্রতা, মন্দতা প্রভৃতি গুণ বিরাজিত। অতএব বুঝা যায় যে, রাধা-তন্ত্রের মতে অর্থপ্রতিপাদন সমর্থ উচ্চারিত শব্দই শব্দব্রহ্ম এবং সূক্ষ্মনাদ বা পরাবাগ্‌রূপী প্রণবই পরব্রহ্ম। এইস্থলে শব্দকে ব্রহ্ম বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, শব্দ হইতেও তেমনি শ্রোতার অন্তরে উক্ত শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ইহাতে ব্রহ্ম শব্দটি গৌণার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় তাহাদ্বারা শব্দের বাস্তব ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় না।

যদিও নির্গুণ ব্রহ্ম বলিতে সাধারণতঃ গুণাতীত, উপনিষদাদিশাস্ত্র-বিখ্যাত, পরমাত্মরূপী পরব্রহ্মকেই বুঝায়; তথাপি গৌণীবৃত্তির সাহায্যে সেই পরমাত্মার বাচক সূক্ষ্ম শব্দাত্মক প্রণবও কোন কোন আচার্য্য কর্ত্তৃক পরব্রহ্ম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী কালের কোন কোন গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায়ই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের এইরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে সিদ্ধযোগ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে (১২)।

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া শব্দময় মন্ত্রকেই দেবতাদের শরীররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শব্দের ব্রহ্মত্বস্বীকারে পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনির কোন আপত্তি নাই। বেদান্তদর্শনে প্রকারান্তরে শব্দের ব্রহ্মত্বই স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রুতিতে শব্দ হইতে বিশ্বের উৎপত্তির উল্লেখ থাকায় বৈদান্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অপর পক্ষে, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক এবং ন্যায়দর্শনে স্পষ্টতঃই শব্দের ব্রহ্মত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে; যোগদর্শনে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত প্রণবের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ (১৩) স্বীকার

আস্তিক দর্শন

(১১) অক্ষরং নির্গুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে।
সগুণং স্যাদ্ যদা ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ —রাধাতন্ত্র ॥

(১২) তদেব শব্দব্রহ্ম। নাদঃ পুনঃ পরব্রহ্মবাচকোঙ্কাররূপঃ।—সিদ্ধযোগ; ১১০ পৃষ্ঠা।

(১৩) তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। —পাতঞ্জলসূত্র ১।২৭

করায় বুঝা যায়, যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিও শব্দকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই মনে করিয়াছেন।

নাস্তিক-দর্শন

নাস্তিক দর্শনসমূহে কোথাও শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা হয় নাই; বরং নাস্তিকদের বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বৌদ্ধদের যুক্তিগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমে শব্দব্রহ্মবাদের অন্যান্য সমর্থকদের মত উল্লেখ করিয়া অবশেষে আমরা এই সম্বন্ধে বৌদ্ধদের যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিব।

বৈয়াকরণ-কেশরী আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বাক্যপদীয়ম্' এর প্রথম খণ্ড ব্রহ্মকাণ্ড নামে বিখ্যাত। এই ব্রহ্মকাণ্ডের আরম্ভেই উল্লিখিত আচার্য্য লিখিয়াছেন—

"অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥"

বাক্যপদীয়

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভর্ত্তৃহরির মতে শব্দতত্ত্ব অনাদি-নিধন (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত) ব্রহ্ম (সর্ব্বব্যাপী) এবং অক্ষর (বিকৃতিহীন); এই শব্দতত্ত্ব অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়, এবং এই শব্দতত্ত্ব হইতেই যাবতীয় সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

শব্দের ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভর্ত্তৃহরি এবং বাক্যপদীয় গ্রন্থের টীকাকারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি অনুসারে যদিও ব্রহ্মশব্দের অর্থ 'সর্ব্ব-ব্যাপী', তথাপি শ্লোকে অনাদি-নিধন, অক্ষর এবং জগৎকারণরূপে ইহাকে বর্ণনা করায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সঙ্গে শব্দতত্ত্বের অভিন্নতা-প্রতিপাদনই আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির অভিপ্রায়।

ভর্ত্তৃহরির অভিপ্রায়

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শব্দতত্ত্বকেই অনাদি-নিধন প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন; শব্দকে নহে। শব্দ এবং শব্দতত্ত্বের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। উল্লিখিত শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি কি অভিপ্রায়ে 'শব্দতত্ত্ব' শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য টীকাকার পুণ্যরাজ বলেন—

"সর্ব্বশব্দরূপতয়া সর্ব্বশব্দোপগ্রাহ্যতয়া চ শব্দতত্ত্বমভিধীয়তে।"

পুণ্যরাজের ব্যাখ্যা

আচার্য্য পুণ্যরাজের এই কথাটিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, ভর্ত্তৃহরি কোন

বিশেষ শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেন নাই; কেবলমাত্র শব্দজাতির ব্রহ্মত্বই স্বীকার করিয়াছেন—এই কথা বুঝানোই পুণ্যরাজের উদ্দেশ্য। শব্দজাতির মধ্যে সকল শব্দই আছে; সুতরাং তাহার সর্ব্বশব্দরূপতা স্বীকার্য্য। আবার সকল শব্দদ্বারাই শব্দজাতির গ্রহণ হয়, সুতরাং তাহার সর্ব্বশব্দোপগ্রাহ্যতাও স্বীকার করিতে হইবে। গোশব্দদ্বারা যেমন গো জাতির গ্রহণ হয়, শব্দগুলি দ্বারাও তেমনি শব্দজাতির গ্রহণ হইয়া থাকে—ইহাই 'শর্ব্বশব্দোপগ্রাহ্যতা' কথাটির তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতে পারে যে, কেবলমাত্র শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের জন্যই উল্লিখিত শ্লোকে শব্দ না বলিয়া শব্দতত্ত্ব বলা হইয়াছে। শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যেরা 'পরা বাক্' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকেই তাঁহারা অবাঙ্মনসগোচর, অনাদি-নিধন শব্দব্রহ্ম মনে করেন। সূক্ষ্মতম অবস্থায় সকল শব্দই একরূপে অবস্থান করে; সুতরাং তাহাব সর্ব্বশব্দরূপতা স্বীকার্য্য। আবার সকল শব্দের মূলে এই সূক্ষ্মতম অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে তাহার সর্ব্বশব্দোপগ্রাহ্যতাও স্বীকার করা যাইতে পারে; অর্থাৎ যে কোন শব্দ শুনিলেই বুঝা যায় যে, সে তাহার সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

উল্লিখিত দ্বিবিধ অভিপ্রায়েই ভর্ত্তৃহরি শব্দতত্ত্বের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অথবা ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাই সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি।

ভাববোধক ত্ব প্রত্যয় যে জাতি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, এই সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। "তস্য ভাবস্ত্বতলৌ ৫।১।১১৯॥" এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (১৪)। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিও পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে শব্দজাতির ব্রহ্মত্বের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন (১৫)।

---

(১৪) যস্য গুণস্য ভাবাদ্ দ্রব্যে শব্দনিবেশস্তদভিধানে ত্ব-তলৌ। —বার্ত্তিক।

(১৫) সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে, তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা, সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ॥

—বাক্যপদীয়ম্। ৩য় কাণ্ড, (জাতিসমুদ্দেশ) শ্লোক ৩৩—৩৪।

আচার্য্য কৌণ্ডভট্ট তাঁহার 'বৈয়াকরণ-ভূষণসার' নামক গ্রন্থে ত্ব ও তল্

বার্ত্তিক, কৌণ্ডভট্ট প্রত্যয়ের জাতিবোধকতাই সমর্থন করিয়াছেন।

বাসুদেব পাণিনির ব্যাখ্যায় আচার্য্য বাসুদেব দীক্ষিতও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (১৬)।

বস্তুতঃ, শব্দজাতির নিত্যত্ব ও ব্রহ্মত্বই যদি ভর্ত্তৃহরির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি 'শব্দ' শব্দের সঙ্গে 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করিয়া 'শব্দত্বম্' বলিতেন। অতিরিক্ত একটি তদ্ শব্দের গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। অতিরিক্ত একটি তদ্ শব্দের সন্নিবেশ ক্রমে তাহার সঙ্গে জাতি বা ভাববোধক 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করতঃ 'শব্দতত্ত্ব' পদটির গ্রহণ করিয়া আচার্য্য একটি বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি।

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীভেদে শব্দের চারিটি অবস্থা ভর্ত্তৃহরি স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবলমাত্র পরানাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির মধ্যেই নিত্যতা প্রভৃতি গুণ বিরাজিত, এবং ইহাই ব্রহ্মপদবাচ্য—এই কথা বুঝাইবার জন্যই আচার্য্য 'শব্দ' বা 'শব্দত্ব' না বলিয়া 'শব্দতত্ত্ব' বলিয়াছেন। আচার্য্য নাগেশ তাঁহার লঘুমঞ্জূষা নামক গ্রন্থে

নাগেশ ভর্ত্তৃহরির এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং লঘুমঞ্জূষার কলাটীকায় আচার্য্য বালম্ভট্টও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পরা ভিন্ন অবশিষ্ট তিনটি অবস্থাই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত—ইহাই আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির

বালম্ভট্ট অভিমত। স্ফোটবাদের আলোচনাকালে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বাস্তব অথবা ব্যাবহারিক যে অর্থেই হউক না কেন, 'শব্দই ব্রহ্ম' এইরূপ একটি মতের উল্লেখ যে, ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন বিভাগে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। কেবল ভারতবর্ষেই নহে; মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপের কোন কোন দেশের মনীষিগণের মধ্যেও

বৈদেশিক মত বেদোত্তর যুগে 'শব্দই ব্রহ্ম' এইরূপ ধারণা বর্ত্তমান ছিল। মনীষী নগেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্, এ, বি, এল মহোদয় গবেষণা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে পারস্যের সম্প্রদায়-বিশেষের

---

(১৬) ত্ব-তল্প্রত্যয়ৌ যত উৎপৎস্যেতে তস্মাৎ প্রকৃতিভূতশব্দাদ্ ব্যক্তিবোধে জায়মানে গজ্জাত্যাদিকং বিশেষণতয়া ভাসতে তদ্ ব্যক্তিবিশেষণং ভাবশব্দেন বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ।

—বালমনোরমা।

নিকটও শব্দ ব্রহ্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল (১৭)। সৃষ্টির আদিতে কেবল শব্দই বিদ্যমান ছিল—এইরূপ উক্তি খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখা যায় (১৮)।

অল্পদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় মনীষী Frank Sewall তাঁহার "Swedenborg" নামক গ্রন্থে ভগবানের অবতার যীশু খ্রীষ্টকে "রক্তমাংসের দেহরূপে অবতীর্ণ শব্দ" (word made flesh) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১৯)।

বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত সাধক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও তাঁহার The Message" নামক গ্রন্থে শব্দকে ব্রহ্মরূপে অভিহিত করিয়াছেন (২০)।

অনেকে আবার শব্দব্রহ্মবাদের বিপক্ষেও লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তিকালে যাঁহারা শব্দব্রহ্মবাদের বিপক্ষে পুস্তক প্রণয়ন করেন, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণই তাঁহাদের অন্যতম।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে শব্দ ব্রহ্ম নহে। শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণেরা বলিয়াছেন যে, শব্দ নিজেই অর্থের রূপ প্রাপ্ত হয়। বৈয়াকরণদের এই মতের বিপক্ষে বৌদ্ধাচার্য্যগণ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১৭) Savda is brahman equally in Magian and post-vedic theories··· —"The Aryan Trail in Iran and India" by N. N, ghose. Page—220.

(১৮) In the beginning there was word. Word was with God and word was god···The word was made flesh and lived amongst us with glory.

—Gospel of St John ( নানাপ্রসঙ্গে ; foot-note. পৃষ্ঠা—৩২ ধৃত )।

(১৯) In the 'word made flesh' the Divine lone, which is the father, is made manifest and through this the Holy Spirit is breathed upon the world. Thus in Him, Jesus Christ dwelleth all the fullness of the god-head bodily.—Swedenborg. ( নানাপ্রসঙ্গে ; foot-note, পৃষ্ঠা-১২—১৩ ধৃত )।

(২০) He, the word—the source of Creation,
Manifests himself with all his properties......

—The Message ( of Thakur Anukul Chandra ) Edited by Krisna prasanna Bhattacharyya. Page—2.

While, on the other hand, He, the Word
becomes Supreme Being, the Fathar
to be manifested......( Do, Do Page—8 )

(১) শব্দ নিজেই নীলাদিরূপ প্রাপ্ত হয়—এই মত স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, হয় শব্দ নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া নীলাদিরূপ প্রাপ্ত হয়, অথবা সে নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই ঐ ভাবে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, ইহাদের কোনটিই সম্ভব নহে। বৈয়াকরণ-মতে শব্দ অক্ষর; অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি, বিনাশ অথবা বিকার কিছুই নাই। শব্দ যদি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া নীলাদিরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অক্ষরত্ব ব্যাহত হয়; সুতরাং বৈয়াকরণেরা ঐরূপ কথা বলিতে পারেন না।

বৌদ্ধদের যুক্তিসমূহ

অনেক সময়ে শব্দের উচ্চারণ ব্যতিরেকেও অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। আবার কোন কোন সময়ে শব্দের উচ্চারণ থাকিলেও তাহার শ্রবণ ব্যতিরেকেই ব্যক্তিবিশেষের কাছে অর্থের উপলব্ধি হইতে দেখা যায়। বধির ব্যক্তি যখন কোন বস্তু অবলোকন করে, তখন তাহারও ঐ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে; কিন্তু সে তো উক্ত বস্তুর বাচক কোন শব্দ শুনিতেই পায় না। বধির ব্যক্তি যখন ঐরূপ কোন অর্থ (বস্তু) দেখে, তখন তাহার কেবল উক্ত অর্থেরই জ্ঞান হয়, শব্দের জ্ঞান হয় না। শব্দ যদি নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থের রূপ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে বধির ব্যক্তিরও অর্থোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দেরও জ্ঞান হইত। কিন্তু, এইরূপ হয় না; অতএব শব্দের অর্থরূপ প্রাপ্তির কল্পনা অবাস্তব (২১)।

(২) 'শব্দ নীলাদিরূপ প্রাপ্ত হয়' স্বীকার করিলে বলিতে হইবে—হয় সে ভিন্নরূপে উক্ত রূপান্তর লাভ করে, না হয়, অভিন্নরূপে তাহার এই রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। শব্দ যদি অভিন্নরূপে অর্থের আকার লাভ করিত, তাহা হইলে নীল শব্দের উচ্চারণে জগতের যাবতীয় নীল বস্তু আসিয়া একত্র উপস্থিত হইত। কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ হয় না; সুতরাং শব্দের অভিন্নরূপে অর্থরূপ-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। যদি বলা হয় যে, শব্দ ভিন্নরূপে অর্থের আকার লাভ করে, তাহা হইলে ব্রহ্ম অনেক হইয়া পড়েন। বৈয়াকরণ এবং বৈদান্তিক প্রভৃতি সকলের মতেই ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মের অনেকত্ব অসম্ভব বলিয়া শব্দের ভিন্নরূপে রূপান্তর-প্রাপ্তিও সম্ভব নহে (২২)।

---

(২১) আচার্য্য শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের ১২৯—১৩৪ শ্লোকে এবং আচার্য্য কমলশীল ঐ সকল শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধাচার্য্যগণের উল্লিখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

(২২) প্রতিভাবং চ যদ্যেকঃ শব্দাত্মা ভিন্ন ইষ্যতে।
সর্ব্বেষামেকদেশত্বমেকাকারা চ বিদ্ ভবেৎ॥

(৩) বৈয়াকরণেরা শব্দব্রহ্মের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শব্দ যদি অর্থের আকার লাভ করে, তাহা হইলে এই রূপ পরিবর্ত্তনের ফলে তাহার নিত্যত্ব ব্যাহত হয়। বৈয়াকরণ-মতে শব্দ এবং অর্থ উভয়েই নিত্য। নিত্য বস্তু সর্ব্বদা এক অবস্থায়ই থাকে; তাহাদের রূপান্তরপ্রাপ্তি অসম্ভব (২৩)।

(৪) ব্রহ্ম প্রকৃত প্রস্তাবে অবিভক্ত; কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করে—এই কথাও বলা চলে না; কারণ, ঐরূপ পরিবর্ত্তনেরও কোন প্রমাণ নাই।

বৌদ্ধমতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুইটিই প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। নীল শব্দই যে নীল অর্থরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা আমরা চক্ষুর্দ্বারা দেখি না, বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাও অনুভব করিতে পারি না; সুতরাং এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-লভ্য নহে।

শব্দের এইরূপ বিবর্ত্তন (রূপান্তর গ্রহণ) অনুমান প্রমাণদ্বারাও উপলব্ধ হয় না। লিঙ্গ (চিহ্ন প্রভৃতি) দর্শনে যে লিঙ্গীর (চিহ্নবানের) জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অনুমান। শব্দ যে অর্থের আকার লাভ করে, ইহা যদি অনুমান-প্রমাণ-গ্রাহ্য হইত, তাহা হইলে আমরা কোনরূপ লিঙ্গ দেখিয়া তাহার অনুমান করিতাম; কিন্তু এখানে এইরূপ কোন লিঙ্গ নাই। শব্দের রূপান্তর-গ্রহণরূপ কার্য্য আমরা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি না; সুতরাং এতাদৃশ কোন কার্য্য এখানে লিঙ্গ হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, শব্দের স্বভাবই এখানে লিঙ্গের কাজ করিবে, তাহা হইলেও এই উক্তি বিচারসহ হইবে না; কারণ, শব্দের ঐরূপ কোন স্বভাব প্রমাণসিদ্ধ নহে (২৪)।

---

প্রতিব্যক্তি তু ভেদেঽস্য ব্রহ্মানেকং প্রসজ্যতে।
বিভিন্নানেকভাবাত্মরূপত্বাদ্ ব্যক্তিভেদবৎ॥ —তত্ত্বসংগ্রহ; শ্লোক ১৩৬—১৩৭।

(২৩) নিত্যশব্দময়ত্বে চ ভাবানামপি নিত্যতা।
তদ্‌যোগপদ্যতঃ সিদ্ধেঃ পরিণামো ন সঙ্গতঃ॥ —তত্ত্বসংগ্রহ। শ্লোক—১৩৮॥

(২৪) ন তৎ প্রত্যক্ষতঃ সিদ্ধমবিভাগমভাসনাৎ।
নিত্যাদুৎপত্ত্যযোগেন কার্য্যলিঙ্গং চ তত্র ন॥
ধর্ম্মিসত্ত্বাপ্রসিদ্ধেশ্চ ন স্বভাবঃ প্রসাধকঃ।
ন চৈতদতিরেকেণ লিঙ্গং সত্ত্বাপ্রসাধকম্॥ —তত্ত্বসংগ্রহ। শ্লোক—১৪৭—১৪৮॥

ন তাবৎ প্রত্যক্ষতস্তস্য সিদ্ধিঃ। ন হি নীলাদের্হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহারাধিষ্ঠানাদ্ ব্যতিরিক্তমপরং ব্রহ্মরূপং প্রতিভাসতে। অপ্রতিভাসমানং চ কথং তদ্ ব্যুত্থিত-

(৫) শব্দ যদি অর্থরূপে পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে সকল শব্দেরই একটি না একটি বাস্তব অর্থ থাকিত। বস্তুতঃ, বহু নিরর্থক শব্দও দেখা যায়। বন্ধ্যাপুত্র, শশ-শৃঙ্গ, কূর্ম্মক্ষীর প্রভৃতি শব্দের বস্তুতঃ কোন অর্থই নাই। সুতরাং স্বীকার্য্য যে, শব্দ অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয় না (২৫)।

(৬) শব্দই যদি ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ সিদ্ধ যোগিগণ তাহার একটি রূপ প্রত্যক্ষ করিতেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধ যোগীই শব্দব্রহ্মের রূপ প্রত্যক্ষ করেন নাই। ইহাদ্বারাও বুঝা যায় যে, শব্দ ব্রহ্ম নহে (২৬)।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের উল্লিখিত যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে বেশ সুন্দরই হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা যেন একটি মূল বিষয় বিস্মৃত হইয়াছেন।

আলোচনা

বৈয়াকরণেরা বলিয়াছেন—শব্দতত্ত্ব অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়। বিবর্ত্তন বলিতে বাস্তব পদার্থের অবাস্তব পদার্থরূপে প্রতীতিকে বুঝায়। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন যেমন রজ্জু তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তন না করিয়াই সর্পরূপে প্রতীত হয়, বিবর্ত্তবাদী বৈয়াকরণগণের মতেও তেমনি শব্দ নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই অর্থরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং, এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধাচার্য্যগণের উল্লিখিত ১ম ও ২য় যুক্তি দুইটি ক্ষেত্রোপযোগী হয় নাই। তবে বিবর্ত্তের ক্ষেত্রে যেমন মূল বস্তুটির স্থিতি একান্ত আবশ্যক, শব্দ ও অর্থের বেলা সেইরূপ নহে—এই কথাটি যথার্থই বটে। শব্দ-ব্যতিরেকে অর্থের বা অর্থ-ব্যতিরেকে শব্দের উপস্থিতি বিবর্ত্তবাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দান করে। বৌদ্ধাচার্য্য-প্রদর্শিত ব্রহ্মের অনেকত্ব-কল্পনা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তটিও বিচারসহ নহে।

চেতোভির্ন্যায়মার্গাবস্থিতৈরস্তিত্বেন প্রতীয়তাম্। ...নাপ্যনুমানতঃ। তথা হ্যনুমানং ভবৎ কার্য্যলিঙ্গং ভবেৎ? স্বভাবলিঙ্গং বা? ...তত্র ন তাবৎ কার্য্যলিঙ্গম্। নিত্যাৎ কস্যচিৎ কার্য্যস্যানুপপত্তেঃ ক্রমযৌগপদ্যাভ্যাং নিত্যস্যার্থক্রিয়াবিরোধাৎ। নাপি স্বভাবলিঙ্গমস্তি। তস্যৈব ব্রহ্মাখ্যস্য ধর্ম্মিণোঽসিদ্ধেঃ। ন হ্যসিদ্ধে ধর্ম্মিণি তৎস্বভাবভূতো ধর্ম্মঃ স্বাতন্ত্র্যেণ সিধ্যেৎ।
—ঐ কমলশীলটীকা (পঞ্জিকা)।

(২৫) জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্রমাৎ সিদ্ধং ক্রমবৎ সর্ব্বমন্যথা।
যৌগপদ্যেন তৎ কার্য্যং বিজ্ঞানমনুষজ্যতে॥
জ্ঞানমাত্রেঽপি নৈবাস্য শক্যরূপং ততঃ পরম্।
ভবতীতি প্রসক্তস্য বন্ধ্যাসূনুসমানতা॥ —তত্ত্বসংগ্রহ। শ্লোক—১৪৯—১৫০।

(২৬) বিশুদ্ধজ্ঞানসন্তানা যোগিনোঽপি ততো ন তৎ।

বস্তুতঃ, একই আকাশকে যেমন লোকে ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি ভেদে ব্যবহার করে, তেমনি একই ব্রহ্মের বিবিধ রূপকল্পনাও সম্ভব।

বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থের ব্যাবহারিক নিত্যতার কথাই বলিয়াছেন; বাস্তব নিত্যতার কথা নহে—এই মতটি স্বীকার করিয়া লইলে বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রদর্শিত তৃতীয় যুক্তিটিও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আকাশের বিভিন্নরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেরও বিভিন্নরূপ কল্পনা সম্ভব হওয়ায় ইহার প্রমাণ নাই বলা চলে না। সুতরাং চতুর্থ যুক্তিটিও অসার। তবে চতুর্থ যুক্তিটির শেষদিকে বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দের অর্থরূপে বিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে প্রমাণাভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থই বটে। বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রদর্শিত ৫ম এবং ৬ষ্ঠ যুক্তি দুইটি বেশ সুন্দরই হইয়াছে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে বর্ণ ও ধ্বনিভেদে শব্দ দ্বিবিধ। মহর্ষি প্রশস্তপাদ তাঁহার বৈশেষিকভাষ্যে এবং আচার্য্য বিশ্বনাথ পঞ্চানন তাঁহার ভাষা-পরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় উদাহরণাদিদ্বারা ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন (২৭)।

**শব্দের দ্বৈবিধ্য**

পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ধ্বনি ও স্ফোটভেদে শব্দের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে নাগেশভট্ট প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা বিশেষ আলোচনাদ্বারা এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বর্ণাত্মক শব্দগুলি স্ফোটের বিভিন্ন বিভাগের অন্যতম। এই কারণে তাঁহারা বর্ণরূপে শব্দের পৃথক্ বিভাগ কল্পনা না করিয়া স্ফোটের অঙ্গরূপেই বর্ণগুলিকে কল্পনা করিয়াছেন। স্ফোটবাদ প্রকরণে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

**শব্দের চাতুর্বিধ্য**

মহামনীষী ভোজরাজ তাঁহার 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' নামক গ্রন্থে ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্যভেদে বাঙ্ময়ের চারিটি অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন (২৮)।

ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক পরশ্রবণগোচর শব্দমাত্রেরই ধ্বনিত্ব

---

বিদন্তি ব্রহ্মণো রূপং জ্ঞানে ব্যাপৃত্য সঙ্গতেঃ ॥ —তত্ত্বসংগ্রহ; শ্লোক – ১৫১ ॥

(২৭) স দ্বিবিধো—বর্ণলক্ষণো ধ্বনিলক্ষণশ্চ। তত্র অকারাদির্ব্বর্ণলক্ষণঃ শঙ্খাদিনিমিত্তো ধ্বনিলক্ষণশ্চ। —প্রশস্তপাদভাষ্য।

শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ। —ভাষা পরিচ্ছেদ; কারিকা—১৬৪ ॥

(২৮) ধ্বনির্ব্বর্ণাঃ পদং বাক্যমিত্যাস্পদচতুষ্টয়ম্।

যস্যাঃ সূক্ষ্মাদিভেদেন বাগ্‌দেবীং তামুপাস্মহে ॥ —সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ; ১ম শ্লোক।

স্বীকৃত হইয়াছে। ঈদৃশ ধ্বনির যে বাস্তব নিত্যতা নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। যাহা নিত্য নহে, তাহাকে ব্রহ্মও বলা চলে না।

আলোচনা

কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ বা বিভাগের ফলে ক, খ প্রভৃতি যে সকল শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহারা বর্ণনামে পরিচিত। আচার্য্যগণ বলেন—

"কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ (২৯)।"

এই 'কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা' পদটিদ্বারা আচার্য্য স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত বর্ণাত্মক শব্দগুলিও জন্মে বা উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহারাও নিত্য নহে। বস্তুতঃ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ বা বিভাগের ফলে যে ককারাদি বর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহারা ধ্বনিবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ণশব্দে যদিও লিপিগুলিকেও বুঝায়, তথাপি উচ্চারণ-ব্যতিরেকে লিপির শব্দত্ব স্বীকার্য্য নহে। এই সকল কারণে আমরা বর্ণাত্মক হিসাবে শব্দের পৃথক্ বিভাগ স্বীকার করিতে চাহি না। পদগুলিই বাক্যরূপে পরিণত হয়; সুতরাং বাক্যরূপে বাঙ্ময়ের পৃথক্ বিভাগ স্বীকার না করিলেও চলে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ধ্বনি এবং পদভেদে স্থূল শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি বিভাগ স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। সুব্‌বিভক্তি বা ত্যাদি বিভক্তির সহিত যুক্ত শব্দগুলিই পদ এবং বিভক্তিহীন শব্দগুলিই অপদ বা ধ্বনি। পদমাত্রেই সার্থক; কিন্তু অপদগুলি সার্থক অথবা নিরর্থক দ্বিবিধই হইতে পারে। বিভক্তিহীন দেব, নর, নদী প্রভৃতি শব্দগুলি সার্থক, কিন্তু মৃদঙ্গ প্রভৃতির ধ্বনি সার্থক নহে। পরা বাক্ প্রভৃতি শব্দের অপর যে সকল অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহারা উচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্ম অবস্থা; সুতরাং ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ইহারা শব্দ নহে।

ভগবান্ উপবর্ষের মতে বর্ণগুলিই শব্দ (৩০)। তাঁহার মতে 'ইহাই সেই শব্দ' এবং 'ইহাই সেই বর্ণ' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতার প্রতি প্রমাণ। উপবর্ষের মতে বর্ণগুলি উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত। শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এই সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

উপবর্ষ

(২৯) ভাষা পরিচ্ছেদ। কারিকা—১৬৫ ॥

(৩০) প্রথম অধ্যায়; পাদটীকা ১৬।

'বাক্যপদীয়' গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্ফোটাত্মক শব্দ মধ্যমানাদের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বৈখরীনাদ-প্রতিপাদিত শব্দ যেমন অপরের শ্রবণগোচর হয়, স্ফোটশব্দ সেইরূপ হয় না বলিয়াই ভর্তৃহরি মনে করেন (৩১)। একমাত্র পরা বাক্ই যদি শব্দব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে মধ্যমানাদ-প্রতিপাদ্য স্ফোটাত্মক শব্দকে আর শব্দব্রহ্ম বলা যায় না।

বাক্যপদীয়

নাগেশ ভট্টের নামে প্রচলিত 'পরমলঘুমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থে মধ্যমানাদ-ব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক শব্দকেও নিত্য শব্দব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, যদিও মধ্যমা এবং বৈখরীনাদ একই সঙ্গে শব্দদ্বয় উৎপন্ন করে, তথাপি কেবলমাত্র বৈখরীনাদব্যঙ্গ্য শব্দগুলিই অপরের শ্রবণগোচর হয়। এই সকল শব্দ ভেরীনাদেরই মত নিরর্থক। কেবলমাত্র মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দব্রহ্মই সার্থক এবং ইহা পরশ্রবণগোচর নহে (৩২)।

পরমলঘুমঞ্জুষা

অন্যত্র আবার এই 'পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থেই পরা বাক্‌কেও শব্দব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩৩)। নাগেশ ভট্টের রচিত 'লঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে স্ফোটাত্মক শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলা হয় নাই; সুতরাং 'পরমলঘুমঞ্জুষার' এই উক্তি স্বীকার্য্য কি না, ভাবিবার বিষয়। ভর্তৃহরির মতে যে একমাত্র পরা বাক্ই শব্দব্রহ্ম তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। 'লঘুমঞ্জুষা' যে নাগেশ ভট্টের রচিত, এই সম্বন্ধে মতভেদ নাই; কিন্তু 'পরমলঘুমঞ্জুষা' তাঁহার রচিত কি না, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্ফোটাত্মক শব্দের শব্দব্রহ্মতা যদি বস্তুতঃই নাগেশ ভট্টের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থেও আমরা অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাইতাম। আমার মনে হয়, পরমলঘুমঞ্জুষা নাগেশ ভট্টের রচিত নহে; অথবা তাঁহার রচিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে কেহ ইহাতে নূতন কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন।

নাগেশ ভট্টের মত

---

(৩১) বৈখর্য্যা হি কৃতো নাদঃ পরশ্রবণগোচরঃ।
মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে ॥ —বাক্যপদীয়।

(৩২) যুগপদেব মধ্যমা-বৈখরীভ্যাং নাদ উৎপদ্যতে। তত্র মধ্যমানাদোঽর্থবাচকস্ফোটাত্মকশব্দব্যঞ্জকঃ। বৈখরীনাদো ধ্বনিঃ সকলজনশ্রোত্রমাত্রগ্রাহ্যো ভের্য্যাদিনাদবন্নিরর্থকঃ। মধ্যমানাদশ্চ সূক্ষ্মতরঃ কর্ণপিধানে জপাদৌ চ সূক্ষ্মতরবায়ুব্যঙ্গ্যঃ শব্দব্রহ্মরূপস্ফোটব্যঞ্জকশ্চ। তাদৃশ-মধ্যমানাদব্যঙ্গ্যঃ শব্দঃ স্ফোটাত্মকো ব্রহ্মরূপো নিত্যশ্চ। —পরম লঘুমঞ্জুষা।

(৩৩) তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা—১১ ॥

এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার মত। পরমলঘুমঞ্জুষাকার পরাবাক্‌কেও সূক্ষ্মতম নিত্য শব্দব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার পরা বাক্ বিকৃত হইয়া প্রথমে পশ্যন্তী রূপে এবং তৎপর মধ্যমাবাক্‌রূপ স্ফোটাত্মক শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হয়, এই কথাটিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মপদার্থ নিত্য এবং বিকার-রহিত; ইহা কাহারও বিবর্ত্ত হইতে পারে না। স্ফোটাত্মক শব্দ যদি ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে সেও অন্য কাহারও বিবর্ত্তরূপে অবস্থান করিত না। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, পরম-লঘু-মঞ্জুষাকারের নিজের উক্তিই তাঁহার বিপক্ষে যাইতেছে।

ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণের লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা কেবলমাত্র পরানাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থারই নিত্যত্ব ও শব্দব্রহ্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা বা শব্দব্রহ্মতা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই (স্ফোটবাদ প্রকরণে) আলোচনা করা হইয়াছে।

স্ফোটবাদী আচার্য্যগণ অর্থপ্রতিপাদন-সমর্থ শব্দেরই স্ফোটত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, শব্দ শ্রুতিগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত সে অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না—ইহা আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। পরা বাক্ অতি সূক্ষ্ম; সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, যোগিগণ পর্য্যন্ত সহজে তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। এত সূক্ষ্ম পরা বাকের মধ্যে অর্থপ্রতিপাদন-সামর্থ্য থাকা সম্ভব নহে। যদিও বা তাদৃশ সামর্থ্য তাহাতে অতি সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, তথাপি তাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হওয়ায় তাহার সত্তা সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। যে হেতু আমরা পরাবাক্ বা তাহার অর্থ-প্রতিপাদনসামর্থ্য অনুভব করি না; সেই হেতু, এই দুইটি বস্তুর সত্তা সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দেহ নহি।

পরা বাক্ স্ফোট নহে

আমরা সর্ব্বদাই কেবলমাত্র পরশ্রবণগোচর শব্দের অর্থপ্রতিপাদন-সামর্থ্য অনুভব করিয়া থাকি। ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই বলিয়াছেন—পরশ্রবণগোচর শব্দগুলি বৈখরীনাদ-প্রতিপাদ্য এবং স্থূল। কেবলমাত্র এই বৈখরীনাদ-প্রতিপাদ্য পরশ্রবণগোচর স্থূল শব্দগুলিই অর্থপ্রতিপাদন করিতে পারে বলিয়া প্রথমে তাদৃশ শব্দের ব্রহ্মত্ব-স্বীকার সম্ভব কি না—এই সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক।

আলোচনা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, পরশ্রবণগোচর শব্দগুলির বাস্তব নিত্যতা নাই। যাহা নিত্য নহে, তাহার ব্রহ্মত্ব স্বীকারও অসঙ্গত। মধ্যমাবাগ্‌রূপী স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা বা ব্রহ্মতা যে সম্ভব নহে, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পশ্যন্তী বাকের নিত্যত্বও যে সম্ভব নহে, তাহা পরে প্রদর্শন করিব। অবশিষ্ট সূক্ষ্মতম পরা বাকের ব্রহ্মত্ব স্বীকার্য্য কি না, বলিবার পূর্ব্বে আমরা ভর্ত্তৃহরির কথাগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

শব্দ যদি ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে বেদান্তবিখ্যাত ব্রহ্মের সহিত তাহার সাম্য বা অভেদ প্রমাণ করা আবশ্যক। ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সামর্থ্য প্রভৃতির সহিত যদি শব্দেরও স্বরূপ এবং সামর্থ্য প্রভৃতির সম্পূর্ণ মিল থাকে, কেবলমাত্র তাহা হইলেই শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। ব্রহ্মের অন্যান্য গুণাবলীর সহিত শব্দের গুণাবলীর সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি বিশেষভাবে যে গুণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

ভর্ত্তৃহরির প্রথম কথা—শব্দ অনাদি-নিধন বা নিত্য। শব্দনিত্যতা-প্রকরণে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার দ্বিতীয় কথা—শব্দ অক্ষর বা বিকৃতিহীন। কেবলমাত্র নিত্য পদার্থই অক্ষর হয়; অনিত্য-পদার্থ কখনও অক্ষর হইতে পারে না। সুতরাং 'শব্দ নিত্য না অনিত্য' ইহার মীমাংসাদ্বারাই সে ক্ষর কি অক্ষর তাহারও মীমাংসা হইয়া যায়। ভর্ত্তৃহরির তৃতীয় কথা—শব্দ অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার এই তৃতীয় কথাটিই আমরা এখানে আলোচনা করিব।

কোন পদার্থের অন্য পদার্থরূপে পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ দুইভাবে হইয়া থাকে। যখন কোন বাস্তব পদার্থ অন্য একটি বাস্তব পদার্থে রূপান্তরিত হয়, বেদান্তের ভাষায় তখন সে পদার্থান্তরে পরিণত হইয়াছে, বলা হইয়া থাকে। দুগ্ধ যে দধিতে রূপান্তরিত হয়, ইহা তাহার পরিণাম; কারণ, দুগ্ধ ও দধি দুইটিই বাস্তব পদার্থ। বিবর্ত্তের বেলা কিন্তু একটি পদার্থ অবাস্তব হওয়া আবশ্যক। মূল পদার্থটি অবাস্তব হয় না; তাহার পরবর্ত্তী আকারটিই অবাস্তব হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিকেরা বলেন—ব্রহ্ম একটি বাস্তব পদার্থ; এবং সাধারণ লোক মনে করে যে, ব্রহ্মই জগতের আকার ধারণ করেন। অদ্বৈত-বেদান্তমতে জগৎ অবাস্তব মায়াময়; সুতরাং

বাস্তব ব্রহ্মের অবাস্তব জগদ্রূপে যে প্রতীতি হয়, ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। বাস্তব পদার্থের অবাস্তব পদার্থরূপে প্রতীতিই তাহার বিবর্ত্ত (৩৪)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শব্দের অর্থরূপে প্রকাশ তাহার বিবর্ত্ত হইলে অর্থ অবাস্তব পদার্থ হইয়া পড়ে। ভর্ত্তৃহরি কি ইহাই বলিতে চাহেন? অদ্বৈত-বেদান্তমতে ব্রহ্ম সত্য; কিন্তু জগৎ মিথ্যা। ভর্ত্তৃহরির উক্ত মত স্বীকার করিলে তেমনি শব্দ সত্য এবং অর্থ মিথ্যা হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভর্ত্তৃহরি অর্থের নিত্যত্বই স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহর্ষিগণের মতে যে শব্দ, অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধ প্রত্যেকেই নিত্য, এই মতের উল্লেখক্রমে আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাহার সমর্থনই করিয়াছেন, খণ্ডন করেন নাই (৩৫)।

মীমাংসক এবং বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ সকলেই শব্দ ও অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাসও তাঁহার 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" কথাটি দ্বারা শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধই স্বীকার করিয়াছেন। দুইটি নিত্য পদার্থের সম্বন্ধই নিত্য হইতে পারে। দুইটি অনিত্য পদার্থের অথবা একটি নিত্য এবং একটি অনিত্য পদার্থের সম্বন্ধ কখনই নিত্য হইতে পারে না; কারণ অনিত্য পদার্থের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থান্তরের সহিত তাহার সম্বন্ধেরও বিনাশ ঘটে।

---

(৩৪) সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥ —বেদান্তসারধৃত।

অত্র তথাস্বরূপেণাবস্থিতস্য বস্তুনোঽন্যথাভাবো দ্বিধা ভবতি। পরিণামভাবো বিবর্ত্তভাবশ্চেতি। তত্র পরিণামভাবো নাম বস্তুনো যথার্থতঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ; যথা দুগ্ধমেব স্ব-স্বরূপং পরিত্যজ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে। বিবর্ত্তভাবস্তু বস্তুনঃ স্ব-স্বরূপ-পরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যাপ্রতীতিঃ; যথা রজ্জুঃ স্বরূপান্তরেণ সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতীয়তে।
—বেদান্তসারপ্রকরণম্ (সদানন্দকৃতম্)॥

পরিণামো নাম উপাদানসমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ। বিবর্ত্তো নাম উপাদানবিষমসত্তাক-কার্য্যাপত্তিঃ। —বেদান্তপরিভাষা; প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ।

(৩৫) নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ॥—বাক্যপদীয়ম্। ব্রহ্মকাণ্ড; ২৩ শ্লোক।

'তদশিষ্যং সংজ্ঞা-প্রমাণত্বাদিত্যাদি-সূত্রাণি নিত্যত্বং সমর্থয়ন্তে। অনুতন্ত্রং বার্ত্তিকম্। তত্রাপ্যুক্তম্—'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' ইতি। ভাষ্যেঽপ্যুক্তং "নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈ"রিত্যাদি।
—ঐ, পুণ্যরাজটীকা।

নৈয়ায়িকেরা মনে করেন—অনিত্য পদার্থদ্বয়ের, অথবা একটি নিত্য এবং একটী অনিত্য পদার্থের মধ্যে যে সমবায়-সম্বন্ধ থাকে, তাহা নিত্য হইতে পারে। এই কারণেই তাঁহারা 'নিত্যসম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বম্' এইরূপ সমবায়ের লক্ষণ করিয়াছেন। ঘটের সহিত কপালের বা ঘটরূপের যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়ই বটে; কিন্তু ইহার বাস্তব নিত্যতা আমরা উপলব্ধি করি না। যতক্ষণ ঘট আছে, ততক্ষণই কপাল বা ঘটের রূপও থাকে; কিন্তু ঘটটীকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলে তখন আর কপাল বা ঘটরূপের সহিত তাহার সমবায়-সম্বন্ধও থাকে না। অতএব সমবায়-সম্বন্ধের সার্ব্বত্রিক নিত্যতা স্বীকার্য্য নহে।

শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধটীকে বস্তুতঃ সমবায়ও বলা চলে না, কারণ শব্দের উপস্থিতিতেও অর্থের অনুপস্থিতি দেখা যায়। মধ্যরাত্রিতে সহস্রবার সূর্য্যশব্দ উচ্চারণ করিলেও তাহার অর্থ সূর্য্যরূপ বস্তুর উদয় হয় না। তাহা ছাড়া মেঘগর্জ্জন, মৃদঙ্গধ্বনি প্রভৃতি শব্দের বস্তুতঃ কোন অর্থই নাই। এই কারণেই আমরা শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধমাত্র স্বীকার করি। এই সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পঞ্চম অধ্যায়ে বলিব।

শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধবাদী ভর্ত্তৃহরির মতে শব্দ এবং অর্থের প্রত্যেকেই নিত্য হওয়ায় শব্দের অর্থরূপে বিবর্ত্তন অসম্ভব। নিত্য শব্দের নিত্য অর্থরূপে জ্ঞানকে তাহার পরিণামই বলিতে হইবে, বিবর্ত্ত নহে। শ্রুতিতেও অর্থরূপে শব্দের পরিণামেরই উল্লেখ দেখা যায়। ভর্ত্তৃহরি নিজেও শ্রুতির এই মতটির উল্লেখ করিয়াছেন (৩৬); কিন্তু খণ্ডন করেন নাই।

অদ্বৈত-বেদান্তমতে পারমার্থিক বিচারে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, জীবজগৎ নাই; সুতরাং জীবজগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলা চলে। অপরপক্ষে শব্দের অর্থ যে আছে, তাহা তো শব্দব্রহ্মবাদী ভর্ত্তৃহরিও অস্বীকার করিতে পারেন না; অতএব, বেদান্তবিখ্যাত ব্রহ্মের সঙ্গে শব্দের এবং জগতের সঙ্গে অর্থের সাদৃশ্য কোথায়?

বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতে বিলীন (দুগ্ধে মিষ্টতার ন্যায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত) হইয়া আছেন; কিন্তু শব্দ তো এইভাবে অর্থে বিলীন হইয়া থাকে না। শব্দ যদি অর্থে বিলীন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অর্থের অবিদ্যমানে কোন শব্দের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ, অর্থের অবিদ্যমানেও শব্দের বিদ্যমানতা দেখা যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক যখন গরু, ঘোড়া, হাতী, পর্ব্বত,

(৩৬) শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড; ১২১ শ্লোক।

সমুদ্র প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া ছাত্রদিগকে উহাদের স্বরূপ বুঝাইতে থাকেন, তখন গবাদি অর্থের অবিদ্যমানেও তাহাদের বাচক শব্দের অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষই উপলব্ধি করিয়া থাকি। শব্দ অর্থে বিলীন থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। এতদ্‌ব্যতীত আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মক্ষীর প্রভৃতি অর্থহীন শব্দের উচ্চারণও লোকে করিয়া থাকে এবং ইহারা শ্রুতিগোচরও হয়। অতএব, ব্রহ্ম যেভাবে জীবজগতে বিলীন থাকেন, শব্দ সেইভাবে অর্থে বিলীন থাকে না—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বেদান্তমতে জীবজগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে; কিন্তু অর্থ তো এই ভাবে শব্দে বিলীন হয় না। অর্থ যদি শব্দে বিলীন হইত, তাহা হইলে গো পদার্থটি গোশব্দে বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা বালকেও করিবে না। আমরা সর্ব্বদাই দেখি, গোশব্দ উচ্চারণ করা হউক বা না হউক, শৃঙ্গলাঙ্গূলাদি-বিশিষ্ট গো নামক জন্তুটির অবস্থিতি অক্ষুণ্ণই থাকে। যখন কোন ব্যাধিতে কোন গরু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার সময়ে গোশব্দ উচ্চারণের অপেক্ষা রাখে না; অথবা তাহার দেহ পচিয়া মাটিতে মিশিয়া যাওয়ার সময়েও গোশব্দের উচ্চারণ আবশ্যক হয় না। অতএব, একথা ধ্রুব সত্য যে, গো পদার্থটি গো শব্দে বিলীন হইতে পারে না।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম কারণ এবং জগৎ কার্য্য। শব্দ ব্রহ্ম হইলে সেও অর্থের কারণ হইবে। অর্থ যদি শব্দের কার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনিত্য বলিতে হইবে; কারণ, কার্য্যমাত্রেই অনিত্য। শব্দব্রহ্মবাদীরা অর্থেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং অর্থ শব্দের কার্য্য হইতে পারে না। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ন-উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শব্দও কি অর্থের অভিন্ন-উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ? "সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়" (৩৭) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি" (৩৮) প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা তাঁহার নিমিত্ত-কারণত্ব সমর্থিত হয়; কিন্তু শব্দকে অর্থের বা জগৎপ্রপঞ্চের উপাদান-কারণ অথবা নিমিত্তকারণ বলিয়া সমর্থন করিবার মত শ্রুতি কোথায়?

---

(৩৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৬ ॥

(৩৮) ঐ ৩।১ ॥

যদি বলা হয় যে, "ঋঙ্ময়ো যজুর্ম্ময়ঃ সামময়ো বৈরাজঃ পুরুষো বৈ যজ্ঞস্তস্মৈতা লোকম্পৃণাস্তিস্র আহুতয়স্তা বৈ ত্রয়ো লোকাঃ (৩৯)" ইত্যাদি শ্রুতিতে শব্দময় বেদকে জগতের উপাদান-কারণ, এবং "এষ বৈ ছন্দস্যঃ সামময়ঃ প্রথমো বৈরাজঃ পুরুষো যোঽগ্রমসৃজত, তস্মাৎ পশবোঽজায়ন্ত, পশুভ্যো বনস্পতয়ো বনস্পতিভ্যো দিশঃ" (৪০) ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহাকে জগতের নিমিত্তকারণ বলিয়া জানানো হইয়াছে; তাহা হইলেও আমরা বলিব—বৈদিক শব্দসমূহের জগৎ-কারণত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহাদ্বারা শব্দ-মাত্রের জগৎকারণত্ব প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃ বেদের বাহিরেও বহু শব্দ আছে; কিন্তু তাহাদের জগৎকারণতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। যদি বলা হয় যে, "বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যম্" (৪১) এই ঋগ্বেদের মন্ত্রে বাঙ্মাত্রকেই বিশ্বের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা বলিব—একথা সত্য নহে। উক্ত মন্ত্রের 'বাগেব' কথাটি দ্বারা বৈদিক বাঙ্ময়ের কথাই বুঝিতে হইবে। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ—এইরূপ অর্থ করিলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়ের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। দ্বিতীয়তঃ—বৈদিক ঋষিগণ সর্ব্বত্রই বাক্ শব্দটিদ্বারা বৈদিক বাঙ্ময়ের গ্রহণ করিয়াছেন; অবৈদিক শব্দের ব্যবহার তাঁহারা পছন্দ করিতেন না।

বেদে অবৈদিক শব্দগুলিকে অপশব্দ নামে অভিহিত করা হইয়াছে; এবং তাদৃশ অপশব্দের উচ্চারণও নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অপশব্দের উচ্চারণ করা উচিত নহে বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, অসুরগণ অপশব্দ উচ্চারণ করার ফলেই পরাভূত হইয়াছিল; (৪২) অতএব, অপশব্দের নিত্যতা বা জগৎ-কারণতা যে বেদে অভিহিত হওয়া সম্ভব নহে; ইহা সহজেই অনুমেয়।

বস্তুতঃ, বৈদিক শব্দগুলিকেও জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈদিক শব্দসমূহ অশুচি অবস্থায় উচ্চারণ করিলে ফলপ্রসূ হয় না। আচার-হীন ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ সহস্রবার বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেও সেই মন্ত্র নিষ্ফলই

(৩৯) বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড, ১২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুণ্যরাজধৃত।

(৪০) " " "

(৪১) বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ডের প্রকাশটীকায় ১২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নারায়ণদত্তশর্ম্মাধৃত।

(৪২) তে হেঽলয় হেঽলয় ইত্যুক্ত্বা পরাবভূবুঃ।—মহাভাষ্য, অস্পশা।

হইয়া থাকে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—বিশ্বের যাবতীয় নিবন্ধনী শক্তি শব্দসমূহের মধ্যেই নিহিত (৪৩)। তাঁহার এই উক্তি যথার্থ নহে। শব্দেই যদি বিশ্বের যাবতীয় নিবন্ধনী শক্তি নিহিত থাকিত, তাহা হইলে অশুচি বা আচারহীন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রও ফলপ্রসূ হইত। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রাক্কালে শব্দ দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার ইচ্ছাবশতঃই সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। নাস্তিকেরা তো ঈশ্বরকেই স্বীকার করিতে চাহেন না।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই—কোন শিল্পী যখন মূর্ত্তি তৈয়ার করে, তখন তাহার মনের অভিপ্রায় অনুযায়ী হস্তের সাহায্যেই সে উহা করিয়া থাকে। তাহার এই নির্ম্মাণকার্য্যে শব্দোচ্চারণের কোন প্রয়োজন হয় না। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর যখন বিশ্বসৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারও শব্দোচ্চারণ একান্ত প্রয়োজন ছিল না। পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই যে সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহার প্রতিপাদক শ্রুতিও আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ "সোঽকাময়ত—বহুস্যাম্…" প্রভৃতি শ্রুতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাপুরুষেরা অনেক সময় শব্দোচ্চারণ-ব্যতিরেকেই অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকেন। মহাত্মা ৺তৈলঙ্গস্বামী যখন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিতেন, তখন তাঁহার কোন মন্ত্র বা শব্দ উচ্চারণের আবশ্যক হইত না (৪৪)। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, সাধনাসিদ্ধ ইচ্ছাশক্তিই গুরুতর কার্য্যসাধনে সমর্থ; শব্দ নহে। সিদ্ধ-মহাপুরুষ-সেবিত মন্ত্রে ঐ সকল মহাপুরুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি আংশিকভাবে অবস্থান করে বলিয়াই ঐ সকল মন্ত্র কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। নাস্তিক, আচারভ্রষ্ট, অশুচি ব্যক্তি যখন তাদৃশ মহাপুরুষ-

---

(৪৩) শব্দেষেবাশ্রিতা শক্তিঃ বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।—বাক্যপদীয়ম্, ব্রহ্মকাণ্ড; ১১৯ শ্লোক।

(৪৪) উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ৺মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি—তিনি জীবনে অন্ততঃ দুইবার মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছেন। একবার তিব্বতের শ্মশানক্ষেত্রে, এবং অন্য একবার ৺কাশীধামের একটি শ্মশানক্ষেত্রে। মহাপুরুষদের এইরূপ অলৌকিক শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো বলিবেন মৃত্যুর পর দেহে প্রাণ-সঞ্চার করা সম্ভব নহে। কিন্তু উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জড়বাদী চিকিৎসকেরা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘোষণা করার পরেও সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সেই ব্যক্তির দেহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে স্থিত জীবনী শক্তিকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়া তথাকথিত মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া তুলিতে সমর্থ হন।

সেবিত মন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন তাহার অযোগ্যতার ফলে উল্লিখিত ইচ্ছাশক্তি আকৃষ্ট না হওয়ায় মন্ত্র সহস্রবার উচ্চারিত হইলেও ফলদানে বিরত থাকে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ত্রের শক্তিও বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তিদ্বারাই পরিচালিত হয়।

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। উল্লিখিত শ্রুতিগুলিতে যে শব্দের জগৎ-কারণতা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে উচ্চারিত শব্দগুলিরই উল্লেখ দেখা যায়; অনুচ্চারিত পরা বাগ্‌রূপী সূক্ষ্মতম শব্দের নহে। 'বাক্যপদীয়ম্' গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে "শব্দতত্ত্বম্" পদটি যে ভর্ত্তৃহরি এই অভিপ্রায়েই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য নাগেশ ভট্ট তাঁহার লঘুমঞ্জূষা নামক গ্রন্থে যে স্পষ্টতঃই সূক্ষ্মতম পরাবাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বাক্যপদীয় গ্রন্থের টীকাকার আচার্য্য পুণ্যরাজ যে এই কারণেই সূক্ষ্মতম 'পরাবাক্' এর মধ্যে কোনরূপ অবান্তর বিভাগ কল্পনা করেন নাই, স্ফোটবাদের আলোচনা কালে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শব্দের জগৎ-কারণতার প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহাদিগকে অর্থবাদ বলিয়া জানিতে হইবে। শব্দবিদ্যার প্রশংসা করিবার জন্যই ঐ সকল শ্রুতি অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থবাদবাক্য বেদের নানাস্থানে দেখা যায়।

বস্তুতঃ, শব্দ এবং অর্থের কার্য্যকারণভাব ভর্ত্তৃহরিও স্বীকার করিয়াছেন। বাক্যপদীয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সম্বন্ধসমুদ্দেশ প্রকরণে একটি শ্লোকদ্বারা তিনি স্পষ্টই তাঁহার এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (৪৫)। উক্ত শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে, শব্দদ্বারা অর্থ উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ অর্থের কারণ; আবার বুদ্ধিস্থ অর্থ হইতে শব্দের প্রতীতি হওয়ায় অর্থকেও শব্দের কারণ বলা যাইতে পারে। ভর্ত্তৃহরির এই যুক্তি মানিয়া লইলে শব্দ এবং অর্থ উভয়েই অনিত্য হইয়া পড়ে। শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে নিত্য ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার সমতা হইতে পারে না।

ভর্ত্তৃহরি যে স্ফোটাত্মক শব্দকে কেবল অর্থেরই কারণ বলিয়াছেন এমন নহে; ইহাকে তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের কারণরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন

---

(৪৫) শব্দঃ কারণমর্থস্য স হি তেনোপজন্যতে।
তথা হি বুদ্ধিবিষয়াদর্থাচ্ছব্দঃ প্রতীয়তে ॥৩২॥

(৪৬)। অন্যত্র একটি শ্লোকে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে, স্ফোটাত্মক শব্দও সংযোগ এবং বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয় (৪৭)। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে কোন কোন টীকাকার আবার ভিন্নরূপে অর্থ করিয়াছেন। স্ফোটবাদের আলোচনা কালে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

ব্যক্তিরূপ স্ফোট অনিত্য, কিন্তু জাতিরূপ স্ফোট নিত্য—একথাও বলা চলে না; কারণ, ভর্তৃহরি স্ফোটমাত্রেরই জাতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়ম্' গ্রন্থে ব্রহ্মকাণ্ডের ৯৪ তম শ্লোকে আচার্য্য ভর্তৃহরি উক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যাকার পুণ্যরাজ তাঁহার প্রকাশ-টীকায় ভর্তৃহরির অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন (৪৮)।

যদিও ভর্তৃহরি অন্য একটি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, জাতিমাত্রেই নিত্য এবং ব্যক্তিমাত্রেই অনিত্য; তথাপি তাঁহার এই উক্তিও বিচারসহ নহে (৪৯)। অনেক ব্যক্তির সমষ্টিকেই জাতি বলা হয় ( অনেকব্যক্ত্যাধারা হি জাতিঃ ); সুতরাং ব্যক্তি-সমষ্টির বিলোপে জাতিরও বিলোপ হইয়া থাকে। শরভ, অলর্ক প্রভৃতি বহু জাতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও আরও কত জাতির বিলোপ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? আণবিক, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রদ্বারা যদি একটি ব্যাপক

---

(৪৬) দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ শব্দবিদো বিদুঃ।
একো নিমিত্তং শব্দানামপরোঽর্থে প্রযুজ্যতে॥—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড; ৪৪ শ্লোক।
অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্॥—ঐ, ঐ, ৪৬ শ্লোক।

(৪৭) যঃ সংযোগ-বিভাগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোটঃ, শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ॥—বাক্যপদীয়ম্ ব্রহ্মকাণ্ড; ১০৩ শ্লোক।

(৪৮) অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতা।
কৈশ্চিদ্ ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ॥—বাক্যপদীয়ম্, ব্রহ্মকাণ্ড; ৯৪ শ্লোক।

আকৃতিনিত্যত্বাচ্ছব্দনিত্যত্বং ব্যাচক্ষাণৈঃ কৈশ্চিদ্বৃত্তয়তঃ স্ফোটমাত্রং নির্দ্দিশ্যতে। রূপ্রত্যেকশ্রুতিরিত্যেবমাদিষু "এ ওঙ্" ইত্যাদি-সূত্রস্থ-ভাষ্যেষু স্ফোটশব্দেন শব্দাকৃতিমাচক্ষতে। উৎপত্তিমত্যস্তু শব্দব্যক্তয়ো জাতিরূপং স্ফোটং দ্যোতয়ন্ত্যো ধ্বনিব্যপদেশং লভন্তে। সা চ ক্রমোৎপন্নৈস্তথৈবানুভূতৈরনেকবর্ণৈরন্ত্যবর্ণপ্রত্যক্ষকালে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণানুভবজ-সংস্কার-সহকারেণাভিব্যজ্যতে ইতি তাৎপর্য্যম্।—ঐ, প্রকাশটীকা।

(৪৯) সত্যাসত্যৌ তু যৌ ভাবৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ।
সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥—বাক্যপদীয়ম্, তৃতীয়কাণ্ড; ৩২ শ্লোক।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ জাতির বিলোপ ঘটিতে বেশীদিন লাগিবে না। অতএব, জাতিমাত্রেরই নিত্যতা স্বীকার্য্য নহে। "অগ্নেরগ্নিত্বমপাগাৎ"—এই শ্রুতিতেও অগ্নিত্বরূপ জাতির বিনাশের উল্লেখ দেখা যায়। মনীষী 'কৃষ্ণমাচার্য্য' নাগেশভট্ট-রচিত স্ফোট-বাদ নামক গ্রন্থের যে উপোদ্‌ঘাত লিখিয়াছেন, তাহাতে উক্ত শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়া জাতির অনিত্যতার পক্ষেই যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন।

জাতির ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করিলেও বাস্তব নিত্য পদার্থ ব্রহ্ম হইতে তাহার পার্থক্য পরিস্ফুটই থাকিবে। শব্দার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বদাই জীবজগৎরূপে বিবর্ত্তিত হন, শব্দের অর্থরূপে বিবর্ত্তন সেই প্রকার নহে ; ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ, শব্দ এবং অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। বর্ত্তমান গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। জীবজগৎ কিন্তু ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। অতএব, ব্রহ্মের সহিত শব্দের এবং জীবজগতের সহিত অর্থের বস্তুতঃ সাদৃশ্য নাই।

শব্দকে অর্থের অভিন্ন-উপাদান ও নিমিত্ত-কারণরূপে বর্ণনা করিয়া অর্থের সহিত শব্দের সাম্য প্রতিপাদনের জন্যও ভর্তৃহরি চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দকে অর্থের অভিন্ন-উপাদানরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভর্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা অর্থের সহিত শব্দের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মকাণ্ডের প্রথম শ্লোকে ভর্তৃহরি অর্থরূপে শব্দের বিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মকাণ্ডেরই পরবর্ত্তী বিভিন্ন শ্লোকে তিনি শব্দকে অর্থের নিমিত্তকারণও বলিয়াছেন। শব্দার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ যে কাল্পনিক এবং অবাস্তব এই কথা নাগেশ-ভট্ট প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা পরিষ্কার ভাষায়ই স্বীকার করিয়াছেন (৫০)। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, শব্দের নিমিত্ত-কারণতা বাস্তব হইলেও উপাদান-কারণতাকে আর বাস্তব বলা যায় না। অপরপক্ষে, ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা এবং নিমিত্ত-কারণতা উভয়েই বাস্তব ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে শব্দের পার্থক্যও পরিস্ফুট।

বৈদান্তিকেরা বলেন—ফুল-ফল-শাখা-পল্লবাদি-বিশিষ্ট বৃক্ষ যেমন সম্পূর্ণ বস্তু, ব্রহ্মও তেমনি সম্পূর্ণ পদার্থ ; জীবজগৎ ব্রহ্মের ফুল-ফল-স্থানীয়।

(৫০) বর্ত্তমান গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্থও কি এইভাবে শব্দের অঙ্গস্বরূপ? বৃক্ষ বলিতে শাখা বা ফুল-ফল বুঝায় না; কিন্তু সমগ্র বৃক্ষকেই বুঝায়। ব্রহ্ম বলিতেও তেমনি জীবজগৎকে বুঝায় না। অতএব, এই বিষয়ে বৈদান্তিকদের যুক্তি ঠিকই আছে। শব্দের উচ্চারণে কিন্তু একটি সম্পূর্ণ অর্থই বোধগম্য হয়। সেই অর্থ যদি উক্ত শব্দের অঙ্গ হইত, তাহা হইলে অর্থ ব্যতিরিক্তও শব্দের প্রতিপাদ্য কিছু থাকিত; কিন্তু তাহা তো থাকে না। অতএব, শব্দের সহিত ব্রহ্মের এবং জগতের সহিত অর্থের তুলনা হইবে কি প্রকারে?

বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা; কারণ, তিনিই জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে, কোন শব্দকে তো এইরূপ কোন অর্থ সৃষ্টি করিতে দেখা যায় না। একটি জনপ্রাণিহীন মাঠে দাঁড়াইয়া যখন কোন মানব গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, তখন তো তাহার সম্মুখে ঐ সকল প্রাণী আসিয়া উপস্থিত হয় না। মধ্যরাত্রিতে সূর্য্য শব্দ সহস্রবার উচ্চারণ করিলেও কেহ সূর্য্য দেখিতে পায় না। অতএব, স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম যেমন জগৎ সৃষ্টি করেন, শব্দ সেইভাবে অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে না।

ব্রহ্মের স্বরূপ জানাইবার জন্য বেদান্তসূত্রকার মহর্ষি ব্যাস প্রথমেই বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", অর্থাৎ, যাঁহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। শব্দ যদি ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি প্রভৃতি শব্দ হইতেই হইয়া থাকে।

শব্দব্রহ্মবাদীরা মনে করেন—কোন পদার্থ যখন নাম ও রূপ ধারণ করে, তখনই হয় তাহার যথার্থ উৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বে তাহার সত্তা থাকিলেও উহা সাধারণের গোচরীভূত বা বাক্য-প্রতিপাদ্য না হওয়ায় ঐ অবস্থায় তাহার যথার্থ সত্তা স্বীকার্য্য নহে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট করিতেছি।

আকরের মধ্যে স্বর্ণ পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত থাকিলেও লোক-সমাজ যতদিন তাহা জানিতে পারে নাই, ততদিন লোকসমাজে স্বর্ণপদার্থ এবং তাহার বাচক স্বর্ণশব্দ দুইই অবিদিত ছিল। ঐ অবস্থায় জনসাধারণের কাছে স্বর্ণ পদার্থের কোন পরিচয় বা উপযোগিতা না থাকায় শব্দব্রহ্মবাদিগণের মতে ঐ সময়ে স্বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকারেরও কোন উপযোগিতা নাই। যেদিন মানুষ স্বর্ণকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে একটি নাম দিল, সেইদিনই হইল

স্বর্ণের প্রকৃত সৃষ্টি। এইরূপে বিদ্যমান স্বর্ণপদার্থ হইতে বলয়, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার সকল যেদিন লোকে প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে শিখিল, সেইদিনই ঐ সকল অলঙ্কারের প্রকৃত সৃষ্টি হইল। এই যুক্তি মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় যে, শব্দ হইতেই দ্রব্যনিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদের "তম আসীত্তমসা গূল্‌হমগ্রে" (৫১) প্রভৃতি মন্ত্রে এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আচার্য্য সায়ণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৫২)।

যে জিনিষের নাম নাই, তাহার সত্তাও অস্বীকার্য্য—এই যুক্তিদ্বারা শব্দকে দ্রব্যের স্থিতির কারণরূপেও গ্রহণ করা যায়। আবার কোন জিনিষের ধ্বংস হইলে তাহা যখন শব্দের সাহায্যে অন্যকে জানানো হয়, তখনই হয় তাহার প্রকৃত ধ্বংস—এই মত মানিয়া লইলে শব্দকে দ্রব্যনিচয়ের ধ্বংসের কারণরূপেও স্বীকার করা যাইতে পারে।

শব্দব্রহ্মবাদিগণের উক্তিসমূহ দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা উল্লিখিত যুক্তিতেই শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন (৫৩)। বস্তুতঃ, এই সকল যুক্তিদ্বারা শব্দের ব্যাবহারিক জগৎ-কারণতা সিদ্ধ হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা দ্বারা শব্দের যথার্থ জগৎ-কারণতা প্রমাণিত হয় না।

তাহা ছাড়া, ব্রহ্ম দ্রব্য-পদার্থ; কিন্তু শব্দ দ্রব্য নহে। শব্দ আকাশের গুণ। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না; অতএব, আকাশকে আশ্রয় না করিয়া অবস্থান করা শব্দের পক্ষে সম্ভব নহে। গুণমাত্রেই অনিত্য সুতরাং শব্দও অনিত্য। অনিত্য, গুণ শব্দ নিত্যদ্রব্য ব্রহ্মের সমান হইবে কি প্রকারে? শব্দ যে গুণ, 'শব্দের স্বরূপ' প্রকরণে বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

(৫১) ঋগ্বেদসংহিতা; ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত, ৩য় মন্ত্র।

(৫২) আত্মতত্ত্বস্যাবরকত্বান্মায়াপরসংজ্ঞং ভাবরূপাজ্ঞানমত্র তম ইত্যুচ্যতে। তেন তমসা নিগূঢ়ং সংবৃতং কারণভূতেন তেনাচ্ছাদিতং ভবতি। আচ্ছাদকাৎ তস্মাত্তমসো নামরূপাভ্যাং যদাবির্ভবনং তদেব তস্য জন্মেত্যুচ্যতে।—ঐ, সায়ণভাষ্য।

(৫৩) শব্দেষ্বেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।

যন্নেত্রঃ প্রতিভাত্মায়ং ভেদরূপঃ প্রতীয়তে॥—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড; ১১৯ শ্লোক।

শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।

ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্‌ বিশ্বং ব্যবর্ত্তত॥—ঐ, ঐ, ১২১ শ্লোক।

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।

অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে॥—ঐ, ঐ, ১২৪ শ্লোক।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 'আনন্দো ব্রহ্মণো রূপম্' এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। আনন্দ সুখেরই নামান্তর এবং ইহা একটি গুণ ; সুতরাং ব্রহ্মকে গুণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিব না কেন ? ইহার উত্তরে আমরা বলিব—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' 'গুণাতীত' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে ; তিনি গুণস্বরূপ হইলে তাঁহার নামের সঙ্গে ঐসকল বিশেষণ যুক্ত হইত না। অতএব 'আনন্দো ব্রহ্মণো রূপম্' প্রভৃতি শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ যখন সর্ব্বপ্রকার মানসিক বৈক্লব্য দূরীভূত করিয়া কেবলমাত্র নিষ্কলুষ আনন্দ অনুভব করিতে পারে, সেই সময়েই তাহার চিত্তের নিষ্কলুষতার ফলে সে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের গুণত্ব সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা হয় যে, নিত্যদ্রব্য আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে বর্ত্তমান শব্দও অনাদিকাল হইতে অবস্থিত আছে, তথাপি দ্রব্য ব্রহ্মের সহিত গুণ শব্দের তুলনা হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, আকাশ নিত্য কি না—এই সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ আছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে আকাশের অনিত্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। সাংখ্যাচার্য্যগণও দৃঢ়তার সহিত আকাশের অনিত্যতাই ঘোষণা করিয়াছেন। মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের ১।৬১ সূত্রে পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহা হইতে ষোড়শ তত্ত্ব এবং ষোড়শ তত্ত্বের অন্তর্গত পঞ্চতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে (৫৪)। সুবিখ্যাত সাংখ্যাচার্য্য ৺ঈশ্বরকৃষ্ণও তাঁহার সাংখ্যকারিকা নামক গ্রন্থে শ্লোকাকারে এই সকল কথাই বলিয়াছেন (৫৫)। অর্থাৎ সাংখ্যেরাও পুরাণকারের ন্যায় শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, মাঠরবৃত্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহেও সাংখ্যাচার্য্যগণের উল্লিখিত অভিমতই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই স্থলে সংশয় জন্মিতে পারে যে, তন্মাত্রগুলি তো অতিশয় সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্মত্বহেতু ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ; অপর পক্ষে, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত তদপেক্ষা

---

(৫৪) প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা ২৯ ॥

(৫৫) প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥—সাংখ্যকারিকা ; ২২শ শ্লোক।

স্থূল, এবং প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সুতরাং সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে স্থূল আকাশাদির উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব—তন্মাত্রের চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম হইতে যে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, উপনিষৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি শাস্ত্রসম্মত হওয়ায় অবশ্য স্বীকার্য্য।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূল

আমরা সর্ব্বদা যে সকল বস্তু ও কার্য্য দেখিতে পাই, তাহারাও এই বিষয়ের সাক্ষী। অতিসূক্ষ্ম বটবীজ হইতে যে বিশাল বট-বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা কে না জানে? হস্তী ও হস্তিনীর দেহজাত দুইটি সূক্ষ্ম বীজ হইতে যে আর একটি বিশাল হস্তীর সৃষ্টি হয়, তাহাও আমরা সকলেই জানি। সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ মিলিয়াই আকাশে সুবিশাল মেঘের উৎপত্তি হয়। এমন কি, আমাদের এই বিশাল পৃথিবীও কতকগুলি পার্থিব পরমাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল পঞ্চভূতের যে উৎপত্তির কথা সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

এইরূপে আকাশের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে, তখন আর একটি বিষয় আমাদের মনে উপস্থিত হয়। তাহা এই যে, প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়ে আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি মহাভূত যথাক্রমে নিজ নিজ কারণে বিলীন হয়—একথাও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে; অতএব, এইরূপ উৎপত্তি-বিনাশ-শীল আকাশকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিব কেন? অপর পক্ষে বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িকেরা আকাশকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৫৬)। আকাশের নিত্যতা বা অনিত্যতা সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ থাকায় শব্দের আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে বিলীন থাকাকেও তাহার নিত্যতার বা ব্রহ্মত্বের প্রমাণরূপে স্বীকার করা চলে না।

পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—আকাশ যে একটি দ্রব্য, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত; কিন্তু তন্মাত্রগুলি গুণ-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। রূপ, রস, গন্ধ,

---

(৫৬) নিত্যদ্রব্যাণি পরমাণ্বাকাশাদীনি বিহায়াশ্রিতত্বং সাধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ। ...

– সিদ্ধান্তমুক্তাবলী; ২৪শ কারিকার ব্যাখ্যা।

সমানাসমানজাতীয়কারণাভাবাচ্চ নিত্যম্।—প্রশস্তপাদভাষ্য।

স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি গুণ যখন অভিসূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহাদিগকে তন্মাত্র বলা হয়। এই গুণ তন্মাত্র হইতে দ্রব্য আকাশের উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

গুণ হইতে দ্রব্যোৎপত্তি

শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি যে সকল গুণ আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের কেহই কোন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না। শ্বেতগুণ বা কৃষ্ণগুণ হইতে একটি দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে—এমন কথা কেহই বলিতে পারে না; অথবা উপলব্ধিও করে না। তাহা হইলে কি পুরাণোক্ত এবং সাঙ্খ্যসম্মত তন্মাত্রের আকাশ-জনকতা মিথ্যা?

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি। শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য স্থূলদ্রব্যাশ্রিত গুণ কোনরূপ স্থূল দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না সত্য; কিন্তু সূক্ষ্ম আত্মাতে অবস্থিত সূক্ষ্মগুণ সমূহের দ্রব্যোৎপত্তির ক্ষমতা আছে। একটি লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা ইহা প্রদর্শন করিতে পারি। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু মনুষ্যাদির অন্তঃস্থিত গুণই বটে। কিন্তু এই সকল সূক্ষ্ম গুণের দ্রব্যোৎপাদন-সামর্থ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। গুণের কর্ম্মোৎপাদকতা বিভিন্ন শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ইহা অনুভবসিদ্ধও বটে। মাতা-পিতার অন্তরে যখন কামনারূপ গুণের উদ্ভব হয়, তখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। এই আকর্ষণের পরিণতিরূপে তাঁহাদের দেহে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এবং সেই ক্রিয়ার ফলে শিশুর জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণীর জন্মব্যাপারে তাহার মাতাপিতার চিত্তস্থিত কামনারূপ গুণই কারণ—ইহা স্বীকার করিতে হয়।

গুণ হইতে যে ক্রিয়ার উদ্ভব হয়, ইহা শাস্ত্রকারেরাও পরিষ্কার ভাষায়ই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—দেহস্থ আত্মচৈতন্য হইতে প্রথমে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। অতঃপর, উক্ত ইচ্ছা হইতে জন্মে কর্ম্মপ্রবৃত্তি। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয় কর্ম্মের প্রচেষ্টা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতেই হয় ক্রিয়ার সাধন (৫৭)। উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যটিতে যে ইচ্ছাকে ক্রিয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা আত্মার গুণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে চিন্তানায়কগণ কর্ত্তৃক গুণ হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

---

(৫৭) আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা, ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা, চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥

আবার ক্রিয়া হইতে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং সূক্ষ্ম গুণ হইতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হইলেও অন্ততঃ পরম্পরা-সম্বন্ধে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রে যে প্রকৃতিকে জগৎ-কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলেই যে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায়ই তাহা বলা হইয়াছে (৫৮)।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও গুণের দ্রব্যসৃষ্টির সামর্থ্য স্বীকৃত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে তাহাতে এক এক সময়ে এক একটি গুণের প্রাবল্য জন্মে, এবং তাহারই ফলে জগতের যাবতীয় কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে (৫৯)।

গীতার উল্লিখিত শ্লোকে যে প্রকৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাদ্বারা যে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার কথাই বলা হইয়াছে, আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যে এই কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন (৬০)। আচার্য্য আনন্দগিরি তাঁহার টীকায় ইহাকে মায়াশক্তি বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন (৬১)। মায়াশক্তি গুণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

গীতার উক্ত শ্লোকে প্রকৃতি শব্দে ষষ্ঠীবিভক্তি (প্রকৃতেঃ) এবং গুণশব্দে তৃতীয়া বিভক্তি (গুণৈঃ) যোগ করা হইয়াছে। ইহা স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন, 'প্রকৃতেঃ' পদটিদ্বারা গুণগুলির বিকারের পূর্ব্বাবস্থা এবং 'গুণৈঃ' পদটিদ্বারা তাহার বিকারের পরবর্ত্তী অবস্থাকে বুঝানো হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই যদি গীতাকারের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি 'গুণৈঃ' না বলিয়া সম্ভবতঃ 'বিকারৈঃ' বা এইরূপ অন্য কোন

---

(৫৮) দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥—ভাগবত ৩ স্ক, ২৬ অঃ ১৭ শ্লোক।

(৫৯) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥—গীতা ৩।২৭।

(৬০) প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা; তস্যাঃ প্রকৃতেঃ গুণৈঃ বিকারৈঃ কার্য্যকারণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ···।—শাঙ্করভাষ্য (গীতা ৩।২৭)।

(৬১) প্রধানশব্দেন মায়াশক্তিরুচ্যতে।—আনন্দগিরিটীকা (গীতা ৩।২৭)।

পদদ্বারা নির্দ্দেশ করিতেন। "বিকারৈঃ কর্ম্ম সর্ব্বশঃ"—বলিলে ছন্দোভঙ্গও হইত না, এবং একবচনে প্রযুক্ত 'কর্ম্ম' পদটিদ্বারা সমগ্র কর্ম্মজাতিকে বুঝাইবার পক্ষেও কোন বাধা থাকিত না। আমার বিবেচনায় 'প্রকৃতেঃ' পদে অভেদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, "রাহোঃ শিরঃ" বলিতে যেমন 'রাহোঃ' পদে অভেদে ষষ্ঠী হয়, এখানেও তেমনি। প্রকৃতি বিকৃত হইলেই যে সৃষ্টি হয়, ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি-অনুসারেই বুঝা যাইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উল্লিখিত তৃতীয় অধ্যায়েরই অষ্টাবিংশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" বলিয়া জানাইয়াছেন যে, জগতের যাবতীয় কার্য্য এবং কারণ গুণ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। আচার্য্য শঙ্কর এবং আচার্য্য আনন্দগিরি যথাক্রমে তাঁহাদের ভাষ্যে এবং টীকায় এইরূপ অর্থ ই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমরাও এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

বেদান্তশাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ম বা আত্মার যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম জন্ম, মৃত্যু ও বিকার-রহিত, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অদাহ্য এবং অচ্ছেদ্য। শব্দ ব্রহ্ম হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, শব্দের মধ্যেও এই সকল গুণ আছে। শব্দের নিত্যতা স্বীকার না করিলে তাহাকে উৎপত্তি, বিনাশ এবং বিকার রহিত বলিয়াও স্বীকার করা চলে না। অপর পক্ষে, অক্লেদ্যত্ব প্রভৃতি গুণ যে শব্দের মধ্যেও আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

শব্দ অক্লেদ্য; কারণ, জলাদিদ্বারা তাহাকে ক্লিন্ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। নর, অশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু ক্লিন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার বাচক শব্দকে কেহ কখনও ক্লিন্ন করিতে পারে না। শব্দ যদি লিপি-সমষ্টি হইত, তাহা হইলে পত্রাদিতে লিখিত লিপিসমষ্টির ক্লিন্নত্ব দেখিয়া শব্দকেও ক্লেদ্য বলা যাইতে পারিত; কিন্তু শব্দ লিপিসমষ্টি নহে। দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ বা বিভাগের দ্বারা শব্দ উপজাত হয়, এবং সে আকাশদেশ অবলম্বন করিয়া থাকে। শব্দ একটি অদৃশ্য পদার্থ; কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার অস্তিত্বের অনুভব করা যায়। দৃশ্য পদার্থগুলিকেই ক্লিন্ন হইতে দেখা যায়; অদৃশ্য শব্দের পক্ষে ক্লিন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

শব্দ অক্লেদ্য

শব্দ অশোষ্য; কারণ, কেবলমাত্র ক্লেদ্য পদার্থেরই শোষণ সম্ভব। জল,

বা জলদ্বারা ক্লিন্ন হয় এমন অন্য পদার্থকেই বায়ু শোষণ করিতে পারে। অক্লেদ্য অগ্নি বা আকাশ প্রভৃতি পদার্থ যেমন অশোষ্য, শব্দও তেমনি অশোষ্য।

শব্দ অশোষ্য

শব্দ অদাহ্য; কারণ, তাহাতে কোন পার্থিব পদার্থের সংযোগ নাই। যে সকল দ্রব্যে পার্থিব পদার্থের সংযোগ আছে, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই দগ্ধ হইতে দেখা যায়। কাষ্ঠাদি পার্থিব পদার্থেরই দহন সম্ভব। কোন পার্থিব-পদার্থের সম্পর্ক-রহিত জল, বায়ু প্রভৃতিকে যেমন অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি শব্দকে দগ্ধ করাও তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

শব্দ অদাহ্য

শব্দ অচ্ছেদ্যও বটে। কেবলমাত্র দৃশ্যমান আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থকেই ছিন্ন হইতে দেখা যায়। শব্দের অদৃশ্যতা এবং আকার-হীনতাই তাহার অচ্ছেদ্যত্বের প্রমাণ।

শব্দ অচ্ছেদ্য

শব্দের মধ্যে অক্লেদ্যত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত কয়েকটি গুণ থাকিলেও কেবল মাত্র এই কারণে তাহার ব্রহ্মত্ব প্রমাণিত হয় না। ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কোন কোন অনিত্য পদার্থের মধ্যেও উল্লিখিত গুণসমূহ দেখা যায়। অনিত্য পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত অগ্নির মধ্যেও অক্লেদ্যত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত চারিটি গুণ আছে; এবং জলের মধ্যেও অদাহ্যত্ব ও অচ্ছেদ্যত্ব রূপ গুণদ্বয় বিদ্যমান। কিন্তু এই কারণে উক্ত মহাভূতগুলিকে কেহই ব্রহ্ম বলেন না। ব্রহ্মের সকল গুণ যদি শব্দের মধ্যে থাকিত, কেবল মাত্র তাহা হইলেই শব্দের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইত।

শব্দ ব্রহ্ম নহে

বেদান্ত-বিখ্যাত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। শব্দের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে শব্দেরও সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক। সৎ—নিত্য। চিৎ—জ্ঞান। আনন্দ শব্দের অর্থ স্বতঃ প্রসিদ্ধ। পরমলঘুমঞ্জুষা প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে যে স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মত স্বীকার করিয়া না হয় স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিব কোন্ যুক্তিতে? শব্দ ও অর্থের মধ্যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে শব্দকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করার পক্ষে বিবিধ অন্তরায় আছে। শব্দ আনন্দের উৎপাদক হয়—ইহা অনুভবসিদ্ধ। শব্দার্থের

শব্দ জ্ঞানস্বরূপ নহে

তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে শব্দের আনন্দস্বরূপত্বও সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করা যে আমরা সমীচীন মনে করি না, তাহা শব্দার্থের সম্বন্ধ বিচার প্রকরণে প্রদর্শিত হইবে।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের পূর্ব্বে এবং হিরণ্য-গর্ভেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন (৬২)। শব্দ আকাশের গুণ হইলে তাহাকে আর পঞ্চ মহাভূতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা চলে না; এবং মহাভূত সমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়ায় শব্দের পক্ষে হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে।

ব্রহ্ম শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী

কঠোপনিষৎ বলেন—অরণিদ্বয়ের মধ্যে যে অগ্নি গর্ভিণীর গর্ভের ন্যায় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম (৬৩)। বস্তুতঃ ব্রহ্মের অদৃশ্যতার স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্যই এই শ্রুতিটি কথিত হইয়াছে; ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য নহে। ব্রহ্ম যে অগ্নি হইতে ভিন্ন, কঠোপনিষদের ২।২।৯ শ্লোকে পরিষ্কার ভাবেই ইহা বলা হইয়াছে।

উপনিষদের অন্যান্য কথা

উপনিষৎ বলিয়াছেন—যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্ত গমন করেন, তিনিই ব্রহ্ম (৬৪)। শব্দ হইতে সূর্য্যের উদয় এবং শব্দেই তাঁহার অস্তগমন আমরা কিভাবে প্রমাণ করিব? ঋগ্‌ভাষ্যে আচার্য্য সায়ণ দ্রব্যাদির নামসৃষ্টিকেই দ্রব্যাদির কারণরূপে কল্পনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু এইরূপ কল্পনা তো বাস্তব নহে।

উপনিষৎ বলেন—ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব্বত্রগামী। তিনি দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, কলসীতে সোমরূপে এবং গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণরূপে অবস্থিত। তিনি দেবতা, মনুষ্য ও যজ্ঞ সকলের মধ্যেই বিরাজমান। তিনি আকাশে স্থিত, আবার জলে শঙ্খাদিরূপে জাত। তিনিই পৃথিবীতে

---

(৬২) যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত॥ —কঠোপনিষৎ ২।১।৬॥

(৬৩) অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥
—কঠোপনিষৎ ২।১।৮॥

(৬৪) যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবা সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥—ঐ, ২।১।৯॥

ব্রীহিযবাদিরূপে উৎপন্ন হন এবং যজ্ঞাঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া থাকেন। তিনিই পর্ব্বত হইতে নদ্যাদিরূপে উৎপন্ন; আবার পারমার্থিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বকারণরূপে মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী (৬৫)। ব্রহ্মের এই সকল গুণ আমরা কেমন করিয়া শব্দে সংযোজন করিব?

উপনিষৎ অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। কারণরূপ সূক্ষ্ম অগ্নি যেমন পার্থিব পদার্থসমূহে প্রবেশ করিয়া সেই সেই দাহ্য পদার্থের আকৃতি লাভ করে, এবং কারণরূপ বায়ু যেমন প্রাণিগণের দেহে প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, কারণরূপ ব্রহ্মও তেমনি বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্নরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। সূর্য্য যেমন অশুচি-দর্শনাদি পাপের উৎপাদক হইয়াও নিজে সেই পাপদ্বারা লিপ্ত হন না, ব্রহ্মও তেমনি জাগতিক দুঃখাদিদ্বারা লিপ্ত হন না (৬৬)।

শব্দব্রহ্মবাদিগণ মনে করেন—শব্দ অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়: সুতরাং তাঁহাদের মতে উল্লিখিত অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্যের দৃষ্টান্ত শব্দের ক্ষেত্রেও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, অর্থ যে শব্দের বিবর্ত্ত নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

অর্থ শব্দের বিবর্ত্ত নহে

বস্তুতঃ ব্রহ্ম যে শব্দস্বরূপ নহেন কঠোপনিষদের ১।৩।১৫ শ্লোকে স্পষ্টই তাহা বলা হইয়াছে (৬৭)। এক্ষণে সংশয় জন্মিতে পারে যে, শ্রুতিগোচর শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার্য্য না হইলেও পরাবাক্‌রূপী তাহার সূক্ষ্মতম অবস্থার ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা হউক। আচার্য্য নাগেশ তাঁহার লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে স্পষ্ট

---

(৬৫) হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদৃতষদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা, ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥
—কঠোপনিষৎ ২।২।২॥

(৬৬) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥—কঠোপনিষৎ ২।২।৯—১১॥

(৬৭) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্...।—কঠোপনিষৎ ১।৩।১৫॥

ভাষায়ই পরাবাক্‌কে শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি যে শব্দতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, নাগেশ ভট্ট মনে করেন, শব্দের এই সূক্ষ্মতম পরা অবস্থাই সেই শব্দতত্ত্ব।

সংশয়

বস্তুতঃ, এই পরা বাক্‌কেও ব্রহ্ম বলা চলে না। শব্দব্রহ্মবাদিগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন—উচ্চারণের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কুল-কুণ্ডলিনীতে বিকার উপস্থিত হয় না; এবং কুল-কুণ্ডলিনী বিকৃত না হইলে পরা বাকের উৎপত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরা বাকের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার কারণরূপ উচ্চারণেচ্ছা থাকা আবশ্যক। এই কথা স্বীকার করিলে পরা বাকের উৎপত্তি-ধর্ম্মকতা হেতু তাহার অনিত্যতাই সিদ্ধ হয়।

সংশয়-নিরসন

তন্ত্রশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম হইতে প্রথমে মায়াশক্তির সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই মায়াশক্তি হইতে বিন্দু এবং তাহা হইতে নাদাত্মক সূক্ষ্ম শব্দের (পরা বাকের) সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারাও পরা বাকের অনিত্যতাই সিদ্ধ হয়। যাহা অনিত্য, তাহাকে ব্রহ্ম বলা চলে না।

এতদ্ব্যতীত, পরা বাকের আশ্রয়স্থল জীবদেহস্থ স্থানবিশেষ। দেহসৃষ্টির পূর্ব্বে সেই দেহস্থ পরা বাকের উৎপত্তিও অসম্ভব। দেহ বিনাশের পর এই পরা বাক্‌ও আশ্রয়হীন হইয়া বিনষ্ট হইতে বাধ্য হয়; সুতরাং ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার্য্য। আকাশের অংশের ন্যায় জীবদেহস্থ পরা বাক্‌কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কোন পরা বাকের অংশরূপেও কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এইরূপ কোন পরা বাকের অবস্থিতি প্রমাণসিদ্ধ নহে। তাহা ছাড়া, পরা বাক্ বিকৃত হইা ক্রমশঃ শ্রুতিগোচর শব্দে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু আকাশের এইরূপ রূপান্তর-গ্রহণ অসম্ভব। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাবাগ্-রূপী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটিরও বাস্তব ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা সর্ব্বথা অযৌক্তিক।

রত্নদর্পণ নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থের (সরস্বতী-কণ্ঠাভরণের টীকা) মত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা শব্দের চারিটি অবস্থাকেই শব্দব্রহ্ম মনে করিয়াছেন। অন্যথা তিনি "শব্দব্রহ্মণশ্চতস্রো ভিদা ভবন্তি" এইরূপ বলিতেন না। তিনি নিজেই কেবলমাত্র প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বাক্‌কে নিত্য এবং অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং চতুর্থ বৈখরী বাক্ যে অনিত্য এবং

রত্নদর্পণ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইল। যাহা অনিত্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা ব্রহ্ম হইবে কেমন করিয়া ? যদি বলা হয় যে, তিনি জাতি অর্থে শেষোক্তটিরও নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তথাপি এই শেষোক্ত অবস্থাটির অতীন্দ্রিয়ত্ব সাধিত হয় না। তাহা ছাড়া, জাতি অর্থেই যদি চারিটি অবস্থার নিত্যত্ব অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি প্রথমোক্ত তিনটি অবস্থাকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন ? অন্যান্য আচার্য্যগণ পশ্যন্তী এবং মধ্যমা বাকের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই ; সুতরাং তাঁহার মতটি এই দিক্ দিয়াও অভিনব। রত্নদর্পণকার পশ্যন্তী ও মধ্যমাবাকের নিত্যত্বসাধক কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই ; সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতবিরোধী তাঁহার এবংবিধ কল্পনাকে আমরা অযৌক্তিক মনে করি। এতদ্ব্যতীত, পশ্যন্তী এবং মধমা বাক্ সূক্ষ্মা ( পরা ) বাকের বিকার বলিয়াও তাহাদের নিত্যত্ব বা ব্রহ্মত্ব স্বীকার্য্য নহে। নিত্যপদার্থ কখনও অন্যের বিকৃত অবস্থা হইতে পারে না।

পশ্যন্তী প্রভৃতি অবস্থা যে পরা বাকের বিবর্ত্ত বা বিকৃত অবস্থা, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণও এইরূপ মতই পোষণ করিতেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থের কলা-টীকায় আচার্য্য বালম্ভট্ট স্পষ্ট ভাষায়ই ভর্ত্তৃহরির এইরূপ অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৬৮)।

সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সাধনাদ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কোন প্রকার সৃষ্টির প্রাক্কালে এক প্রকার না একপ্রকার স্পন্দন হইয়া থাকে। মহাকাশে যে অসংখ্য পরমাণু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ স্পন্দনের ফলেই তাহারা পরস্পর মিলিত ও জড়ীভূত হইয়া নূতন নূতন গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে। জলীয় পরমাণু-সমষ্টির স্পন্দনের ফলেই তাহারা ঘনীভূত হইয়া আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে, এবং তাহাদের সঙ্গে তৈজস পরমাণু-রাশির স্পন্দনজাত সঙ্ঘাত ঘটিলেই মেঘ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে যে স্ত্রীপুরুষের মিলনের ফলে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হয়, সেই মিলনও উক্ত নারী ও পুরুষের দেহের স্পন্দন ভিন্ন আর কিছু নহে। হস্তপদাদির স্পন্দন-ব্যতিরেকে আমরা কোন কাজই করিতে পারি না। স্পন্দন হইলেই একটি না একটি শব্দ হয় বলিয়া সিদ্ধাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন (৬৯)। আমাদের হৃৎপিণ্ডের

(৬৮) বিবর্ত্তিত ইত্যনেন পশ্যন্ত্যাদয়োঽপ্যস্য বিবর্ত্ত এবেতি সূচিতম্।—কলাটীকা।

(৬৯) কার্য্যং যত্র বিভাব্যেত কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকং
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতঃ শব্দান্বয়ী সর্ব্বদা।

স্পন্দনের ফলে যে শব্দ হয়, তাহা আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি।

স্বষ্টির আদিতে সর্ব্বপ্রথম যে স্পন্দন হইয়াছিল, তাহাকেই সিদ্ধাচার্য্যগণ অপর প্রণব বা ওঙ্কাররূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই আদি স্পন্দন হইতেই স্বষ্টির আরম্ভ হইয়াছিল এইজন্য ইহাকে শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়। স্পন্দনের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে; এই কারণে ইহাকে অক্ষরও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্মত্ব বা অক্ষরত্ব যে বাস্তব নহে, তাহাও শাস্ত্র-প্রমাণ, যুক্তি এবং অনুভবদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।

আদি স্পন্দন ও শব্দব্রহ্ম

স্বষ্টির আদিতে প্রথম স্পন্দনেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় যে অপর প্রণব বা ওঙ্কারাত্মক শব্দময় স্পন্দনও ছিল না, ইহাও বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ের পর যে এই স্পন্দনেরও অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহাও শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং ওঙ্কাররূপ এই আদি স্পন্দনেরও যখন আদি এবং অন্ত আছে, তখন তাহার বাস্তব নিত্যতা স্বীকার করা চলে না। কেবলমাত্র তাহার আদি-অন্তের সময়-নির্ণয় মানুষের সাধ্যাতীত বলিয়া উক্ত প্রণবের বা স্থূক্ষ্মতম শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার করা যায়। বস্তুতঃ উল্লিখিত আদিস্পন্দন নিজেই ওঙ্কারাত্মক শব্দ নহে, কিন্তু ইহা ওঙ্কারাত্মক শব্দের উৎপাদক কারণ। এই আদিস্পন্দন ও ওঙ্কারের মধ্যে যে অভিন্নতা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা কল্পনামাত্র।

শব্দ হইতে বিশ্বের উৎপত্তির বিপক্ষে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—পদার্থ-স্বষ্টির ক্ষমতা শব্দের মধ্যে থাকিলে, যে কোন শব্দ উচ্চারণ-মাত্র তাহার বাচক বস্তুটির উদ্ভব হইত। কিন্তু এইরূপ তো হয় না; অতএব, শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিব কেন? এই সংশয়ের উত্তরে কোন কোন আগমশাস্ত্রীয় গ্রন্থে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, শব্দের অর্থোৎপাদন-ক্ষমতা প্রায়ই মায়াদ্বারা আবৃত থাকে; এই কারণেই অধিকাংশ শব্দ তাহাদের বাচক বস্তু স্বষ্টি করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে তাঁহারা মায়ার চারি প্রকার ক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—(১) প্রাবৃতি (২) ঈশবল (৩) কর্ম্ম এবং (৪) মায়াকার্য্য—এই চারিভাবে মায়ার কার্য্য সঙ্ঘটিত

চারিপ্রকার মায়া

স্বষ্টিশ্চৈব তথাদিমা কৃতিবিশেষত্বাদভূদ্ স্পন্দিনী
শব্দশ্চোদভবত্তথা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥ —শিবসংহিতা।

যেখানে শক্তির স্পন্দন, সেখানে শব্দ থাক্‌বেই। —দয়াল মহারাজ (নাদলীলামৃত ৫৯ পৃষ্ঠায় ধৃত)

হইয়া থাকে। শ্রীমৃগেন্দ্র-তন্ত্রের ১।২।৭ শ্লোকে ইহা বলা হইয়াছে, এবং টীকাকার নারায়ণকণ্ঠ মূল শ্লোকের অভিপ্রায় স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন (৭০)।

(১) **প্রাবৃতি**—প্রাবৃতি বলিতে তান্ত্রিক আচার্য্যগণ স্বাভাবিক অশুদ্ধিকে বুঝেন। যখন কোন স্বভাবদুষ্ট ব্যক্তি কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন ঐ মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। এই স্থলে উচ্চারণকারীর স্বভাবদোষই ফলোৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই স্বভাবদোষই মায়ার প্রথম কার্য্য 'প্রাবৃতি' নামে তন্ত্রশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। অশুচি ব্রাহ্মণের উচ্চারিত মন্ত্র যে ফলপ্রদ হয় না; তাহাও এই প্রাবৃতিরই ফল।

(২) **ঈশবল**—পরমেশ্বরের মধ্যে যেমন সৃজন-ক্ষমতা আছে, তেমনি প্রবল রোধশক্তিও রহিয়াছে। এই রোধশক্তিরূপ ঈশের (পরমেশ্বরের) বল (শক্তি)ই মায়ার দ্বিতীয় কার্য্য। সাধারণ মানুষের উচ্চারিত শব্দগুলি যদি তাহাদের বাচক অর্থসমূহ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে জগতে এক বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। কেহ ইচ্ছামাত্র কোন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে বা তাহার দেহে ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারিবে। দুশ্চরিত্র মূর্খ লম্পটকে রাজার আসনে বসানো এবং মহাজ্ঞানী মহাজনদিগকে চরম দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করাও যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠিবে। এই কারণে সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর শব্দের সৃজনীশক্তিকে নিজ রোধশক্তিরূপ মায়াদ্বারা আবৃত্ত করিয়া রাখেন। ইহারই ফলে যে কোন ব্যক্তির উচ্চারিত যে কোন শব্দ তাহাদের বাচক বস্তু বা ক্রিয়া উৎপাদনে প্রায়ই সমর্থ হয় না।

(৩) **কর্ম্ম**—ফল-কামনায় লোকে যে কার্য্য করে, তাহারই নাম কর্ম্ম। শব্দের উচ্চারণমাত্রই যদি অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর কেহই কোন কর্ম্ম করিবে না। কর্ম্ম না করিলে লোক অলস হইবে এবং ফলে হইবে জগতের অত্যন্ত ক্ষতি। এই কারণে পরমেশ্বর কর্ম্মরূপ মায়ার তৃতীয়

---

(৭০) প্রাবৃতীশবলে কর্ম্ম মায়াকার্য্যং চতুর্ব্বিধম্।
পাশজালং সমাসেন ধর্ম্মা নাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ ॥—শ্রীমৃগেন্দ্রাগম ১।২।৭ ॥

প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণাচ্ছাদয়তি আত্মনাং দৃক্‌ক্রিয়ে ইতি প্রাবৃতিঃ স্বাভাবিক্যশুদ্ধির্ম্মল ইত্যর্থঃ। ঈষ্টে স্বাতন্ত্র্যেণেতীশঃ তদীয়ং বলং রোধশক্তির্দ্বিতীয়ঃ পাশঃ...। ক্রিয়তে তত্তৎফলার্থিভিরিতি কর্ম্ম...সোঽয়ং তৃতীয়ঃ পাশঃ ॥ মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ ব্যক্তিং যাতীতি মায়া। ...স্বকার্য্যেণ কালাদিনা সহিতৈবমপ্যনাদিকালীনা চতুর্থঃ পাশ ইতি।—ঐ নারায়ণকণ্ঠের টীকা।

অবস্থাটি সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়ার এই তৃতীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকার ফলেই ফললাভের জন্য মানুষের অন্তরে কর্ম্মপ্রেরণা জন্মে, এবং তখন সে শব্দোচ্চারণের সাহায্যে কার্য্য সিদ্ধির আশা না করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

(৪) **মায়াকার্য্য**—উল্লিখিত তিনটি ছাড়াও মায়ার আরও বহুবিধ কার্য্য আছে। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার প্রবল স্নেহ না থাকিলে শিশুদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইত না। পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাব, যশোলিপ্সা, বিলাসের বাসনা প্রভৃতিও মায়ারই কর্ম্ম। মায়ার এইসকল কার্য্যকেই আগমবিদ্‌গণ মায়াকার্য্য বা মায়ার চতুর্থ কার্য্য নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মায়ার কার্য্যসমূহ উল্লিখিত কারণে এইরূপ চারিভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যগণ মনে করেন। তাঁহারা এইরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত চারি প্রকার মায়াকার্য্য সৃষ্টি রক্ষার জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই রচিত। ইহারা প্রাণিকুলকে মোহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যগণ ইহাদিগকে পাশ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। শ্রীমৃগেন্দ্র-তন্ত্রের উল্লিখিত শ্লোকে এই কারণেই মায়ার উপরোক্ত কার্য্যগুলিকে পাশজাল নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

আলোচনা

বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই—কোন স্থলেই মানুষের উচ্চারিত "অগ্নি উৎপন্ন হউক", "এই বিড়ালটি শৃগালে পরিণত হউক" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নি উৎপন্ন বা বিড়াল শৃগালে রূপান্তরিত হয় না। ইহা যদি মায়ার কার্য্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্ব্বত্রই এই মায়াকার্য্য বিদ্যমান। এইরূপে মায়াকার্য্যের সার্ব্বত্রিকতা স্বীকৃত হইলে তাহাদ্বারাই সকল শব্দের অর্থোৎপাদন-ক্ষমতা প্রতিষিদ্ধ হইয়া যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা বলিতে চাই যে, মায়াদ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ার ফলেই হউক বা স্বভাবতঃই হউক, কোন শব্দের উচ্চারণই বস্তু বা ক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ নহে। সুতরাং বাস্তব দৃষ্টিতে শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা চলে না।

তবে, একজনের উচ্চারিত শব্দ শুনিয়া অন্য কেহ যখন অগ্নি প্রজ্বালিত করে, তখন গৌণীবৃত্তির সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে, ঐ শব্দের উচ্চারণই (অর্থাৎ, ঐ শব্দের উচ্চারণের ফলেই অন্য কোন ব্যক্তি) অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে। এইরূপ উপচার-বৃত্তির সাহায্যে শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা হইবে ব্যাবহারিক ব্রহ্মত্ব; বাস্তব নহে।

আমরা পূর্ব্বে যেমন শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছি, এখানেও তেমনি তাহার ব্যাবহারিক ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

শব্দের উচ্চারণ শ্রোতার মনে অর্থের একটি ধারণা জন্মায়—এইটুকু মাত্র বুঝাইবার জন্যই অন্যান্য গ্রন্থেও বিভিন্ন প্রকারে বাক্য-প্রয়োগ করা হইয়াছে। মহার্থ-মঞ্জরী নামক গ্রন্থে শব্দকে বিশ্বের মূল না বলিয়া আত্মাকেই বিশ্বের মূল বলা হইয়াছে (৭১)। এই আত্মা শব্দদ্বারা যে পরমেশ্বরকে বুঝানো হইয়াছে, তাহাও গ্রন্থকার তাঁহার স্বরচিত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন (৭২)। শিবসূত্র নামক গ্রন্থে যে উদ্যমকে ভৈরব নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৭৩), তাহাদ্বারাও সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায়ই জানা যাইতেছে যে, কাহারও উচ্চারিত শব্দ শুনিয়া অন্য লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার এই কর্ম্মোদ্যমই কার্য্য সৃষ্টির কারণ। ইহাদ্বারাও শব্দের বাস্তব ব্রহ্মত্ব খণ্ডিতই হইতেছে।

বিরূপাক্ষ-পঞ্চাশিকা নামক আগমশাস্ত্রীয় গ্রন্থেও (২।১৯) "স্বেন বিনা মৃতমণ্ডম্" বলিয়া গ্রন্থকার চৈতন্যমাত্রেরই সৃজনীশক্তি স্বীকার করিয়াছেন; শব্দের নহে। এইরূপে সম্যক্ আলোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, তন্ত্রশাস্ত্রে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক অর্থেই শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; বাস্তব অর্থে নহে।

চারিপ্রকার ব্রহ্ম

আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদ্-ভাষ্যে চারিপ্রকার ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন; যথা—(১) নিরুপাধিক পুরুষ, (২) নিত্যসত্ত্বোপাধিক ঈশ্বর, (৩) অক্ষর ব্রহ্ম (কারণরূপ); এবং ব্রহ্মাণ্ড-শরীর বিরাট্ ব্রহ্ম। সাঙ্খ্যযোগাচার্য্য হরিহরানন্দ আরণ্য তাঁহার 'পাতঞ্জল যোগদর্শন' (৭৪) নামক গ্রন্থের ৬৪০ পৃষ্ঠায় আচার্য্য শঙ্করের স্বীকৃত উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে উক্ত চারিপ্রকার ব্রহ্মই অভিন্ন।

আমরা কিন্তু ব্রহ্মের এই প্রকার চাতুর্ব্বিধ্য স্বীকারের কোন প্রয়োজন দেখি না। বস্তুতঃ, নিত্যপদার্থের মধ্যে কোনরূপ প্রকারভেদ থাকা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, যদিও বা এইরূপ চাতুর্ব্বিধ্য স্বীকার করা হয়, তথাপি

---

(৭১) আত্মা খলু বিশ্বমূলম্‌···। মহার্থমঞ্জরী; শ্লোক—৩॥

(৭২) আত্মরূপো হি পরমেশ্বরঃ। —মহার্থমঞ্জরীর টীকা (৯ম শ্লোক)

(৭৩) উদ্যমো ভৈরবঃ।—শিবসূত্র ১।৫॥

(৭৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উল্লিখিত চারিটি প্রকারের একত্ব সম্ভব বলিয়া মনে করি না। যাহাই হউক, শঙ্করাচার্য্যের স্বীকৃত উল্লিখিত চারিপ্রকার ব্রহ্মের মধ্যে শব্দকে কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় কি না, আলোচনা করিয়া দেখি।

শব্দ নিরুপাধিক নহে ; কারণ, গো প্রভৃতি শব্দ হইতে অশ্ব প্রভৃতি শব্দের পার্থক্য অতি স্পষ্ট। তাহা ছাড়া শব্দ পুরুষও নহে। সুতরাং নিরুপাধিক পুরুষ অর্থে শব্দকে ব্রহ্ম বলা চলে না। শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট হওয়ায় তাহাকে নিত্যসত্ত্বোপাধিক ঈশ্বরও বলা সম্ভব নহে। "শব্দেষেবাশ্রিতা শক্তিঃ বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী" প্রভৃতি উক্তি যে কল্পনামাত্র তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট বলিয়াই তাহাকে অক্ষর বলা চলে না। বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দব্রহ্মবাদিগণ শব্দকে ব্রহ্ম (ক্লীবলিঙ্গ) বলিয়াছেন, ব্রহ্মা (পুংলিঙ্গ) বলেন নাই ; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের স্বীকৃত চতুর্থ অর্থেও শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

শব্দ বা শব্দতত্ত্বকে উল্লিখিত অর্থে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা সম্ভব না হইলেও অন্যভাবে তাহার ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। অভিধান বলেন—"বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম" অর্থাৎ বেদ, তত্ত্ব অথবা তপঃ অর্থেও ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ আছে। তত্ত্বশব্দের আবার অন্ততঃ দুইটি পৃথক্ অর্থ হইতে পারে ; যথা—(১) কোন পদার্থের যথার্থ স্বরূপ (তস্য ভাবঃ—তত্ত্বম্) এবং (২) সত্য (তত্ত্ব একটি রূঢ় শব্দ)। ভর্তৃহরির পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যদি আমরা ব্রহ্ম শব্দটিকে দ্বিতীয় তত্ত্ব অর্থে গ্রহণ করি, তাহা হইলে তাঁহার উক্তির সার্থকতা থাকে। এইরূপ করিলে 'শব্দতত্ত্ব ব্রহ্ম' এই অংশটুকুর অর্থ হইবে—শব্দের যে একটি যথার্থ স্বরূপ আছে, ইহা সত্য। ভর্তৃহরি যে এইরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' পদটির গ্রহণ করেন নাই, তাহা তাঁহার বিবিধ উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। টীকাকারেরা বা তাঁহার অনুগামী পরবর্ত্তী অন্যান্য আচার্য্যেরা কেহই ব্রহ্ম পদটিকে এইরূপ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের স্বীকৃত অর্থে ব্রহ্ম পদটিকে গ্রহণ করিলে ভর্তৃহরির বচনটি যে ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত

এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আমি বলিতে চাই যে, ব্রহ্ম শব্দটিকে 'তত্ত্ব' বা 'সত্য' অর্থে গ্রহণ করিলে ভর্তৃহরির উল্লিখিত শ্লোকটির সার্থকতা রক্ষা করিয়া শব্দতত্ত্ব বা শব্দের বাস্তব সূক্ষ্ম রূপটিকে বাস্তব অর্থেই ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ; অন্যথা নহে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ

শব্দদ্বারা আমরা অর্থ বুঝিয়া থাকি ; অতএব, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রসঙ্গতঃ অর্থের আলোচনাও আসিয়া পড়ে। শব্দনিত্যতা-বাদিগণের মতে অর্থও নিত্য ; কারণ, যে সময় হইতে বাচক শব্দের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতেই সে বাচ্য অর্থও বুঝাইতেছে।

শব্দ এবং অর্থের মধ্যে কেবলমাত্র একটি বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। শব্দ বাচক এবং অর্থ বাচ্য ; অর্থাৎ শব্দোচ্চারণের ফলে যে ক্ষেত্রে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই ক্ষেত্রে ঐ শব্দকে অর্থ-প্রতিপত্তির ( উৎপত্তির নহে ) কারণরূপে স্বীকার করার প্রয়োজন হয়। ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য, এবং প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তিসমূহদ্বারা এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে আমরা এই সম্বন্ধেও বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছি। বেদ, স্মৃতি বা পুরাণের এই মতের বিরুদ্ধে প্রায় কোন গ্রন্থেই বিশেষ কিছু বলা হয় নাই ; সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রের বচন উল্লেখ করিয়া আর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ

তন্ত্রশাস্ত্রের উক্তিসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উহাতেও উল্লিখিতপ্রকার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও যে শব্দকে অর্থের উৎপাদক কারণ মনে করা হয় নাই, বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। তন্ত্রশাস্ত্রে যে শব্দও অর্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা শ্রীমৃগেন্দ্র-তন্ত্রের ১।১।১২ শ্লোকের (১) উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত শ্লোকে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, ঘটশব্দ যদি ঘটপদার্থ হইতে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ঐ শব্দদ্বারাই জল ধারণ করা যাইতে পারিত। এইভাবে চন্দ্র শব্দের উচ্চারণ মাত্রই অমাবস্যা রজনীতেও আলোকের সৃষ্টি হইত। কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ হয় না ; অতএব বুঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থ অভিন্ন নহে।

তন্ত্র

(১) নাদন্তে ঘটশব্দোঽম্ভশ্চন্দ্রশব্দো ন রাজতে। —শ্রীমৃগেন্দ্রতন্ত্র ১।১।১২ ॥

পরাত্রিংশিকা নামক গ্রন্থের ২৪ শ শ্লোকটি দেখিয়া কেহ হয় তো ভুল বুঝিতে পারেন। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—বটবীজের মধ্যে যেমন বিশাল বটবৃক্ষ অবস্থান করে, তেমনি হৃদয়স্থ সূক্ষ্ম শব্দের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান (২)। এখানে কারিকাকারের অভিপ্রায় এই যে, হৃদয়স্থ সূক্ষ্ম শব্দ যখন রূপান্তরিত হইয়া শ্রব্য-শব্দরূপে আমাদের বদনপথে বহির্গত হয়, তখন তাদৃশ শব্দই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ বুঝাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই অন্যান্য তন্ত্রবাক্যের সহিত সমন্বয়-সাধন করা যায় এবং আমাদের অনুভবসিদ্ধ অর্থেরও উপলব্ধি হয়।

শব্দব্যতিরেকেও অর্থের উপস্থিতি, এবং অর্থের অনুপস্থিতিতেও শব্দের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধটিও নিত্য বা স্বাভাবিক নহে। আবার দেশভেদে শব্দের অর্থভেদ-দর্শনে বুঝা যায় যে, এই সম্বন্ধ বাস্তব নহে। বস্তুতঃ ইহাকে মনুষ্যসৃষ্ট একটি কাল্পনিক সম্বন্ধই বলা যাইতে পারে।

মীমাংসক-মতে কোন শব্দই নিরর্থক নহে; কাজেই তাঁহারা নিত্যশব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্থেরও নিত্যতা স্বীকার করিয়া শব্দার্থের সম্বন্ধেরও নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। নিত্যপদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধও নিত্য হওয়াই স্বাভাবিক—ইহাই মীমাংসকগণের অভিমত।

মীমাংসকেরা বেদের অবশ্য-প্রামাণ্য স্বীকার করেন। বেদ শব্দময়; অতএব, বেদার্থও শব্দার্থ হইতে অভিন্ন। শব্দের অর্থ অনিত্য হইলে বেদার্থও অনিত্য হইয়া পড়ে, এবং ফলে বেদার্থের অবশ্য-প্রামাণ্য ব্যাহত হয়। এই কারণে বেদের অবশ্য-প্রামাণ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মীমাংসক আচার্য্যগণ শব্দ, অর্থ এবং তদুভয়ের সম্বন্ধেরও নিত্যতা এবং অপৌরুষেয়তা প্রমাণের জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন (৩)।

**আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন**

আস্তিক-দর্শন-সমূহে সর্ব্বত্রই শব্দ ও অর্থের একটা না একটা সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। নাস্তিকদর্শন-সমূহে, বিশেষতঃ বৌদ্ধদর্শনে অর্থের সহিত শব্দের কোন সম্বন্ধ

(২) যথা ন্যগ্রোধবীজস্থঃ শক্তিরূপো মহাদ্রুমঃ।
তথা হৃদয়বীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্॥ —পরাত্রিংশিকা; কারিকা—২৪॥

(৩) পৌরুষেয়ে হি শব্দে যঃ প্রত্যয়স্তস্য মিথ্যাভাব আশঙ্ক্যেত। —শাবরভাষ্য (১।৫)
অপৌরুষেয়ঃ শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ। —ঐ

স্বীকার করা হয় নাই (৪)। নাস্তিকগণ যদিও এই সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের যুক্তিগুলি প্রবল না হওয়ায় তাঁহাদের সমর্থকের সংখ্যাও অতি অল্প। চিন্তানায়কগণ প্রায় সকলেই শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করেন বটে; কিন্তু এই সম্বন্ধের স্বরূপনির্ণয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

মীমাংসক মত

ন্যায়মত

বৈশেষিক মত

মীমাংসকগণের মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক (বোধ্য-বোধক) সম্বন্ধ বিদ্যমান, এবং এই সম্বন্ধ নিত্য। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণের মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সাময়িক বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। সময় শব্দটিকে তাঁহারা ঈশ্বর-সঙ্কেত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইয়াছে যে, একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছার সাহায্যেই শব্দ অর্থপ্রতিপাদন করে এবং এই অর্থ-প্রতিপাদন ব্যাপারে শব্দ বাচকরূপে এবং অর্থ বাচ্যরূপে গৃহীত হয়। নৈয়ায়িকেরা যেমন শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন না, তেমনি শব্দার্থের এই সাময়িক বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধকেও তাঁহারা নিত্য মনে করেন না (৫)।

সাঙ্খ্য এবং যোগদর্শনে শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত দুইটি দর্শনে এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের বাস্তব নিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই। সাঙ্খ্যসূত্রকার পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে শব্দ

সাঙ্খ্য ও যোগ

এবং অর্থ উভয়েই অনিত্য হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধেরও অনিত্যতাই স্বীকার্য্য (৭)। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে (সমাধিপাদ, ২৯ সূত্র) বলা হইয়াছে যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যেরূপ একটি সম্বন্ধ থাকে, শব্দ এবং অর্থের মধ্যেও তেমনি একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, ভাষ্যকার ব্যাসের মতে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বস্তুতঃ অনিত্য। তাহা ছাড়া ভাষ্যকার ব্যাস আগমবেত্তাদের মত হিসাবে এই সম্বন্ধেব প্রবাহ-

---

(৪) বস্তুতস্তু ন সম্বন্ধঃ শব্দস্যার্থেন বিদ্যতে। —তত্ত্বসংগ্রহ; শ্লোক—২৪৭০॥

(৫) ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও অর্থের যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নহে।

—মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (ন্যায়দর্শন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯১)।

(৬) বাচ্যবাচকলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ। —কপিলসূত্র ৫।৩৭॥

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। —যোগসূত্র, সমাধিপাদ; ২৭ সূত্র॥

(৭) ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ। —কপিলসূত্র ৫।৯৭॥

নিত্যতার উল্লেখ করিয়াছেন (৮), কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি—যোগভাষ্যকার ব্যাস শব্দার্থ-সম্বন্ধের প্রবাহ-নিত্যতা স্বীকার করেন ; কিন্তু ইহার বাস্তব নিত্যতা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

মহাত্মা বাচস্পতি মিশ্র 'আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু' (কারিকা—৫) এই অংশের ব্যাখ্যাকালে সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক গ্রন্থে বেদের বাস্তব-নিত্যতার অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আপ্ত-শ্রুতি শব্দটির ব্যাখ্যাকালে আপ্ত শব্দটিকে শ্রুতি পদের বিশেষণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শব্দ নিত্য হইলে তাহার অর্থও নিত্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু সাঙ্খ্যসূত্রকার স্বয়ং যে এই মত স্বীকার করিতেন না, তাহা কপিলসূত্রের ৫।৫৭ সূত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। মহাত্মা ঈশ্বরকৃষ্ণও তাঁহার সাঙ্খ্যকারিকা গ্রন্থে শব্দার্থের নিত্য সম্বন্ধের অনুকূলে কোন কথাই বলেন নাই। সুতরাং সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদীর উল্লিখিত যুক্তিটি দ্বারা সাঙ্খ্য-মত প্রকাশিত হইতেছে না। বাচস্পতি মিশ্র নিজেও সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি যুক্তিদীপিকা নামক গ্রন্থে উল্লিখিত 'আপ্তশ্রুতি' শব্দটির অন্যবিধ অর্থও প্রদর্শন করিয়াছেন। যুক্তিদীপিকাতে তিনি বলিয়াছেন যে, আপ্ত ব্যক্তির মুখ হইতে শ্রুত শ্রুতি অর্থেও আপ্তশ্রুতি শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা চলে। এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে আর শব্দ বা অর্থের নিত্যতা অথবা তাহাদের নিত্য-সম্বন্ধ স্বীকারের কোন প্রয়োজন হয় না।

বৈয়াকরণ-মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান। বৈয়াকরণেরাও এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করেন। বৈয়াকরণেরা বলেন—শব্দ নিজেই অর্থরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রোতৃগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। অবশ্য এই নিত্যতা ও আকৃতি-পরিবর্ত্তন যে ব্যাবহারিক, কিন্তু বাস্তব নহে, তাহাও বৈয়াকরণেরা বলিয়াছেন।

বৈয়াকরণ-মত

অন্য একদল মনীষী আবার শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শব্দ অর্থের কাছে অথবা অর্থ শব্দের কাছে

(৮) সম্প্রতিপত্তি-নিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।

—ব্যাসভাষ্য ( সমাধিপাদ, ২৭ সূত্র )

সম্প্রতিপত্তি=সদৃশ-ব্যবহারপরম্পরা। —হরিহরানন্দ আরণ্য।

উপস্থিত হইয়াই শব্দের অর্থবোধ জন্মায়। ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থসমূহে এই মতের উল্লেখক্রমে ইহার বিপক্ষে যুক্তি দেখানো হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, আর একটি মত এই যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্থাৎ, শব্দ কারণ এবং অর্থ কার্য্য। আচার্য্য ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়-গ্রন্থে এই মতটিরও উল্লেখ করিয়াছেন (৯)। এই মতে শব্দ উচ্চারিত হইয়া অর্থ প্রতিপাদন করে।

যাঁহারা বলেন—"শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই" এবং যাঁহাদের মতে "শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা মনুষ্যকৃতই হইবে", এই উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য শবরস্বামী শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধ প্রমাণে যত্নবান্ হইয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে আচার্য্য শবরস্বামী এই বিষয়ে প্রতিপক্ষের আপত্তিসমূহ একে একে উত্থাপন করিয়া প্রত্যেকটি আপত্তির বিপক্ষেই পৃথক্ পৃথক্ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রধান আপত্তিগুলি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ; যথা—

সম্বন্ধবাদ

(১) অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধই নাই ; কাজেই উক্ত সম্বন্ধ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়—এই বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক। অর্থের সহিত যদি শব্দের সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে, ক্ষুর শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্ষুর আসিয়া মুখ কাটিয়া ফেলিত। এইভাবে, মোদক শব্দ উচ্চারণ করিলে মোদকের দ্বারা মুখ পূর্ণ হইত। কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ হয় না ; অতএব, অর্থের সহিত শব্দের প্রাপ্তি বা তাদাত্ম্য কোন সম্বন্ধই নাই।

আপত্তি

(২) শব্দার্থের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, কোন শব্দ শ্রুত হইলেই সে শ্রোতাকে তাহার অর্থ বুঝাইবে। কিন্তু, কোন নূতন শব্দের প্রথম শ্রবণে শ্রোতার অর্থবোধ হয় না। অতএব, অর্থের সহিত শব্দের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধও নাই। তাহা ছাড়া, শব্দার্থের বোধ্য-বোধক-সম্বন্ধবাদী মীমাংসকদের মতে এই বোধ্য-বোধক সম্বন্ধটি স্বাভাবিক বা নিত্য। কিন্তু, বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই—চক্ষু যেমন আলোকের সাহায্য-ব্যতিরেকে বস্তু দর্শন করিতে পারে না ; শব্দও তেমনি

(৯) শব্দঃ কারণমর্থস্য স হি তেনোপজন্যতে।

—বাক্যপদীয়, তৃতীয় কাণ্ড, সম্বন্ধসমুদ্দেশ প্রকরণ ; শ্লোক—৩২।

উপদেশ ( advice ) ব্যতিরেকে অর্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না। শব্দার্থের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ থাকিলে এবং উহা নিত্য হইলে উপদেশ ব্যতিরেকেও যে কোন নূতন-শ্রুত শব্দ অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হইত।

(৩) শব্দ থাকে মুখে, আর অর্থ থাকে ভূমিতে; কাজেই তাহাদের সম্বন্ধ কোথায়? এতদ্‌ব্যতীত শব্দ ও অর্থের রূপভেদও প্রকট। গো শব্দের আকৃতি এবং তাহার প্রতিপাদ্য সাস্না-কম্বলাদি-যুক্ত জন্তুবিশেষের আকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। অতএব, ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধই দেখা যায় না।

(৪) অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ মনুষ্যকৃত নহে—একথা স্বীকার করিব কেন? বেদের রচয়িতারূপে কোন মানুষের নাম আমরা জানি না বটে; কিন্তু অজ্ঞাত লোকের কৃত বহু কর্ম্মও তো এ জগতে দেখা যায়। হিমালয়-পর্ব্বতে কূপ, উদ্যান ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়। এইগুলি দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে মনুষ্যের বসতি ছিল, এবং ঐ সকল মনুষ্যদ্বারাই উক্ত কূপ-খনন বা উদ্যান-প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এইরূপে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বেদেরও রচয়িতা এক বা একাধিক ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে তাঁহার বা তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৫) প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা বেদের রচয়িতা বা শব্দার্থের সম্বন্ধ-স্থাপনকারী কাহাকেও পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু অনুমান বা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা তো তাঁহাকে জানা যায়। "স্থূলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না" বলিলে অর্থাপত্তির সাহায্যে বুঝা যায় যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে. কারণ, ভোজন ব্যতিরেকে কেহ স্থূল হইতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুরা বয়স্কদের নিকট হইতে না জানিলে কোন শব্দেরই অর্থ বুঝিতে পারে না; আবার উক্ত বয়স্ক ব্যক্তিরাও তাঁহাদের শৈশবকালে অন্য বয়স্ক লোকদের নিকট হইতে শব্দার্থ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং কাহারও উপদেশ ( advice ) ব্যতিরেকে যখন শব্দার্থ অবগত হওয়া যায় না, তখন অবশ্যই শব্দার্থের সম্বন্ধ-স্থাপনকারী কেহ এক সময়ে ছিলেন—ইহা আমরা অর্থাপত্তি বা অনুমানের সাহায্যে জানিতে পারি।

উল্লিখিত আপত্তিগুলির উত্তরে মীমাংসকেরা অধঃস্থ যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যথাক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে—

মীমাংসকদের যুক্তি

(১) শব্দের সহিত অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিলেই শব্দ উচ্চারণে অর্থ আসিয়া মুখে উপস্থিত হওয়ার বিষয় উপস্থিত হয়; কিন্তু মীমাংসকেরা তাদৃশ সম্বন্ধের কথা বলেন নাই। তাঁহারা শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহা ব্যপদেশ্য-ব্যপদেশিরূপ অথবা প্রত্যায্য-প্রত্যায়করূপ। অর্থাৎ, কোন শব্দের উচ্চারণে উহার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া সেই বস্তুটি মুখে আসিয়া উঠে না।

(২) কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে প্রথমশ্রুত শব্দও অর্থ বুঝাইতে পারে। চক্ষুর দর্শন করিবার ক্ষমতা স্বভাবতঃই আছে; কিন্তু অন্ধকার তাহার দৃষ্টিশক্তির বাধক হয় বলিয়াই অন্ধকারে দেখা যায় না। অন্ধকার যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি শ্রোতার অজ্ঞানতা শব্দের অর্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়। এই অজ্ঞানরূপ আবরণ উন্মোচন করিলেই প্রথমশ্রুত শব্দও অর্থ বুঝাইতে পারে। আলোক যেমন অন্ধকার দূরীভূত করিয়া চক্ষুর দর্শনকার্য্যে সহায়তা করে, উপদেশ( advice )ও তেমনি অজ্ঞানরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া অর্থবোধে সাহায্য করিয়া থাকে।

(৩) শব্দার্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই মুখে উচ্চারিত শব্দদ্বারা ভূমিস্থিত অর্থ প্রতিপাদনের আপত্তি উঠিতে পারে; কিন্তু বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলে আর এই আপত্তি উঠে না। মীমাংসকেরা যে শব্দ ও অর্থের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধই স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শব্দ এবং অর্থের মধ্যে রূপভেদও নাই। উপবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যেরাও বলিয়া গিয়াছেন যে, গকারাদি বর্ণগুলিই গোপদার্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। গোশব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মানসপটে গো জন্তুটির একটি চিত্র প্রতিফলিত হয় এবং গকারাদি-বর্ণ-গঠিত গোশব্দটিই ঐরূপ চিত্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে (১০)।

(৪) কূপ প্রভৃতির সঙ্গে শব্দের তুলনা করা চলে না। দেশ বা বংশের বিলোপ হইলেও কূপাদি থাকিতে পারে বটে; কিন্তু সেই কূপদ্বারা মনুষ্যের

---

(১০) অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবানুপবর্ষঃ।

—শাবরভাষ্য (১।৫)

এবং শব্দস্বরূপং কিমিতি পৃষ্টা সিদ্ধান্তী বৃদ্ধসম্মতিপ্রদর্শনপূর্ব্বকং স্বমতেন গকারাদিবর্ণা এব শব্দস্বরূপমিত্যাহ—গকারেত্যাদিনা। উপবর্ষগ্রহণং নাস্য পরমতত্ব-জ্ঞাপনায়, কিন্তু বৃদ্ধসম্মতি-প্রদর্শনায়েতি বেদিতব্যম্। —ঐ, প্রভাটীকা (বৈদ্যনাথশাস্ত্রিকৃত শাবরভাষ্যটীকা)।

প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অপরপক্ষে শব্দ অনাদিকাল হইতেই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া একই ভাবে মনুষ্যের প্রয়োজন-সিদ্ধি করিয়া আসিতেছে। কূপ যেমন জীর্ণ ও জলহীন হয়, শব্দ সেইরূপ জীর্ণ বা অর্থহীন হয় না। অতএব, এতদুভয়ের উপমান-উপমেয়ভাব অসম্ভব।

(৫) অনুমান বা অর্থাপত্তি সকল সময়ে নির্ভুল হয় না। দূরবর্ত্তী স্থানে ধূম দেখিলে যেমন অনুমানের সাহায্যে তথায় অগ্নির অস্তিত্ব জানা যায়, তেমনি কুণ্ডলাকারে উত্থিত ধূলি দেখিয়াও উক্ত ধূলিকে ধূম মনে করিয়া তথায় অগ্নির অস্তিত্বের মিথ্যা অনুমান হইতে দেখা যায়। অর্থাপত্তিলব্ধ জ্ঞানও অনেক সময়ে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'মূষিক দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে' বলিলে অর্থাপত্তির সাহায্যে বুঝা যায় যে, দণ্ডস্থিত অপূপাদিও মূষিক-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময়ে দণ্ড ভক্ষিত হইলেও যত্নে আবৃত অপূপাদি অভক্ষিতই থাকে। সুতরাং, অনুমান এবং অর্থাপত্তিকে নির্ভুল প্রমাণ মনে করা চলে না।

শিশুরা বৃদ্ধদের নিকট হইতে শব্দের অর্থ অবগত হয় সত্য, কিন্তু কেহই সম্বন্ধ-স্থাপনকারীর নিকট হইতে ইহা অবগত হয় না। অতএব, যখন উক্ত সম্বন্ধের স্থাপয়িতা কোন ব্যক্তির কথা জানা যায় না, তখন এই সম্বন্ধ অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধ বলিয়া ইহাকে অপৌরুষেয়ই বলিতে হইবে (১১)।

নৈয়ায়িকেরা সুদীর্ঘ আলোচনাদ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। শব্দার্থের সম্বন্ধ যে নিত্য বা স্বাভাবিক নহে, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তাৎপর্য্য টীকাকার মহামতি বাচস্পতি মিশ্র কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন—শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি তাদাত্ম্য, প্রাপ্তি অথবা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেই উক্ত সম্বন্ধ স্বাভাবিক বা নিত্য হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ উল্লিখিত কোন সম্বন্ধই যে শব্দও অর্থের মধ্যে নাই, তাহা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষসূত্রে 'অব্যপদেশ্য' শব্দটি গ্রহণ করিয়া মহর্ষি গৌতম নিজেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে তাদাত্ম্য বা অবিনাভাব-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র 'তাৎপর্য্য'

নৈয়ায়িকদের যুক্তি

(১১) দৃষ্টা হি বালা বৃদ্ধেভ্যঃ প্রতিপদ্যমানাঃ। ন চ প্রতিপন্ন-সম্বন্ধাঃ সম্বন্ধস্য কর্ত্তুঃ। তস্মাদ্ বৈষম্যম্। —শাবরভাষ্য (১৫)।

টীকায় মহর্ষির এই অভিপ্রায় স্পষ্টভাষায়ই প্রকাশ করিয়াছেন (১২) এবং পণ্ডিত-প্রবর ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ও তাঁহার ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যায় (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২—১০৪) পরিষ্কার ভাষায়ই ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ন্যায়মতে বেদবাক্য পৌরুষেয় আর মীমাংসকমতে উহা অপৌরুষেয়। এই সম্বন্ধে উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

আলোচনা

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার কবিয়া 'শব্দার্থের সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃত' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকদের রীতি অনুসারে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রয়াসী নহেন। এই জন্য তাঁহারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও শব্দার্থসম্বন্ধ সঙ্কেতকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণ "বেদঃ পৌরুষেয়ঃ বাক্যত্বাদ্ ভারতাদিবাক্যবৎ" এইরূপ অনুমান দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। বস্তুতঃ এইরূপ অনুমান সোপাধিক বলিয়া দুষ্ট। এই অনুমানে স্মর্য্যমাণ কর্ত্তৃকত্বই উপাধি। এই কর্ত্তৃকত্ব উপাধির দৃষ্টান্ত ভারতাদিবাক্যে আছে বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে, এবং পক্ষীকৃত বেদবাক্যে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং পৌরুষেয়-বাক্যত্বের ব্যাপক যে স্মর্য্যমাণ কর্ত্তৃকত্ব, তাহা বেদে নাই বলিয়া বেদের পৌরুষেয়ত্বও নাই।

কথাটাকে অন্যভাবে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ যেদিন রচিত হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই ঐ সকল গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রচয়িতার নামও জনসমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমরা সকলেই জানি—রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি, মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস এবং রঘুবংশের রচয়িতা কালিদাস। কিন্তু বেদের কোন রচয়িতা আছেন বলিয়া আমরা জানি না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতাদি-বাক্যের রচয়িতার স্মরণ হওয়ায় এবং বেদবাক্যের রচয়িতার স্মরণ না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সমান-ধর্ম্ম নাই। সমানধর্ম্মরহিত বস্তুদ্বয়ের উপমান-উপমেয় ভাব হইতে পারে না; সুতরাং নৈয়ায়িকেরা 'ভারতাদিবাক্যবৎ'

---

(১২) তথা চাহুঃ—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গম্যতে॥"...তদস্য নিরাকরণং লক্ষণগতেন আলোচনজ্ঞানাবরোধার্থে নাব্যপদেশ্যপদেন সূচিতমিতি। —তাৎপর্য্যটীকা।

কথাটি দ্বারা ভারতাদি-বাক্যের সঙ্গে বেদবাক্যের যে উপমান-উপমেয়ভাব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

নৈয়ায়িকদের উক্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, স্মর্য্যমাণ কর্ত্তৃকত্ব পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপক নহে; কারণ, "যাহা যাহা পৌরুষেয়, তাহারা সকলেই স্মর্য্যমাণ-কর্ত্তৃক" এইরূপ ব্যাপ্তি জীর্ণ-কূপারামাদিতে ব্যভিচারী। অতি প্রাচীন অব্যবহার্য্য কূপ বা দীঘির খনন-কারীর পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের অজ্ঞাত থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু ইহারা নিশ্চয়ই অপৌরুষেয় নহে। সুতরাং বেদের রচয়িতার পবিচয় জানা না থাকিলেও, এই কারণে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিব কেন? —এইরূপ কথা প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, জীর্ণ কূপ প্রভৃতির কর্ত্তা এবং বেদের কর্ত্তা একপ্রকার নহে। জীর্ণ কূপাদির খননকারী কে ছিলেন—এই সংবাদ জানা বা না জানা দ্বারা জনসাধারণের কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না; কিন্তু বেদের যদি বস্তুতঃ কোন রচয়িতা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিচয় জানা না থাকিলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীদের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। বেদ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা বিশেষ ব্যক্তিগণের রচিত হইত, তাহা হইলে উক্ত বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের প্রামাণ্য দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইত। অর্থাৎ বেদের রচয়িতা যদি আপ্ত হন, কেবলমাত্র তাহা হইলেই তাঁহার কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু তিনি ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত হইলে তাঁহার বাক্য স্বীকার্য্য নহে—এইরূপ বুদ্ধিবশতঃ বেদের রচয়িতার পরিচয় জানা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি কার্য্য বেদের বিধান অনুসারে সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেন না। আবহমান কাল হইতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। বেদের রচয়িতা কেহ থাকিলে, বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার পরিচয় জানা বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীদেরও একান্ত প্রয়োজন হইত। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মীমাংসকগণ "বেদঃ অপৌরুষেয়ঃ স্মরণযোগ্যত্বে সতি অস্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্বাদ্ গগনাদিবৎ" এইরূপ অনুমানের দ্বারা বেদের অপৌরু-ষেয়ত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন।

মীমাংসকদের উল্লিখিত যুক্তিদ্বারা নৈয়ায়িকদের প্রাক্তন যুক্তি খণ্ডিত হয় বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা বেদের বাস্তব অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

মীমাংসকেরা এই প্রসঙ্গে উপমানরূপে যে গগন শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও বস্তুতঃ অনিত্য। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে গগনের উৎপত্তি ও বিনাশের উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা অস্মর্য্যমাণ-কর্ত্তৃকত্ব হেতু বেদবাক্য সমূহের প্রবাহ-নিত্যতা-স্বীকারের পক্ষপাতী, বাস্তব নিত্যতার পক্ষপাতী নহি। অবশ্য মীমাংসকেরা এইরূপ প্রবাহ-নিত্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; আমরা আমাদের নিজের মত হিসাবেই ইহা বলিলাম।

বেদবাক্য-সমূহের বাস্তব নিত্যতা না থাকিলেও তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকারে যে ত্রৈবর্ণিকেরা কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না, ইহার কারণ, উল্লিখিত বিধানসমূহ তাঁহারা পিতৃপুরুষ পরম্পরায় পালন করিতে অভ্যস্ত। আমাদের পিতৃপিতামহেরা যে সকল নিয়ম পালন করেন, আমরাও স্বভাবতঃই সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া থাকি; তাহা ভাল কি মন্দ এই সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করি না। যাহারা বেদ মানে না, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ পিতৃপিতামহাগত নিয়মাবলী পালিত হইতে দেখা যায়। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দেশাচারও শাস্ত্রের সমান মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে।

নৈয়ায়িকেরা যে শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের স্বীকৃত সঙ্কেতই ইহার প্রমাণ। তাদাত্ম্যসম্বন্ধবাদী বৈয়াকরণগণও যে শব্দ

তাদাত্ম্য

ও অর্থের বাস্তব তাদাত্ম্য স্বীকার করেন না, বাক্যপদীয়, লঘুমঞ্জুষা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ ভেদ থাকা সত্ত্বেও শব্দ এবং অর্থের মধ্যে একটা কাল্পনিক অভেদ-প্রতীতি হইয়া থাকে—এই কথাটুকু মাত্র বুঝাইবার জন্যই বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন (১৩)।

শব্দ ও অর্থ যে বস্তুতঃ ভিন্ন, আমাদের অনুভবও এই বিষয়ের সাক্ষী। শব্দকে আমরা কর্ণদ্বারা শুনিয়া থাকি, অতএব ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু অর্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি শব্দ আমরা শুনিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাদের বাচ্য অর্থগুলিকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই গ্রহণ করিতে পারি না।

---

(১৩) তাদাত্ম্যমুপগম্যৈব শব্দার্থস্য প্রকাশকাঃ। —বাক্যপদীয়; ব্রহ্মকাণ্ড; শ্লোক—১৫১।
তাদাত্ম্যঞ্চ তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদভেদেন প্রতীয়মানত্বম্।
—লঘুমঞ্জুষা (চৌখাম্বা), পৃষ্ঠা ৩৮।

ইহাদিগকে কেবলমাত্র মনোদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। অতএব, এইরূপে প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ পরোক্ষ থাকে দেখিয়া শব্দ হইতে অর্থের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

বস্তু অর্থে অর্থ শব্দটিকে গ্রহণ করিলেও শব্দার্থের অভিন্নতা কল্পনা করা সম্ভব হইবে না। অশ্ব শব্দের গ্রহণ হয় কর্ণদ্বারা, আর তাহার বাচ্য অশ্ব নামক জন্তুটিকে দেখা যায় চক্ষুর্দ্বারা; অতএব, শব্দ ও অর্থ উভয়ে একেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হওয়ায় তাহাদের একত্ব কল্পনা সম্ভব নহে।

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রতিকূলে মহর্ষি বাৎস্যায়ন বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি বাৎস্যায়ন বলেন—শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধ অতীন্দ্রিয়ই হইবে। ঐরূপ অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধ বাচ্য-বাচক ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মহর্ষি বাৎস্যায়ন মনে করেন না। তিনি বলেন—শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রাপ্তি-সম্বন্ধ থাকিলে তাহা অবশ্যই, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান অথবা শব্দ—এই প্রমাণ-চতুষ্টয়ের যে কোন একটির দ্বারা উপলব্ধ হইত; কিন্তু বস্তুতঃ উল্লিখিত কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দার্থের এইরূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না।

প্রাপ্তি

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এই বিষয়ে বাৎস্যায়নের যুক্তি এই যে, একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়, কেবলমাত্র তাহারাই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। দুইটি অঙ্গুলির সংযোগ ও বিয়োগ আমরা একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিয়া থাকি; এই কারণে ইহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ এবং বিয়োগও এইরূপে একই চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা দেখা যায় বলিয়াই উহা প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য। অপর পক্ষে, বায়ু এবং বৃক্ষের প্রাপ্তি বা সংযোগ এক ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝা যায় না; এই কারণে ইহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে; ইহা অতীন্দ্রিয়। শব্দ শোনা যায় কর্ণদ্বারা, কিন্তু তাহার অর্থ দেখা যায় চক্ষুর্দ্বারা; অতএব, শব্দ ও অর্থ উভয়েই এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় ইহাদের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে।

প্রত্যক্ষ

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উপলব্ধ হয় না; এই কথা বুঝাইবার জন্য নৈয়ায়িকেরা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; যথা—

অনুমান

উল্লিখিত সম্বন্ধের অনুমানগ্রাহ্যতা স্বীকার করিতে হইলে নিম্নলিখিত পক্ষত্রয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে স্বীকার করা আবশ্যক—

(১) শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, (২) অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, অথবা (৩) শব্দ ও অর্থ উভয়েই উভয়ের নিকট থাকে।

(১) শব্দ উচ্চারিত হয় মুখে; অতএব, যদি শব্দের নিকটে অর্থ থাকিত, তাহা হইলে অন্নশব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ন নামক পদার্থ আসিয়া মুখে উপস্থিত হইত। এইভাবে, অগ্নিশব্দ উচ্চারণ করিলে অগ্নিপদার্থ আসিয়া মুখ পোড়াইয়া দিত এবং অসিশব্দ উচ্চারণমাত্র অসি নামক দ্রব্যটি আসিয়া মুখ কাটিয়া ফেলিত। কিন্তু, বস্তুতঃ ইহাদের কোনটিই হয় না; অতএব, শব্দের নিকটে অর্থ থাকে না।

(২) অর্থের নিকটে যে শব্দ থাকে না, তাহাও আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। ভূমিতে থালার মধ্যে যখন অন্ননামক পদার্থ থাকে, তখনও তাহার বোধক 'অন্ন' শব্দ ব্যক্তি-বিশেষের মুখেই উচ্চারিত হয়। উক্ত শব্দ কখনও থালাস্থিত অন্নের মধ্যে যায় না। অগ্নি প্রভৃতি শব্দও তেমনি উচ্চারণকারী ব্যক্তির মুখেই থাকে; কিন্তু তাহার বাচ্য পদার্থ থাকে ভূমি প্রভৃতিতে। অতএব, দ্বিতীয় পক্ষও সমর্থন করা চলে না।

(৩) যে হেতু শব্দের নিকটে অর্থ থাকে না, এবং অর্থের নিকটেও শব্দ থাকে না; সুতরাং উভয়েই উভয়ের নিকটে থাকে—একথাও কিছুতেই বলা চলে না।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান প্রমাণের দ্বারাও গ্রাহ্য নহে।

বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিমাত্র প্রমাণ। অতএব, ইহাদের কোনটিদ্বারাই শব্দার্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ উপলব্ধ না হওয়ায়, উক্ত সম্বন্ধ নাই—এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে।

উপমান

নৈয়ায়িকেরা উপমান এবং শব্দ নামে অপর দুইটি প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু শব্দার্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের গ্রহণে ইহাদের কোনটির সহায়তা সম্ভব নহে। উপমান-উপমেয় ভাব না থাকিলে উপমান-প্রমাণ কার্য্য করিতে পারে না। শব্দার্থের প্রাপ্তিসম্বন্ধ-বোধনে উপমান বা উপমেয় না থাকায় উপমান-প্রমাণ এখানে

উপলব্ধি-সাধনে অক্ষম। শব্দ নিজেই নিজেকে বুঝাইতে পারে না বলিয়া শব্দপ্রমাণও এক্ষেত্রে প্রাপ্তি-সম্বন্ধ প্রমাণে সমর্থ হয় না।

শব্দ

যদি বলা হয় যে, অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে না, কিন্তু উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিবেন—শব্দার্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধবাদী শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকেরা এই কথা বলিতে পারেন না। শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সে উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে?

নৈয়ায়িকেরা বলেন—যে যুক্তিতে শব্দার্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া জানা গেল; সেই যুক্তিতেই তাহাদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধও নাই বলিয়া জানা যায়। এইরূপে ইহাদের ব্যাপ্য-ব্যাপক প্রভৃতি অন্য কোন সম্বন্ধই নাই। একমাত্র বাচ্য-বাচক সম্বন্ধই শব্দ ও অর্থের মধ্যে বিদ্যমান।

প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক এবং বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের মধ্যে পার্থক্য কি—তাহাও এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ বলিতে নৈয়ায়িকেরা স্বাভাবিক বাচ্য-বাচক সম্বন্ধকে বুঝেন, কিন্তু বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বলিতে বুঝেন—সময়-(ঈশ্বরেচ্ছা)কৃত তাদৃশ সম্বন্ধকে। এই কারণেই শব্দার্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের সাময়িকতা স্বীকার করিয়া তাঁহারা ইহার স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছেন।

বাচ্য ও প্রতিপাদ্য

মীমাংসকেরা মনে করেন—শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণদ্বারা বুঝা যায়। তাঁহারা বলেন—যদি শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে যে কোন শব্দদ্বারা যে কোন অর্থ বুঝা যাইত; কিন্তু তাহা হয় না। শব্দবিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষই বুঝা যায়। অতএব, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল বিশেষ অর্থের সঙ্গে উক্ত বিশেষ শব্দসমূহের সম্বন্ধ আছে। এইরূপে মীমাংসক-মতে উক্ত সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক সম্বন্ধ

নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকেরা এই যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—বিশেষ শব্দ যে বিশেষ অর্থকে বুঝায়, তাহার কারণ—ঈশ্বরেচ্ছা বা

সঙ্কেত। কাজেই, উল্লিখিত কারণে অর্থের সহিত শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—এরূপ স্বীকার করা অনাবশ্যক (১৪)।

নৈয়ায়িকদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি উঠিতে পারে যে, শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে ব্যাকরণশাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। ঈশ্বরেচ্ছাই যদি শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে হেতু হয়, তাহা হইলে কোন শব্দকেই সাধু বা কোন শব্দকেই অসাধু বলা যায় না; কারণ সকল শব্দই ঈশ্বরেচ্ছা অনুসারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বরেচ্ছা-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন—শব্দের 'সময়' বা সঙ্কেতের পরিপালনের জন্যই ব্যাকরণশাস্ত্র রচিত হইয়াছে; এবং উক্ত উদ্দেশ্যেই তাহা পঠিত হইয়া থাকে; অতএব, সঙ্কেতবাদীদের মতেও ব্যাকরণশাস্ত্র নিরর্থক নহে।

ব্যাকরণের সার্থকতা

শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধের বিপক্ষে নৈয়ায়িকেরা একটি সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন—শব্দার্থের সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক শব্দ সকল দেশে, সকল কালে এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থমাত্রই বুঝাইত। বস্তুতঃ দেশ, কাল ও শ্রোতৃভেদে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই সম্বন্ধে উদাহরণরূপে কতকগুলি শব্দও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আর্য্যগণ দীর্ঘশূক (যব) অর্থে 'যব' শব্দ প্রয়োগ করেন; কিন্তু ম্লেচ্ছগণ কঙ্গু অর্থে যব শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঋষিগণ নবসংখ্যক স্তোত্রীয় মন্ত্রবিশেষ অর্থে 'ত্রিবৃৎ' শব্দের প্রয়োগ করেন, কিন্তু আর্য্যগণ লতাবিশেষ (তেউড়ী) অর্থে উহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

বাচস্পতিমিশ্রের উদাহরণ

বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট 'ন্যায়কন্দলী' নামক গ্রন্থে বিশেষ বিচারদ্বারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়া নৈয়ায়িকদের মত শব্দসঙ্কেতেরই সমর্থন করিয়াছেন। দেশভেদে শব্দের অর্থভেদ প্রদর্শন প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দেখাইয়াছেন যে, 'চৌর' শব্দের দ্বারা দাক্ষিণাত্যগণ ভক্ত (ভাত) বুঝেন; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ উহার

শ্রীধর ভট্টের মত

(১৪) ন, সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য।—গৌতমসূত্র ২।১।৫৫॥
সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ। কণাদসূত্র ৭।২।২০॥

যাঁরা তস্কর বুঝেন। জয়ন্তভট্টও ন্যায়মঞ্জরীতে এই সম্বন্ধে ন্যায়মত সমর্থনপূর্ব্বক চৌর শব্দটিকে উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

জয়ন্তভট্টের মত

বৈশেষিকদর্শনের মূল ও টীকাগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈশেষিকমতে শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এই সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের একটি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মহর্ষি কণাদকে শব্দার্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধবাদী নামে অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন (১৫)। কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র উল্লিখিত স্থলে মহর্ষি কণাদ বা অন্য কোন বৈশেষিকের নাম উল্লেখ না করায় এবং বৈশেষিকদের গ্রন্থসমূহে সর্ব্বত্র ইহার বিপরীত উক্তি থাকায় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ৺তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই অনুমান সত্য নহে। বাচস্পতিমিশ্র যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হয় তো তিনি অধুনা-লুপ্ত কোন গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ যদি কোনদিন পাওয়া যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত মতের প্রতিষ্ঠাতারও সংবাদ জানা যাইবে। কিন্তু, সেই গ্রন্থখানা না পাওয়ার জন্যই মহর্ষি কণাদের মত লোকের উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা সঙ্গত হইতে পারে না।

তর্কবাগীশের মত

---

(১৫) বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধরভট্ট "ন্যায়কন্দলী"তে বিশেষ বিচারদ্বারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ খণ্ডন পূর্ব্বক গোতমোক্ত প্রকারে পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসঙ্কেতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও মীমাংসক ও বৈয়াকরণদিগকেই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, সুতরাং শব্দ অনুমান-প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে শব্দ ও অর্থের যে স্বাভাবিক-সম্বন্ধ কথন, তাহা অযুক্ত। শব্দ অনুমান-প্রমাণ, ইহা কিন্তু শব্দার্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধবাদী মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ সিদ্ধ করিতে যান নাই। ঐ পূর্ব্বপক্ষবাদী কাহারা? ইহাও তাৎপর্য্য টীকাকার প্রভৃতি বলেন নাই। মহর্ষি কণাদ ভিন্ন আর কোন ঋষি যে শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার পূর্ব্বক শব্দকে অনুমান-প্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন ইহাও পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে মহর্ষি কণাদই শব্দার্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ পক্ষ খণ্ডন করিলেও মহর্ষি কণাদের উহা সিদ্ধান্তই ছিল, ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে।

—ন্যায়দর্শন ( মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; পৃষ্ঠা—৩৭০ ।

## জয়ন্ত ভট্টের যুক্তি

শব্দার্থের সম্বন্ধ-নিত্যতার বিপক্ষে আচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়-মঞ্জরী নামক গ্রন্থে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার আলোচনার সার সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল (১৬)। যথা—

শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধ কোন প্রমাণের দ্বারা উপপন্ন হয় না। আমরা কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করি এবং নেত্রদ্বারা অর্থ দর্শন করিয়া থাকি; কাজেই শব্দ ও অর্থ উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতএব প্রত্যক্ষ। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এইরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হওয়ায় প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। এইভাবে উক্ত সম্বন্ধ যে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারাও গ্রাহ্য নহে, তাহাও নৈয়ায়িকগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, শব্দ ও অর্থের কোন নিত্যসম্বন্ধ নাই।

শব্দের মধ্যে যে অর্থপ্রতিপাদন-সামর্থ্যরূপ শক্তি আছে, তাহার সম্বন্ধ নাম দিয়া উক্ত সম্বন্ধের নিত্যতাও প্রমাণ করা যায় না; কারণ, শক্তি ও সম্বন্ধ

**শক্তি ও সম্বন্ধ**

সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সে কেবল শব্দকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবে; অর্থের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। তাহা ছাড়া এবংবিধ কোন শক্তি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, এবং অনুমান প্রভৃতি অপর প্রমাণের সাহায্যেও তাহাকে অবগত হওয়া যায় না। শক্তি অনুমান-প্রমাণদ্বারা গ্রাহ্য নহে; কারণ, অন্য উপায়েও কার্য্যসমূহ সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়।

**শক্তি ও সময়**

অধিকন্তু, শক্তি স্বীকার করিলেও শক্তিকল্পনার পর পুনরায় সময়ের স্বীকৃতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সময়-ব্যতিরেকে অর্থ-প্রতিপত্তি সিদ্ধ হয় না। সময় সিদ্ধ হইলে তাহা হইতেই অর্থ-সিদ্ধি হওয়ায় নিত্য-সম্বন্ধের কল্পনা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে।

যাঁহারা বলেন—সময়ের ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতাহেতু এবং ইচ্ছার গতি অপ্রতিহত হওয়ায় বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের ব্যত্যয় হউক, তাঁহাদের উক্তিও যুক্তিবিরুদ্ধ। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরেচ্ছারূপ সময়ের গতির কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকায়, শব্দ যেমন অর্থের বাচক হয়, অর্থও তেমনি

---

(১৬) ন্যায়মঞ্জরী (চৌখাম্বা ১৯৩৬ ইং) পৃষ্ঠা—২২২...

শব্দের বাচক হউক। বস্তুতঃ, অর্থ-প্রকাশ-সামর্থ্যরূপ যোগ্যতা কেবলমাত্র শব্দেই থাকিতে পারে, অর্থে তাহার থাকা সম্ভব নহে। উক্ত যোগ্যতা বলিতে নৈয়ায়িকেরা ক্রমবিশেষের দ্বারা উপকৃত গত্বাদি জাতির যোগকেই বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ, গ এবং ও এই বর্ণদ্বয়ের মিলনই উক্ত যোগ্যতা নামে অভিহিত হইয়াছে। অর্থের মধ্যে এই যোগ্যতা না থাকায় অর্থ বাচক হইতে পারে না।

শক্তি ও যোগ্যতা

বীরণসমূহদ্বারা পট বা তন্তুনিচয়ের দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মিত হয়; সুতরাং বীরণে পটনির্ম্মাণের এবং তন্তুতে বস্ত্রনির্ম্মাণের যোগ্যতা আছে। এই যোগ্যতাকে কেহই শক্তি বলেন না; এবং উক্ত বীরণ বা তন্তুতে অন্যবিধ কোন শক্তি আছে বলিয়াও কেহ স্বীকার করেন না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পটনির্ম্মাণে বীরণের এবং বস্ত্রনির্ম্মাণে তন্তুর ন্যায় অর্থপ্রকাশে শব্দের যোগ্যতাই আছে; অর্থপ্রকাশের জন্য শব্দের কোনরূপ শক্তিকল্পনা অনাবশ্যক। সুতরাং শব্দার্থের কোন সম্বন্ধ থাকিলেও তাহাকে শক্তি বলা অযৌক্তিক।

শব্দার্থের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিসম্বন্ধও প্রমাণ করা যায় না। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধস্থলে 'ধূম অগ্নিব্যতিরেকে থাকে না' এইরূপ প্রতীয়মান হইয়াই সম্বন্ধ প্রতীত হয়; কিন্তু এখানে 'ইহা হইতে ইহার প্রতীতি হয়' এইমাত্র ব্যুৎপত্তি আছে। অতএব, এখানে অবগতি-পূর্ব্বক অবগতি হওয়ায় অনুমান হইতে শব্দের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা সময়ের সাহায্যেই করিয়া থাকে; সুতরাং শব্দের এই অর্থপ্রকাশ-ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। তাহা ছাড়া শব্দের অর্থ-প্রকাশ-সামর্থ্য ব্যুৎপত্তির অধীন—এই কারণেও তাহাকে স্বাভাবিক বলা চলে না।

অনুমান ও ব্যুৎপত্তি

অন্যেরা বলেন—শব্দ যে প্রত্যায়ক, তাহা প্রত্যয় দেখিয়াই জানি। কেবল প্রথম শ্রবণেই নহে, কিন্তু যতবার শুনিয়া জানা যায় যে, ইহা সংজ্ঞা এবং ইহা সংজ্ঞী, ততবারই শ্রুত শব্দ হইতে অর্থের অবগতি হয়। বস্তুতঃ ইঁহাদের দ্বারাও সময়ের উপযোগের কথাই স্বীকৃত হইয়াছে। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধকে সময়ই বলা হয়, এবং এই সময়ের উপযোগ ব্যতিরেকে অর্থবোধ না হওয়ায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করা অযৌক্তিক।

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী

যাঁহারা বলেন—সময় জ্ঞানাত্মক বলিয়া সে আত্মাতেই থাকে; শব্দে বা অর্থে থাকে না; তাঁহাদের দ্বারাও নৈয়ায়িক-মত খণ্ডিত হয় নাই। কারণ, নৈয়ায়িকেরা শব্দ ও অর্থকে সময়ের আশ্রয় বলেন নাই; তাহার বিষয় বলিয়াছেন। সময়ের জ্ঞানাত্মকতা স্বীকার করিলেও তাহার শব্দবিষয়তা বা অর্থবিষয়তা ব্যাহত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

আশ্রয় ও বিষয়

যাঁহারা বলেন—সময়মাত্রের শরণাপন্ন হইলে শব্দ দণ্ডাদির স্থলবর্ত্তী হওয়ায় 'শব্দ হইতে অর্থের উপলব্ধি হয়' এইরূপ বলা চলে না; তাঁহাদের কথাও অযৌক্তিক। উল্লিখিত মতবাদীদের অভিপ্রায় এই যে, দণ্ডকে কেহ চালনা না করিলে যেমন দণ্ড কাহাকেও আঘাত করিতে পারে না, সময়বাদীদের মতে শব্দও তেমনি সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে অর্থপ্রকাশ করিতে পারে না; সুতরাং অর্থ-প্রতিপাদনে শব্দ কারণ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে 'শব্দ হইতে অর্থের উপলব্ধি হয়' এইরূপ না বলিয়া, বলিতে হয় যে, শব্দ দ্বারা অর্থ প্রতিপাদন করা হয়। কিন্তু সকলেই 'শব্দ হইতে অর্থের উপলব্ধি হয়' এইরূপই বলিয়া থাকেন। অতএব, সময়-স্বীকার লোক-ব্যবহারবিরুদ্ধ।

সংশয়

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে নৈয়ায়িকদের যুক্তি এই যে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও তো এই দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। শব্দার্থের স্বাভাবিক-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অন্যত্রও স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; এবং তাহা হইলে "শক্তি হইতে অগ্নির উপলব্ধি হয়; ধূম হইতে নহে" এইরূপ বলিতে হয়; কিন্তু কেহই এইরূপ বলেন না। অতএব উল্লিখিত যুক্তি স্বীকার করিলে নিত্যসম্বন্ধবাদও ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোকও আছে। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ধূম হইতে অগ্নির প্রতীতি যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্ব্বক হয়, শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতিও তেমনি সময়-পূর্ব্বক হইয়া থাকে; অতএব, এতদুভয়ের করণত্ব ব্যাহত হয় না (১৭)। বস্তুতঃ ধূমকে যেমন অগ্নির করণ

উত্তর

(১৭) ধূমে হি ব্যাপ্তিপূর্ব্বত্বং শব্দে সময়-পূর্ব্বতা।
নানয়োস্তদপেক্ষায়াং করণত্বং বিহন্যতে॥

—ন্যায়মঞ্জরী (চৌখাম্বা ১৯৩৬ ইং) প্রমাণ প্রকরণ; পৃষ্ঠা—২২৩।

বলিয়া স্বীকার করা হয় না; শব্দকেও তেমনি অর্থের করণ বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক।

লৌকিক ব্যপদেশও এক হিসাবে সময় পক্ষেরই সাক্ষী। "দেবদত্ত বলিল—এই শব্দ হইতে এই অর্থ জানিবে"—এইরূপ কথাই লোকে বলে; অতএব, ইহা সময়ই বটে। একই শব্দ যে বিভিন্নদেশে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তাহাও সঙ্কেত বা সময় বশতঃই করিয়া থাকে। যাঁহারা বলেন—সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রতিপাদনের সামর্থ্য আছে; কেবলমাত্র কোন কোন সময়ে কোন বিশেষ বিশেষ অর্থে তাহার ব্যবহার হয়; তাঁহাদের কথাও যুক্তিহীন। কখন কোন্ শব্দ কোন্ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইবে এবং কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইবে না, ইহা বুঝাইবার কোন নিয়ম নাই এবং ইহা জানাও যায় না। সুতরাং সঙ্কেত বা সময় স্বীকার না করিলে রামকর্তৃক একার্থে প্রযুক্ত শব্দকে শ্যাম অন্যার্থে গ্রহণ করিতে পারে; এইরূপ করার অন্তরায় কিছু নাই।

লোক-ব্যবহার

শক্তিস্বীকারের বৈয়র্থ্য-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে জয়ন্ত ভট্ট শক্তিবাদীদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—শক্তি বলিতে কি বুঝায়? ইহা শব্দস্বরূপ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? অতঃপর এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তিনি বলিয়াছেন—শব্দ-স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে শক্তির প্রতীতি হয় না; সুতরাং তাহাকে ভিন্ন বলা যায় না। আবার শব্দস্বরূপ হইতে অভিন্নরূপেও শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না; কারণ, তাহা হইলে শক্তি-সমূহেরও অব্যতিরেক (অভিন্নতা) স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু একই শব্দে বিভিন্ন শক্তি থাকিতে দেখা যায়।

শক্তিবাদ খণ্ডন

ভিন্নকার্য্যদ্বারা অনুমেয় বলিয়া শক্তিগুলিও ভিন্ন—একথাও বলা চলে না; কারণ, অন্য উপায়েও যে কার্য্যভেদের উপপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একটি মাত্র শব্দে সকল শক্তিই আছে—একথা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে একটি শব্দই সকল অর্থ বুঝাইতে পারিত। অর্থবোধন-ব্যাপারে সময়ের উপযোগ নিয়ামক হয় বলিয়া এক শব্দ সকল অর্থ বুঝায় না—এই কথা বলিলে, সময়ের স্বীকৃতির ফলে শক্তিকল্পনা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে।

যাঁহারা বলেন—শব্দের শ্রবণে সকল অর্থবিষয়ে সন্দেহ দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র তাহার শক্তি কল্পিত হয়; জয়ন্ত ভট্টের মতে তাঁহাদের উক্তিও অসার।

জয়ন্ত ভট্ট বলেন—সন্দেহ শক্তিকৃত নহে; কিন্তু গত্বাদি-বর্ণসামান্যনিবন্ধন। গত্বাদি-জাতিযুক্ত বর্ণসমূহেরই অর্থে বাচকত্ব নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ সকল গত্বাদি-জাতিযোগী বর্ণসমূহ কোন্ অর্থের বাচক হইবে—এইরূপ সন্দেহই শব্দ-শ্রবণে শ্রোতার অন্তরে উপজাত হয়। এইরূপ সন্দেহ উৎপাদনে শব্দগত কোন শক্তির কার্য্যকারিতা দেখা যায় না।

শক্তি ও সন্দেহ

কেহ কেহ বলেন—আর্য্যগণ যে অর্থে প্রয়োগ করেন, তাহাই শব্দের অর্থ; ম্লেচ্ছজনপ্রসিদ্ধ অর্থ অর্থই নহে; সুতরাং এইরূপ আর্য্যপ্রসিদ্ধিমাত্র অর্থে শব্দের অর্থপ্রকাশযোগ্যতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য শক্তি স্বীকার আবশ্যক। জয়ন্ত ভট্টের মতে, ইহাদের উল্লিখিত উক্তিটি ঠিক নহে; কারণ ম্লেচ্ছদেশেও শব্দার্থের প্রত্যয় জন্মিতে দেখা যায়। মীমাংসকেরাও কোন কোন শব্দের ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অবেষ্ট্যধিকরণে (শাবরভাষ্য অ—২, পা—৩, সূত্র—৩) আচার্য্য শবরস্বামী অন্ধ্রদেশ-প্রসিদ্ধ অর্থে রাজ্য শব্দটিকে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, মীমাংসা-শাস্ত্রের অন্যত্রও পিক, নেম, তামরস প্রভৃতি শব্দের ম্লেচ্ছপ্রয়োগানুসারেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে (১৮)।

ম্লেচ্ছ-প্রসিদ্ধির স্বীকৃতি

সম্বন্ধনিত্যতাবাদীদের সঙ্গে নৈয়ায়িকদের মতের পার্থক্য এই যে, নিত্য-সম্বন্ধবাদীরা মনে করেন—শব্দার্থের সম্বন্ধ-ব্যবহার অনাদি, আর নৈয়ায়িকদের মতে উহা জগৎ-সৃষ্টি হইতে প্রবৃত্ত। শব্দার্থ-সম্বন্ধের ব্যুৎপত্তি-বিষয়েও উভয়ের মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। নিত্যসম্বন্ধবাদীদের মতে শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি শক্তিপর্য্যন্ত; কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে ইহা তদ্ব্যতিরিক্ত। লোক-ব্যবহারেও 'ইহা ইহার বাচ্য এবং ইহা ইহার বাচক' এইরূপ ব্যুৎপত্তিই দেখা যায়; কিন্তু শক্তি পর্য্যন্ত ব্যুৎপত্তি দেখা যায় না।

নিত্যসম্বন্ধবাদ ও ন্যায়মত

যে স্থলে শৃঙ্গগ্রাহিকা দ্বারা (পৃথগ্‌ভাবে) শব্দ এবং অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া সম্বন্ধ করা হয়, সেই স্থলেও এই পর্য্যন্তই তাহাকে ক্রিয়মাণ দেখা যায় যে, ইহা ইহার বাচ্য এবং ইহা ইহার বাচক। যে স্থলে বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতে শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়, সেই ক্ষেত্রেও উক্ত বৃদ্ধ এই পর্য্যন্তই জানেন যে, এই শব্দ হইতে

(১৮) পিক-নেম-তামরসাদি-শব্দানাং চ ভবন্তিঃ ম্লেচ্ছপ্রয়োগাদর্থনিশ্চয় আশ্রিত এব।

—ন্যায়মঞ্জরী; প্রমাণ প্রকরণ, পৃষ্ঠা—২২৪।

এই অর্থ অমুককর্ত্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এতদ্ ব্যতিরিক্ত কোন শক্তি ইহাতে নাই। এইরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা শব্দ হইতে অর্থ-প্রত্যয়ের উপপত্তি হওয়ায়, তাহার অপরিহার্য্যতা হেতু, এবং অধিক কল্পনার হেতু না থাকায় শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে।

মীমাংসকেরা যে বলেন—'প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং অর্থাপত্তি এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যে শব্দার্থের সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়; জয়ন্ত ভট্টের মতে ইহা সত্য নহে। উত্তম-বৃদ্ধের উক্তি শুনিয়া এবং মধ্যম-বৃদ্ধের কার্য্য দেখিয়া শিশুরা শব্দের অর্থ অবগত হয়—একথা সত্য। উত্তমবৃদ্ধের উক্তিশ্রবণ এবং মধ্যম-বৃদ্ধের কার্য্য-দর্শনের পর শিশুরা অনুমানের সাহায্যে উক্ত অর্থ উপলব্ধি করে—ইহাও সত্য। কিন্তু, অর্থাপত্তি-ব্যতিরেকে উল্লিখিত শব্দার্থের উপলব্ধি না হওয়ায় শিশুরা অর্থ উপলব্ধির সময়ে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের সহিত অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে—এই কথা সত্য নহে। বস্তুতঃ, অর্থাপত্তি ব্যতিরেকেই প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে শব্দার্থের সম্বন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব, 'সম্বন্ধস্ত্রিপ্রমাণকঃ' না বলিয়া 'সম্বন্ধো দ্বিপ্রমাণকঃ' এইরূপ বলা উচিত। এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক-শক্তিরূপ নহে; কারণ অর্থনির্ণয়ের সময়ে ঈশ্বর-বিরচিত-সময়ের সাহায্য-গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। সময়-ব্যতিরেকে শব্দার্থের সম্বন্ধ হয় না; অতএব, সময়কেও সম্বন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে। সময় ঈশ্বরের রচিত বলিয়া তাহারও আদি আছে; অতএব, তাহার কার্য্যরূপ সম্বন্ধের ব্যবহারকে অনাদিও বলা চলে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শব্দার্থের সম্বন্ধের বাস্তব বা ব্যাবহারিক কোনরূপ নিত্যতাই স্বীকার করা চলে না (১৯)।

অর্থাপত্তি খণ্ডন

প্রতিপক্ষ বলেন—ঈশ্বর ও তো সম্বন্ধ করিবার সময়ে কোন শব্দদ্বারাই করিয়া থাকেন; সেই শব্দের সম্বন্ধ কে করিয়াছেন? যদি বলা হয়—শব্দান্তরের দ্বারা; তাহা হইলে সেই শব্দের সম্বন্ধ কে করিলেন? এইরূপে

---

(১৯) অতএব চ সম্বন্ধস্ত্রিপ্রমাণক ইতি যত্ত্বয়োচ্যতে, তদস্মাভির্ন মৃষ্যতে। শব্দবৃদ্ধাভিধেয়াংশ্চ প্রত্যক্ষেণাত্র পশ্যতীতি সত্যং শ্রোতুশ্চ প্রতিপন্নত্বমনুমানেন চেষ্টয়া ইত্যেতদপি সত্যম্। অন্যথানুপপত্ত্যা তু বেত্তি শক্তিং দ্বয়াশ্রিকামিত্যেতত্তু ন সত্যম্। অন্যথাপ্যুপপত্তেরিত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাদ্ দ্বিপ্রমাণকঃ সম্বন্ধনিশ্চয়ো ন ত্রিপ্রমাণকঃ।

—ন্যায়মঞ্জরী (চৌখাম্বা ১৯৩৬) প্রমাণ প্রকরণ; পৃষ্ঠা—২২৫।

সংশয়

কোন সীমা না পাওয়ায় সম্বন্ধকারী ঈশ্বর কর্তৃক বৃদ্ধব্যবহার-সিদ্ধ কতকগুলি অকৃত-সম্বন্ধ শব্দ স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ব্যবহারসিদ্ধিই যদি রহিল, তাহা হইলে, ঈশ্বর বা তৎকৃত সময় স্বীকারের প্রয়োজন কি ? এইরূপে সম্বন্ধের অনাদিত্ব-পক্ষই প্রবল হইয়া পড়িল।

উত্তর

উক্ত আপত্তির উত্তর এই যে, প্রতিপক্ষ কেবল অস্ত্রই জানিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রয়োগ জানেন নাই। বস্তুতঃ, আমাদের মত মানুষের পক্ষেই কার্য্য রচনার জন্য কারণের সাহায্য-গ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বর কারণ-ব্যতিরেকেই কার্য্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ। তাঁহার এই মহতী সৃষ্টিতে কত অলৌকিক কৌশল পড়িয়া রহিয়াছে ; মানুষ ইহার রচনা-প্রণালী কল্পনাও করিতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রই যেমন বিবিধ সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হয়, তেমনি এই সময়ও তাঁহার ইচ্ছামাত্রই রচিত হইয়াছে (২০)।

ঈশ্বর আছেন কি না, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে সত্য ; কিন্তু, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে আর উল্লিখিত ক্ষুদ্র দোষসমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, ঈশ্বর যে আছেন, তাহা অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে নিঃসন্দেহে জানা যায়।

শব্দের সহিত যদি অর্থের নিত্যসম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে শব্দোচ্চারণ-ব্যতিরেকে অর্থের উপলব্ধি হইত না ; কিন্তু বস্তুতঃ শব্দোচ্চারণ ছাড়াও অর্থের জ্ঞান হয়। কেহ যখন সম্মুখস্থ কোন বস্তুর দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে উহা দেখান, তখন শব্দোচ্চারণ-ব্যতিরেকেও ঐ ব্যক্তি উক্ত বস্তুটিকে জানিতে পারে। ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে (২১)।

---

(২০) অস্ত্রমাযুষ্মতা জ্ঞাতং বিষয়স্তু ন লক্ষিতঃ।
অস্মদাদিষু দোষোঽয়মীশ্বরে তু ন যুজ্যতে ॥
নানাকর্ম্মফলস্থানমিচ্ছয়ৈবেদৃশং জগৎ।
স্রষ্টুং প্রভবতস্তস্য কৌশলং কো বিকল্পয়েৎ ॥
—ন্যায়মঞ্জরী ; প্রমাণ প্রকরণ ; পৃষ্ঠা—২২৫।

(২১) অঙ্গুল্যগ্রেণ নির্দ্দিশ্য কঞ্চিদর্থং পুরঃ স্থিতম্।
ব্যুৎপাদয়ন্তো দৃশ্যন্তে বালানস্মদ্‌বিধা অপি ॥
—ন্যায়মঞ্জরী, প্রমাণ প্রকরণ ; পৃষ্ঠা—২২৫।

এইরূপ অঙ্গুলি-সঙ্কেতের সাহায্যে যখন অর্থের উপলব্ধি হয়, তখন তাহাতে সময়ও থাকে না—এই কথাও বলা চলে না ; কারণ, ঈশ্বরকৃত সময়ের সাহায্যে বৃদ্ধব্যবহাররূপ উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বে যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পুনরায় তাহারই জ্ঞান হয়।

নৈয়ায়িক-চূড়ামণি জয়ন্ত ভট্ট এইভাবে শক্তিবাদ খণ্ডনের জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু অন্যান্য নৈয়ায়িকেরা দৃঢ়ভাবে শক্তিবাদ সমর্থন করিয়াছেন। শক্তিবাদ, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থে শক্তিবাদের সুদৃঢ় সমর্থন দেখা যায়। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা হইতে বাচ্যার্থের পার্থক্য প্রতিপাদনের জন্য শক্তিস্বীকার যে আবশ্যক, তাহা মৎপ্রণীত "শব্দার্থ-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি। এই শক্তি এবং সময় উভয়কেই বস্তুতঃ অভিন্ন বলিলে আর বিবাদের অবকাশ থাকে না। আমরা শক্তি ও সময়কে অভিন্নই মনে করি ; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় শক্তিবাদী ও সময়বাদীদের এই বিবাদকে "কেবলং নামমাত্রে বিবাদঃ" বলা যাইতে পারে।

## বৈয়াকরণ-মত

বৈয়াকরণেরাই শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধবাদী নামে পরিচিত। মহাভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি সঙ্কেতের স্বরূপ বর্ণনা-প্রসঙ্গে শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের অভেদরূপে স্মরণই সঙ্কেত নামে কথিত হয় (২২)।

এই স্থলে মহর্ষি পতঞ্জলি যদিও শব্দ ও অর্থের অভেদ-প্রতীতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি 'ইতরেতরাধ্যাস' পদে 'অধ্যাস' শব্দটি গ্রহণ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, এই অভেদজ্ঞান বাস্তব নহে। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও এইরূপ 'ইতরেতরাধ্যাস' শব্দের উল্লেখ দেখা যায় (২৩)। একটি বস্তুকে যখন অন্য বস্তুরূপে জানা যায়, তখনই ঐরূপ ভ্রমজ্ঞানকে অধ্যাস বলে। এই অধ্যাস শব্দটি বৈদান্তিকেরা অনেক স্থলেই ব্যবহার করিয়াছেন। মহর্ষি

(২২) সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকো যোঽয়ং শব্দঃ সোঽর্থঃ, যোঽর্থঃ স শব্দঃ।—মহাভাষ্য।

(২৩) শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্।
—যোগদর্শন, বিভূতিপাদ ; সূত্র—১৭।

পতঞ্জলিও যে উক্ত অর্থেই অধ্যাস শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা বিভিন্ন টীকাকারদের ব্যাখ্যা হইতেও জানা যায়। মহামতি কৈয়ট মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের অভিপ্রায় জানাইয়া দিয়াছেন। বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ নাগেশ তাঁহার লঘুমঞ্জূষা নামক গ্রন্থে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভাষ্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং লঘুমঞ্জূষার ঐ অংশের ব্যাখ্যাকালে টীকাকার দুর্ব্বলাচার্য্য এই অধ্যাস শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন (২৪)।

বৈয়াকরণ-সম্মত উল্লিখিত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে মহাত্মা মণ্ডনমিশ্র তাঁহার বিধিবিবেক নামক গ্রন্থে তিনটি মতের উল্লেখক্রমে উহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত মত তিনটি যথা —(১) প্রত্যাসবাদ (২) পরিণামবাদ এবং (৪) বিবর্ত্তবাদ (২৫)।

প্রত্যাস বলিতে আচার্য্য মিশ্র অধ্যাসকেই বুঝিয়াছেন ; সুতরাং উল্লিখিত অধ্যাসবাদের বিশ্লেষণদ্বারাই প্রত্যাসবাদও বুঝানো হইয়াছে (২৬)। প্রত্যাসবাদীদের মতে শব্দ এবং অর্থ উভয়েই বাস্তব পদার্থ বটে ; কিন্তু তাহাদের অভেদ-প্রতীতিটি বাস্তব নহে। রজ্জু এবং সর্প উভয়েই বাস্তব পদার্থ হইলেও রজ্জুতে যখন সর্পত্বের অধ্যাস, প্রত্যাস বা আরোপ হয়, তখন যেমন তাদৃশ জ্ঞানের বাস্তবতা থাকে না, শব্দার্থের অভেদ-প্রতীতির বেলাও ঠিক তেমনি তাদৃশ জ্ঞানের বাস্তবতা থাকে না।

পরিণামবাদীদের মতে দুগ্ধ যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয়, শব্দও তেমনি অর্থরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই মতে শব্দ ও অর্থ উভয়েই বাস্তব এবং তাহাদের অভিন্নতাও বাস্তবই বটে। বস্তুতঃ অর্থকে শব্দের পরিণাম বলা ভুল ; কারণ, দধি উৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে যেমন দুগ্ধের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক, অর্থপ্রতীতির অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে শব্দের অবস্থিতি তেমন আবশ্যক নহে। দুধ না হইলে দধির উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কিন্তু শব্দ ছাড়াও অর্থের উৎপত্তি বা উপস্থিতি সম্ভব। একজন শিল্পী যখন

(২৪) অধ্যাসেতি। অন্যস্মিন্নন্যধর্ম্মাবভাসোঽধ্যাসঃ। তন্মূলকং তাদাত্ম্যং ন তু বাস্তবমিত্যর্থঃ।
—কুঞ্জিকাটীকা ( দুর্ব্বলাচার্য্যকৃত লঘুমঞ্জূষার টীকা )

(২৫) শব্দাত্মনঃ প্রত্যাসাৎ, পরিণামাৎ বিবর্ত্তাদ্বেতি।
—বিধিবিবেক ( মণ্ডনমিশ্রকৃত ) পৃষ্ঠা—২৮৭ ॥

(২৬) প্রত্যাসোঽধ্যাসঃ।...শশবিষাণাদিষসদ্ভূতেষু শশবিষাণমিত্যাদি পদগতসত্ত্বাধ্যারোপেণ প্রতীতিরিতি প্রত্যাসার্থঃ।—বিধিবিবেক।

মৌনাবলম্বন করিয়া কোন দ্রব্য প্রস্তুত করে, তখন শব্দোচ্চারণ ব্যতিরেকেই দ্রব্যরূপ অর্থের উৎপত্তি উপলব্ধ হয়। আবার রাস্তায় চলিবার সময় যখন আমরা গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি জন্তু অথবা বৃক্ষ, লতা, গৃহ প্রভৃতি দ্রব্য অবলোকন করি, তখনও শব্দোচ্চারণ-ব্যতিরেকেই অর্থের উপস্থিতি হইয়া থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, শব্দের অর্থরূপে পরিণতিও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচার্য্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—শব্দ অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়; এবং এইরূপে শব্দের অর্থরূপে পরিবর্ত্তনকেই 'তাদাত্ম্য' বলা হইয়া থাকে। আচার্য্য নাগেশ তাঁহার লঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে এই তাদাত্ম্য শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শব্দ অর্থ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন হইয়াও অর্থাকারে জ্ঞাত হয়; এবং এইরূপ ভিন্ন বস্তুর অভিন্নরূপে প্রতীতিকেই এখানে তাদাত্ম্য বলা হইয়া থাকে (২৭)। অতএব, দেখা যাইতেছে যে বৈয়াকরণেরাও অর্থের সহিত শব্দের বাস্তব ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থের এইরূপ বাস্তব ভেদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াও পুনরায় তাহাদের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধও অঙ্গীকার করিয়াছেন। আচার্য্য নাগেশ বলেন—'উঞঃ প্রগৃহ্যম্' সূত্রে মহর্ষি পাণিনি উঞ্ শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া জানাইয়াছেন যে, উঞ্ এবং প্রগৃহ্য এই উভয়ের মধ্যে অভেদ-ব্যতিরিক্ত অন্য একটি সম্বন্ধ আছে। আচার্য্য নাগেশের মতে অভেদ-সম্বন্ধ থাকিলে প্রথমা বিভক্তি হয়, এবং অভেদ-ব্যতিরিক্ত সম্বন্ধ থাকিলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারে। উল্লিখিত সূত্রে 'উঞঃ' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া মহর্ষি পাণিনি শব্দ ও অর্থের বাস্তব ভেদই স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আচার্য্য নাগেশ মনে করেন (২৮)। মহর্ষি পতঞ্জলিও তাঁহার যোগদর্শনে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" সূত্রদ্বারা শব্দার্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধই স্বীকার করেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

মহামতি হেলারাজ বাক্যপদীয়ের ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছেন যে, ইহা

(২৭) পাদটীকা—১৩।

(২৮) তত্র ভেদস্যোদ্ভূতবিবক্ষয়া 'অস্যার্থস্যায়ং বাচকঃ' 'উঞঃ প্রগৃহ্যম্' 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' ইত্যাদৌ ষষ্ঠী। অভেদস্য তত্ত্ববিবক্ষয়া তু প্রথমা, যথা উক্তেষু।—লঘুমঞ্জুষা (চৌখাম্বা); পৃষ্ঠা—৩৮।

ইহার বাচ্য এবং ইহা ইহার বাচক—এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা যোগ বা সম্বন্ধ আছে (২৯)।

পাতঞ্জল-মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় মহামতি কৈয়ট বলিয়াছেন—শব্দের অর্থ-প্রকাশে যে যোগ্যতা আছে, ইহাই তাহাদের সম্বন্ধ (যোগ্যতা-লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ)। মহামতি নাগেশ কৈয়টের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মত স্বীকার করিলে বস্তুতঃ শব্দার্থের কার্য্য-কারণ-ভাবই স্বীকার করা হয়। বেদান্তবিখ্যাত 'তত্ত্বমসি' বাক্যে যেমন কারণ ব্রহ্ম কার্য্য জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই মতেও তেমনি কাবণ শব্দ কার্য্য অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে (৩০)।

শব্দার্থের এইরূপ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মহামতি নাগেশের মনোমত নহে; কারণ, তাহা হইলে কার্য্য অর্থ অনিত্য হইয়া পড়ে এবং ফলে শব্দার্থের সম্বন্ধকেও অনিত্য বলিতে হয়। লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থের কুঞ্জিকাটীকায় মহাত্মা দুর্ব্বলাচার্য্য নাগেশ ভট্টের এইরূপ অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছেন (৩১)।

বস্তুতঃ নাগেশ ভট্ট এই অভিপ্রায়েই উল্লিখিত কথাটি বলিয়াছেন কি না, ভাবিবার বিষয়। অন্যত্র নাগেশ নিজেই বলিয়াছেন—শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ বলিতে তাদাত্ম্য শব্দদ্বারা বাস্তব অভিন্নতা বুঝায় না; কিন্তু ভেদ থাকা সত্ত্বেও অভেদরূপে প্রতীতিকে বুঝায় (তাদাত্ম্যঞ্চ তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদভেদেন প্রতীয়মানত্বম্)। ইহাদ্বারা বস্তুতঃ বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ বা যোগাদিশাস্ত্রসম্মত অধ্যাসবাদই সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৈয়টের প্রদর্শিত যোগ্যতা-লক্ষণ-সম্বন্ধবাদ স্বীকারের ফলে যদি শব্দ এবং অর্থের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাবই সমর্থিত হয়, তাহা হইলেও বস্তুতঃ কোন অসঙ্গতি নাই। নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যেরা যেমন তাদাত্ম্য-

---

(২৯) "অস্যায়ং বাচকো বাচ্যঃ" ইতি ষষ্ঠ্যা প্রতীয়তে যোগঃ শব্দার্থয়োঃ ইতি হরিকারিকা-ব্যাখ্যাবসরে হেলারাজীয়ে।—লঘুমঞ্জুষা; পৃষ্ঠা—৪৫॥

(৩০) 'যোগ্যতালক্ষণঃ সম্বন্ধঃ' ইত্যাদেঃ কৈয়টস্য কারণতাবচ্ছেদকত্বধর্ম্মরূপঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তত্ত্বমস্যাদিবদর্থেন শব্দেনাপি ব্রহ্মণাধ্যাসিকং তাদাত্ম্যম্।—লঘুমঞ্জুষা; (চৌখাম্বা) পৃষ্ঠা—৫০॥

(৩১) নন্থ 'নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ' ইতি বার্ত্তিকব্যাখ্যাবসরে অর্থস্যানিত্যত্বাত্তৎসম্বন্ধস্য নিত্যত্বাসম্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য 'যোগ্যতালক্ষণঃ সম্বন্ধ' ইতি কৈয়টাসঙ্গতিঃ। অর্থস্যানিত্যত্বে তাদাত্ম্যলক্ষণযোগ্যতায়া অপি নিত্যত্বাসম্ভবাদত আহ কৈয়টস্তেতি।

—কুঞ্জিকাটীকা; পৃষ্ঠা—৫১—৫২॥

সম্বন্ধের ব্যাবহারিক নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কৈয়টের স্বীকৃত যোগ্যতা-রূপ সম্বন্ধও তেমনি ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে নিত্য হইতে পারে।

তাহা ছাড়া, নাগেশ ভট্ট "তত্ত্বমস্যাদিবদর্থেন শুদ্ধেনাপি ব্রহ্মণাধ্যাসিকং তাদাত্ম্যম্" এই বাক্যটিতে তত্ত্বমসি বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক যে ভাবে শব্দার্থের আধ্যাসিক (ব্যাবহারিক) তাদাত্ম্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও মনে হয়, দুর্ব্বলাচার্য্য নাগেশ ভট্টের যেরূপ অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছেন, নাগেশের প্রকৃত অভিপ্রায় সেইরূপ নহে। আমাদের মতে যে তাদাত্ম্য বা যোগ্যতা কোনটিই স্বীকার্য্য নহে, তাহা পরে আলোচনা করিব।

নানার্থ শব্দের উচ্চারণে যখন একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থ বুঝায়, তখন একটি-মাত্র অর্থরূপে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে সে পুনরায় অপর অর্থ কেমন করিয়া বুঝাইবে?—এই সংশয়ের উত্তরে বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ তিনটি বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ বলেন—একটি শব্দই একাধিক অর্থ বুঝায় না; কিন্তু একাকৃতি-বিশিষ্ট বিভিন্ন শব্দই বিভিন্ন অর্থ বুঝাইয়া থাকে (অর্থভেদাচ্ছব্দভেদঃ)। দ্বিতীয় পক্ষের মতে—একটি আম্রফল যেমন রূপ, রস এবং গন্ধাদিরূপে নানাভাবে আস্বাদিত হয়; তেমনি একটি শব্দেই নানাবিধ অর্থ থাকে। তৃতীয় পক্ষ বলেন—নিরূপকের বিভিন্নতা হেতু একই তাদাত্ম্য নানাভাবে গৃহীত হয়। অর্থাৎ একই ব্যক্তি যেমন তাহার মায়ের কাছে পুত্র, স্ত্রীর কাছে স্বামী এবং মেয়ের কাছে পিতা, ঠিক তেমনি একই শব্দকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতে পারেন। "হলো-হনন্তরা" (১।১।৭) সূত্রে ভাষ্যকার এই তিনটি পক্ষই সূচনা করিয়াছেন এবং মহামতি নাগেশও তাঁহার লঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে এই তিনটি পক্ষই প্রদর্শন করিয়াছেন (৩২)।

## বৌদ্ধমত

বৌদ্ধগণ যে শব্দ ও অর্থের কোন বাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শব্দ যে অর্থ-প্রতিপাদন করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং ইহাকে অস্বীকার করাও চলে না। অর্থের সহিত যদি শব্দের কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহা হইলে শব্দ অর্থ-প্রতিপাদন করিবে কেমন করিয়া?

(৩২) অন্যে ত্বেকত্রৈবাম্রফলে রূপরসগন্ধাদীনাং ভিন্নানাং তাদাত্ম্যবৎ একত্রৈব শব্দেঽনেকার্থনিরূপিতানি ভিন্নানি তাদাত্ম্যানীত্যাহুঃ। পরে তু নিরূপকভেদেঽপি তাদাত্ম্যমেকমেবেতি শক্ত্যৈক্যমেবেত্যাহুঃ—লঘুমঞ্জুষা; পৃষ্ঠা—৫৬।

এই কারণে বৌদ্ধাচার্য্যগণ অর্থের সহিত শব্দের কোন বাস্তব সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে একটা কৃত্রিম সম্বন্ধ আছে।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দার্থের এই সম্বন্ধকে মনুষ্য-রচিত বলিয়া মনে করেন। এই কারণে, তাঁহাদের মতে বেদও মনুষ্য-রচিত বলিয়া বেদার্থের অবশ্য-প্রামাণ্য স্বীকার্য্য নহে। নৈয়ায়িকেরা যেমন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে সাময়িক বলিয়াছেন, বৌদ্ধেরাও তেমনি তাহাকে সাময়িক বলিতে সম্মত আছেন; তবে তাঁহারা 'সময়' শব্দটিকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতে চান। নৈয়ায়িকমতে ঈশ্বরেচ্ছাই 'সময়' নামে অভিহিত হইয়াছে; আর বৌদ্ধমতে মানুষের ইচ্ছাকেই সময় বলা উচিত—উভয়পক্ষের মতের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ (৩৩)।

বৌদ্ধাচার্য্য-সম্মত এই কৃত্রিম সম্বন্ধ নিত্য নহে। তাঁহাদের মতে শব্দ এবং অর্থ উভয়েই ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং তাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিলে উহাও ক্ষণস্থায়ীই হইবে। তাহা ছাড়া মনুষ্য-রচিত পদার্থমাত্রেই অনিত্য; সুতরাং শব্দার্থের এই সম্বন্ধ মনুষ্য-রচিত হইলে স্বভাবতঃই তাহা অনিত্য হইবে।

বৈয়াকরণ-সম্মত শব্দার্থের তদাত্ম্য-সম্বন্ধ খণ্ডন করিবার জন্যও বৌদ্ধাচার্য্যগণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয়ে বৌদ্ধদের যুক্তি নৈয়ায়িকদের যুক্তিরই অনুরূপ। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা শব্দকে জানি, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারাই অর্থকেও জানিতে পারি না বলিয়াই বৌদ্ধগণ উভয়ের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ অসম্ভব মনে করেন। নৈয়ায়িকদের ন্যায় বৌদ্ধগণও মনে করেন যে, শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হইলে, এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই উভয়ের জ্ঞান হইত।

শব্দার্থের কার্য্য-কারণভাব-সম্বন্ধও বৌদ্ধদের অনভিপ্রেত। তাঁহারা বলেন—যদি শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি কারণ এবং অপরটি কার্য্য হইত, তাহা হইলে, একই শব্দ সকল সময়ে সকল দেশে একই অর্থ বুঝাইত। তাহা ছাড়া, শব্দ থাকিলেই অর্থ এবং অর্থ থাকিলেই শব্দ থাকিত। কিন্তু, বস্তুতঃ একই শব্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং শব্দ ছাড়াও অর্থকে বা অর্থ ছাড়াও শব্দকে থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং শব্দার্থের কার্য্যকারণভাবও অসম্ভব (৩৪)।

---

(৩৩) স তু সাময়িকো যুক্তঃ পুংবাগ্‌ভূতান্ন ভিদ্যতে।—তত্ত্বসংগ্রহ; শ্লোক ১৫০৮॥

(৩৪) ভিন্নাক্ষগ্রহণাদিভ্যো নৈকাত্ম্যং ন তদুদ্ভবঃ।
ব্যভিচারাৎ... ॥—তত্ত্বসংগ্রহ; শ্লোক—১৫১৪॥

এই সকল বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক স্থলেই বৌদ্ধদের যুক্তি নৈয়ায়িকদের যুক্তিরই অনুরূপ।

## আলোচনা

শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধের প্রতিকূলে নৈয়ায়িকগণ যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি মীমাংসকগণ-কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইলেও বাকী কয়েকটি যুক্তি অকাট্য বলিয়াই মনে হয়। শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, এই বিষয়ে নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক উভয় পক্ষই একমত। বৈয়াকরণেরা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে ব্যাবহারিক বলিয়া স্বীকার করায় বস্তুতঃ যে শব্দ অর্থরূপে বা অর্থ শব্দরূপে পরিণত হয় না, একথাও তাঁহাদের দ্বারা একপ্রকার স্বীকৃতই হইয়াছে।

'গ' প্রভৃতি বর্ণই গোপদার্থরূপে পরিণত হয় বলিয়া উপবর্ষ এবং মীমাংসকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহা সঙ্গত নহে। বাস্তবিক যদি 'গ' প্রভৃতি বর্ণই গোপদার্থরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলে গোশব্দ হইতেই দুগ্ধ, গোময় প্রভৃতি সংগ্রহ করা যাইতে পারিত; গো নামক জন্তুর উপস্থিতির কোন প্রয়োজনই হইত না। তাহা ছাড়া, গোশব্দের উচ্চারণমাত্রই তাহার বাচ্য জন্তুটি শ্রোতা ও বক্তার সম্মুখে আসিয়া সশরীরে উপস্থিত হইত; কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ হয় না। সুতরাং গ প্রভৃতি বর্ণেরই গোশব্দরূপে পরিণতি অসম্ভব।

যদিও গোশব্দ উচ্চারণের সময়ে শ্রোতা এবং বক্তার মনে গো-নামক জন্তুর একটি স্মৃতি জন্মে, তথাপি অর্থের এই স্মৃতিটি অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কারণ, গোজন্তুদ্বারা যে কাজ করা হয়, উক্ত স্মৃতিদ্বারা তাহার কিছুই করা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, গো-শব্দের অর্থসম্বন্ধে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে উপদিষ্ট হয় নাই, তাহার অন্তরে এইপ্রকার স্মৃতিই জন্মে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে গো (go) শব্দ গমন-ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং ঐ সকল দেশের লোকের সম্মুখে উক্ত গোশব্দটি উচ্চারণ করিলে এই উচ্চারণ তাহাদের অন্তরে জন্তুবিশেষের জ্ঞান না জন্মাইয়া বরং তাহাদিগকে স্থানত্যাগের প্রেরণা দিবে। আসামপ্রদেশের অধিবাসিগণ যুবক-মনুষ্য অর্থে 'ডেকা' শব্দ প্রয়োগ করেন; কিন্তু এই একই শব্দ শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় বৃষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিবাসীরা গো শব্দে গরুকে, বা ভারতবাসীরা (ইংরাজীভাষা না জানিলে) এই শব্দে গমন-ক্রিয়াকে বুঝেন না। শ্রীহট্টের

অধিবাসীরা ডেকা শব্দে যুবক মানুষকে বা আসামের অধিবাসীরা এই শব্দে ষাঁড়কে বুঝেন না। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, দেশ ও ভাষাভেদে একই শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং শব্দ হইতে অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীধর ভট্ট; জয়ন্ত ভট্ট, প্রভৃতি আচার্য্যগণও যে তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে দেশভেদে শব্দের অর্থভেদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

একই শব্দ যে দেশ ও ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝায়, তাহা আমরা উপরে প্রদর্শন করিয়াছি। স্বাভাবিক কোন পদার্থের বোধ এই প্রকার ভিন্ন হয় না। অগ্নি বা সূর্য্যকিরণ সকল দেশেই উত্তপ্ত অনুভূত হয়, এবং বরফ সকল দেশেই শীতল থাকে। আলোক এবং অন্ধকারও সকল দেশের মানুষের কাছেই একপ্রকার অনুভূত হইয়া থাকে। তিক্ত দ্রব্য সকল কালেই তিক্ত আস্বাদ অনুভব করায় এবং মিষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ সর্ব্বত্রই মিষ্ট হয়। এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ দেশ বা কালভেদে ভিন্ন হয় না। অতএব শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু এই সম্বন্ধটিকে মনুষ্যরচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িকেরা ইহাকে মনুষ্যকৃত না বলিয়া ঈশ্বরকৃত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের কৃত কোন কার্য্যই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঈশ্বর নিজেই কল্পনামাত্র-সিদ্ধ (অবাঙ্মনসগোচর), সুতরাং তাঁহার দ্বারা কোন বাস্তব-সম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

আমি বলিতে চাই যে, মনুষ্যসমষ্টির স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছাদ্বারা স্থাপিত শব্দার্থের সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরসঙ্কেত বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ মনে করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিজের কোন আকৃতি না থাকায় তিনি মনুষ্যগণের ইচ্ছার মাধ্যমেই নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং মনুষ্য-সমষ্টির এইরূপ অযত্নসাধ্য ইচ্ছাই ঈশ্বরেচ্ছা-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৎপ্রণীত শব্দার্থতত্ত্ব নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখিলাম না। এই সম্বন্ধ মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না; এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির ধ্বংসের পরও আর থাকিবে না; সুতরাং ইহাকে নিত্য বলা চলে না। তবে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশের কাল স্থির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় ইহার ব্যাবহারিক-নিত্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ, শব্দের অবিদ্যমানে অর্থের স্থিতি যে সম্ভব, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। এইরূপে অর্থের অবিদ্যমানেও শব্দের স্থিতি সম্ভব হইতে পারে। মনে করুন—জার্ম্মান ভাষায় একখানা রেকর্ড আনিয়া বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লীতে উহা বাজান হইতেছে। এই সময়ে যে সকল লোক উক্ত রেকর্ডের শব্দগুলি শুনিতেছে, তাহারা কেহই ইহার একটি বর্ণেরও অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না। সুতরাং এইরূপ স্থলে অর্থ ব্যতিরেকেই শব্দের স্থিতি সম্ভব।

শব্দের বাস্তব নিত্যতা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র বা দর্শন শাস্ত্রের কোথাও যে স্বীকৃত হয় নাই, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহারও বাস্তব নিত্যতা বেদাদি-শাস্ত্রসম্মত নহে—ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা তিনি বস্তুতঃ নৈয়ায়িকদের অভিপ্রায়কেই ব্যক্ত করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্বন্ধনিত্যতাবাদীগণের মতে এই সম্বন্ধ অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধ, আর নৈয়া-য়িকদের মতে ইহা জগৎসৃষ্টির সময় হইতে উদ্ভূত। বস্তুতঃ, জগৎসৃষ্টির কাল কখন, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা কাহারও পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় আমার বিবেচনায় উল্লিখিত সম্বন্ধের ব্যাবহারিক নিত্যতা নৈয়ায়িকদেরও স্বীকার করা উচিত।

সময় অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা দণ্ডের দৃষ্টান্তদ্বারা অর্থ প্রতিপত্তি-ব্যাপারে শব্দের উপর করণতা আরোপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিপক্ষে জয়ন্ত ভট্ট যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, ইহার চেয়ে আরও ভাল যুক্তি দেখাইতে পারিতেন। এই ক্ষেত্রে জয়ন্ত ভট্ট দোষ খণ্ডন না করিয়া বলিয়াছেন যে, বিরুদ্ধবাদীর মত স্বীকার করিলেও অনুরূপ দোষই থাকে; এবং এইমাত্র বলিয়াই নৈয়ায়িকদের বক্তব্য শেষ করিতে চাহিয়াছেন। আমি বলিতে যাই যে, উল্লিখিত স্থলে বিরুদ্ধবাদীর আরোপিত দোষ খণ্ডনের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করা জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের উচিত ছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহারা দুইটি সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিতেন। যথা—

(১) দণ্ডকে কেহ চালনা না করিলে সে কাহাকেও আঘাত করিতে পারে না সত্য; কিন্তু যখন কোন যন্ত্রে একটি দণ্ড স্থাপন করিয়া চালন-যন্ত্র-বিশেষের সহিত তাহার যোগ করিয়া দেওয়া হয়, তখন উক্ত দণ্ড

কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রেরণা ব্যতিরেকেই অনবরত কার্য্য করিয়া যাইতে থাকে। চালক-যন্ত্র যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে; তখন কেহই তাহাকে উল্লিখিত দণ্ড-চালনার কারণ বলে না। সময়ও তেমনি লোক-দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া কার্য্যসাধন করে বলিয়া অর্থ-প্রতিপাদন-ব্যাপারে সময়ের কারণতা স্বীকার করতঃ শব্দের করণতা স্বীকার কবা অনাবশ্যক।

(২) ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত বা প্রেরিত না হইলেও অনেকস্থলেই বিভিন্ন পদার্থ কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। কচ্ছপী যখন ভূগর্ভে নিজের ডিম্বগুলি প্রোথিত করিয়া চলিয়া যায়, তখন কোনরূপ প্রেরণা-ব্যতিরেকেই উক্ত ডিম্বগুলি হইতে যথাসময় বাচ্চা বাহির হইয়া আসে। অতএব, স্বীকার করা আবশ্যক যে কোনরূপ প্রত্যক্ষ-প্রেরণা ব্যতিরেকেই শব্দ অর্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ।

এতদ্ব্যতীত জয়ন্ত ভট্ট এই প্রসঙ্গে অন্যান্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার কাছে বেশ সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

বৈয়াকরণাচার্য্যগণের স্বীকৃত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আমাদের বিবেচনায় অনুভব-বিরুদ্ধ। শব্দের অর্থরূপ প্রাপ্তি আমরা কোন প্রমাণের সাহায্যেই জানিতে পারি না। সুতরাং বৈয়াকরণাচার্য্যগণের এই কল্পনাটিকে আমরা অসম্ভব মনে করি। তবে শব্দ ও অর্থের একটি সম্বন্ধ আছে—একথা আমরাও স্বীকার করি। ইহাকে 'যোগ্যতালক্ষণ' বলা অপেক্ষা বাচ্য-বাচক বা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক বলাই আমরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি। শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হয়; সুতরাং শব্দ প্রতিপাদক এবং অর্থ প্রতিপাদ্য। এইরূপে শব্দকে বাচক এবং অর্থকে বাচ্যও বলা যাইতে পারে। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত শব্দার্থের অন্য কোন সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হইবে না। তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ যে কল্পনামাত্র, তাহা বৈয়াকরণেরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা-নিবন্ধন এবং কখনও শব্দের প্রত্যক্ষত্ব ও অর্থের পরোক্ষত্ব দেখিয়া যে শব্দার্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করা চলে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতের আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, তাঁহারা শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাস্তব-সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া একটি কাল্পনিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের অনুকূলই হইয়াছে। বৈয়াকরণ-স্বীকৃত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ

খণ্ডনের জন্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ বৃথাই-প্রয়াস পাইয়াছেন ; কারণ, বৈয়াকরণাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের সহিত এই বিষয়ে বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তের মূলতঃ কোন ভেদ নাই। অতএব, অনর্থক এই সকল যুক্তিবিন্যাস তাঁহারা না করিলেও পারিতেন। শব্দার্থের কার্য্যকারণ-ভাবের বিরুদ্ধে বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িকগণের যুক্তিরই পুনরুক্তি মাত্র।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শব্দার্থের বাস্তব সম্বন্ধ কাহারও অভিপ্রেত নহে। সকল শাস্ত্রেই শব্দ ও অর্থের মধ্যে কেবল মাত্র একটি কাল্পনিক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং ইহা যে ব্যাবহারিক, কিন্তু নিত্য নহে, তাহাও এক হিসাবে সর্ব্ববাদীসম্মত। আমরাও শব্দ ও অর্থের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ব্যাবহারিক সম্বন্ধই স্বীকার করি। এই সম্বন্ধ প্রাপ্তি, তাদাত্ম্য বা কার্য্যকারণরূপ নহে। ইহাকে কেবলমাত্র বাচ্য-বাচক বা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকই বলা যাইতে পারে। নৈয়ায়িকগণ যে অর্থে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন আমরা কিন্তু সেই অর্থে তাহা ব্যবহার করিতেছি না। আমাদের স্বীকৃত এই প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধটি বাচ্য-বাচক সম্বন্ধেরই নামান্তর।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## নাদ, ধ্বনি ও শব্দ

নাদ, ধ্বনি এবং শব্দ এই তিনটি শব্দ আমরা সকলেই শুনিয়াছি এবং প্রায়ই শুনিয়া থাকি; কিন্তু ইহাদের স্বরূপ এবং প্রভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই আছে। প্রাচীনতম বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বিভিন্নগ্রন্থে এই সকল শব্দের তত্ত্ব অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় শব্দের যে চারিটি অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহার কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। নাদবিন্দূপনিষৎ নামক গ্রন্থে প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থখানি ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ হিসাবে পরিচিত। বস্তুতঃ ইহার রচনা-পদ্ধতির অর্ব্বাচীনত্ব হেতু অনেকেই এই গ্রন্থখানার মৌলিকতা ও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে চাহেন না। এতদ্ব্যতীত ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মৈত্রায়নী ও ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন তন্ত্রে, পুরাণে এবং পরবর্ত্তীকালীন বহু সমালোচনামূলক গ্রন্থেও এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা দৃষ্ট হয়।

## নাদের স্বরূপ

নাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেখা যায়।

নাদশব্দের ব্যুৎপত্তি

ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থনির্ণয় করিলে নাদশব্দদ্বারা ধ্বনিকেই বুঝা উচিত; কারণ, নদ্‌ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা' এবং ইহার উত্তর ভাববোধক ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নাদ শব্দটি সাধিত হইয়াছে। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থেও নাদশব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি-গত অর্থেরই স্বীকৃতি দেখা যায়। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া যখন ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমায় পৌছিয়া এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে, তখন ঐরূপ শব্দই নাদ নামে অভিহিত হয়—ইহাই সঙ্গীত-দামোদরের সুস্পষ্ট অভিমত।

সঙ্গীত-দামোদরে লিখিত আছে—

"নাভেরূর্দ্ধং হৃদিস্থানান্মরুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

( নাদলীলামৃত ৫৫ পৃষ্ঠায় ধৃত )

কেহ কেহ 'নাভেরূর্দ্ধম্' কথাটির অর্থ করেন—নাভির উর্দ্ধস্থিত। তাহা হইলে সমগ্র শ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায়—নাভির উর্দ্ধস্থিত হৃদয় নামক স্থান হইতে ( উর্দ্ধদিকে উঠিয়া ) প্রাণ নামক বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমায় ( বা সমীপে ) শব্দ করিতে থাকে ; এই কারণেই উহা ( প্রাণবায়ু অথবা শব্দ ) নাদ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নাদলীলামৃত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোকের এই প্রকার অর্থই প্রদর্শিত হইয়াছে।

হৃদয় নামক স্থান যে নাভির উর্দ্ধদিকে অবস্থিত, সাধারণ লোকেরাও ইহা জানে ; সুতরাং এই কথাটুকু জানাইবার জন্য "নাভেরূর্দ্ধম্" কথাটি বলা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—জীবদেহে বায়ুর দ্বিবিধ গতি আছে। নাভি হইতে যে বায়ুপ্রবাহ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে, তাহার নাম প্রাণ, এবং যাহা নাভি হইতে নিম্নদিকে প্রধাবিত হয়, তাহার নাম অপান। সুতরাং আমার বিবেচনায় সঙ্গীত-দামোদরের উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ নিম্ন প্রকার—

নাভেঃ ( নাভি হইতে ) উর্দ্ধং ( উর্দ্ধদিকে উঠিয়া ) প্রাণসংজ্ঞকঃ বায়ুঃ ( প্রাণনামক বায়ু ) হৃদিস্থানাৎ ( হৃদয় নামক স্থান লাভের পর। ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী ) ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে ( ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমায় পৌছিয়া ) নদতি ( শব্দ করিতে থাকে )। তেন ( এই কারণে ) নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ( ঐ শব্দ নাদ নামে কীর্ত্তিত হয় )।

প্রাণ ও অপান বায়ুর পার্থক্য সাধারণ লোকেরা জানে না ; সুতরাং নাভি হইতেই যে প্রাণবায়ু উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, একথা বলা নিরর্থক হয় নাই। বস্তুতঃ, এইরূপ অর্থেই যে সঙ্গীত-দামোদর নামক গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটি বলা হইয়াছে, উল্লিখিত গ্রন্থের অন্যান্য উক্তি সমূহ হইতেও তাহাই প্রতীত হয়। সঙ্গীত-দামোদরে যে নাদের পাঁচটি বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম অতিসূক্ষ্ম অবস্থাটি নাভিতেই উপলব্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত দামোদরের—

"আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেঽভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ॥"

( নাদলীলামৃত ৫৫ পৃষ্ঠায় ধৃত )

এই শ্লোকেও নাভি হইতেই নাদের উর্দ্ধগতির উল্লেখ দেখা যায়। এখানে হৃদয়ের নামোল্লেখ করা হয় নাই।

কোন ব্যক্তি যখন শব্দ উচ্চারণের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ঐরূপ ইচ্ছাবশতঃ তদীয় মূলাধার-চক্রস্থিত কুলকুণ্ডলিনীতে বিকার উপস্থিত হয় এবং তাহারই ফলে সূক্ষ্মতম পরা বাকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পরা বাক্ সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে আরম্ভ করে। স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র অতিক্রম করিয়া এই সূক্ষ্ম বাক্ সহস্রার চক্রে প্রবেশ করে এবং তাহার পরই পুনরায় নিম্নগতি লাভ করিয়া বদনপথে বিনির্গত হয়। উৎপত্তির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চারণের সময় পর্য্যন্ত সকল অবস্থায়ই তাহাকে নাদ বলা যায়। নাভিপদ্ম হইতে উপর দিকে উঠিবার সময় হইতেই যদিও এই নাদের সূক্ষ্ম অবস্থা যোগিগণের নিকট উপলব্ধ হয়, তথাপি সহস্রারে পৌঁছিবার পর সে যে অব্যক্ত ধ্বনি করে, তাহা সর্ব্বসাধারণেরই গোচরীভূত হইতে পারে।

নাদের উৎপত্তি

উচ্চারণেচ্ছা না থাকিলেও দেহমধ্যস্থ বায়ুর চাপে এক প্রকার সূক্ষ্ম-নাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই নাদ নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া সহস্রার চক্রে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় নাভির দিকেই ধাবিত হয়। এইভাবে নাভি ও সহস্রার চক্রের মধ্যে অনবরত তাহার যাতায়াত চলিতে থাকে। এই সূক্ষ্ম নাদ সর্ব্বদাই ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছিতেছে এবং তাহার ফলে সকল সময়েই এক প্রকার অব্যক্ত ধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে। কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধ করিলেই এই নাদ বা ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। নাদ সম্বন্ধে এই সকল গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে শাস্ত্রানুযায়ী সাধনা আবশ্যক। স্থূলবুদ্ধি, অজ্ঞ লোকদের পক্ষে এই গভীর নাদতত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে।

প্রাণবায়ু নিজেই যে নাদ নহে, শব্দের বায়ুস্বরূপতা খণ্ডন করিয়া প্রথম অধ্যায়েই আমরা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছি। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, প্রাণবায়ুর ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছার ফলে নাদের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এই সময়েই দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মনাদ অপেক্ষাকৃত স্থূলতা লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে, "প্রাণো বৈ নাদঃ" (প্রাণই নাদ) কথাটি আছে, তাহাদ্বারা প্রাণ ও নাদের বাস্তব অভিন্নতার কথা বলা হয় নাই। ঐ স্থলে "কার্য্যকারণয়োরভেদঃ" ন্যায় অনুসারে কার্য্য নাদকে কারণ প্রাণের সঙ্গে ব্যাবহারিক অভিন্নরূপে কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুতিটিদ্বারা যেমন পিতা ও পুত্রের

বাস্তব অভিন্নতা বুঝা যায় না, এক্ষেত্রেও তেমনি। এই সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা পরে করিব।

'শব্দকরা' অর্থে নদ্‌ধাতুর প্রয়োগও বিরল নহে। বিভিন্ন পুরাণে এবং রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে গর্জ্জন করা অর্থে নদ্‌ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে "চিক্ষেপ চ ননাদ চ" কথাটি আছে, তাহা হইতে তো রসিক ব্যক্তিরা নানাবিধ

নাদশব্দের প্রয়োগ

মনোমুগ্ধকর গল্পই সৃষ্টি করিয়াছেন। শিবপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে একটি শ্লোকে যে ভাবে নাদ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ধ্বনি অর্থেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে (১)। লিঙ্গপুরাণে প্লুত-ধ্বনি অর্থেও নাদশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (২)। এই

পুরাণ

লিঙ্গপুরাণেই আবার উচ্চারণমাত্র অর্থেও নাদ শব্দের ব্যবহার আছে, এবং এই নাদকে ব্রহ্ম নামেও অভিহিত করা হইয়াছে (৩)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে এবং অভিধানেও (৪) শব্দ অর্থে নাদ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ রণক্ষেত্রে মেঘগর্জ্জনের

রামায়ণ

ন্যায় ভীতিপ্রদ গর্জ্জন করিত বলিয়া রামায়ণে সে মেঘনাদ নামেও অভিহিত হইয়াছে।

কোন কোন উপনিষদে ও অরণ্যকে এবং বিভিন্ন পুরাণে প্রাণীর দেহ-মধ্যস্থিত অস্ফুট সূক্ষ্মশব্দ এবং মহাকাশে নিয়ত-সঞ্চরণশীল

দ্বিবিধ নাদ

স্পন্দনাত্মক সূক্ষ্ম শব্দ, এই উভয়কেই নাদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সিদ্ধাচার্য্যগণ উল্লিখিত প্রকার শাস্ত্রার্থই প্রদর্শন করিয়াছেন। অধঃস্থ আলোচনা দ্বারা আমরাও তাহা পরিস্ফুট করিব। ইহাদ্বারা

---

(১) আদ্যং বর্ণমকারন্তু উকারশ্চোত্তরে ততঃ।
মকারং মধ্যতশ্চৈব নাদান্তং তস্য চোমিতি॥—শিবপুরাণ ; ৩য় অধ্যায়।

(২) তদা সমভবত্তত্র নাদো বৈ শব্দলক্ষণঃ।
ওমোমিতি সুরশ্রেষ্ঠাঃ সুব্যক্তঃ প্লুতলক্ষণঃ॥ —লিঙ্গপুরাণ ; ১৭শ অধ্যায়।

(৩) আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্।
মাত্রাস্তিস্রস্ত্বর্দ্ধমাত্রং নাদাখ্যং ব্রহ্ম সংজ্ঞিতম্॥—ঐ, ঐ।

(৪) স্বান-নির্ঘোষ-নিহ্রাদ-নাদ নিস্বান-নিস্বনাঃ।
অরবারাবসংরাববিরাবাঃ...... ॥ —অমরকোষ ; স্বর্গবর্গ।

সামগ্রিকভাবে ব্যুৎপত্ত্যর্থের গ্রহণ না হইলেও ব্যুৎপত্ত্যর্থকে একেবারে পরিত্যাগ করা হয় নাই। উপনিষৎসমূহের মতে এই সূক্ষ্ম বা অতিসূক্ষ্ম নাদই প্রণব-পদবাচ্য। ইহাকেই উদ্গীথ এবং ওঙ্কারনামে অভিহিত করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয় না হইলে যেমন মনুষ্যসমাজে কর্ম্মশক্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় না, তেমনি এই নাদাত্মক প্রাণ ব্যতিরেকে জীবদেহে বা ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কর্ম্মশক্তির আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয় না—এই কারণে উক্ত নাদকে আদিত্যরূপে কল্পনা করিয়া কোন কোন উপনিষদ্‌বাক্যে তাহাকে আদিত্য নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

উপনিষৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫) যে উদ্গীথ বা প্রাণের উল্লেখ আছে, এবং "আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি" এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে প্রণবকে উদ্গীথরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেই উদ্গীথ, প্রাণ বা প্রণবকেই কোন কোন আচার্য্য নাদব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৩।১) যে উদ্গীথের উল্লেখ আছে, তাহাও এই নাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া কোন কোন আচার্য্য মনে করেন। মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথও তাঁহার নাদলীলামৃত গ্রন্থের ৬৬—৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শ্রুতিগুলির এইরূপ অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন।

নাদ ও উদ্গীথ

বস্তুতঃ, নাদ যে উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধেই আমরা বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের উল্লিখিত শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাঁহারা উদ্গীথ, প্রণব বা নাদকেই ব্রহ্মনামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় কি, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। শ্রুতিতে যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (এই পরিদৃশ্যমান সব কিছুই ব্রহ্ম), এইরূপ উক্তিদ্বারা সমুদয় বস্তুকেই ব্রহ্মের পরিদৃশ্যমান রূপ হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও যদি তেমনি "ব্রহ্মের অসংখ্য রূপের মধ্যে নাদও একটি" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই উল্লিখিত ব্যাখ্যাকারগণের তাদৃশ উক্তি সমর্থন করা যাইতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত 'নাদব্রহ্ম' শব্দটিকে মহাত্মা ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার "নাদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন

(৫) য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তমুদ্গীথমুপাসীত, ওমিতি হি এষ স্বরন্নেতি।

—ছান্দোগ্য; ১ম প্রপাঠক; ৫ম খণ্ড।

(৬)। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। লিঙ্গপুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে (৭) এবং পাতঞ্জল-যোগদর্শনেও নাদ বা প্রণবকে পরমেশ্বরের বাচকরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও প্রাণরূপে নাদের বর্ণনা দেখা যায় (৮)। ইহাদ্বারা উপনিষৎকার স্পন্দনাত্মক সূক্ষ্ম অব্যক্ত ধ্বনির কথাই বলিয়াছেন। দেহে যতক্ষণ স্পন্দন বা অব্যক্ত ধ্বনি বিরাজ করে, ততক্ষণই দেহের প্রাণবত্তা স্বীকৃত হয়। সুতরাং এই স্পন্দন বা অব্যক্ত ধ্বনিই দেহের প্রাণ, ইহাই উপনিষৎকারের অভিপ্রায়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ পুরুষের বিশাল দেহেও যতক্ষণ এই স্পন্দন বা সূক্ষ্ম ধ্বনি অবস্থান করে, ততক্ষণই তাহাতে সৃজনীশক্তি বিদ্যমান থাকে; সুতরাং এই স্পন্দন বা নাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও প্রাণস্বরূপ।

আরণ্যক

বস্তুতঃ, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে নাদ ও প্রাণের বাস্তব অভিন্নতার কথা বলা হয় নাই, এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সমগ্র শ্রুতিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে। পাদটীকায় আমরা সমগ্র শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়াছি। উক্ত শ্রুতির প্রথম দিকে প্রাণ এবং নাদের অভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরেই বলা হইয়াছে—প্রাণ যেন শব্দ করিতে করিতে সব কিছু গ্রাস করিতেছে (প্রাণো নদন্ সর্ব্বমশ্নতীব)। যে নাদ (শব্দ) করে, সে নিশ্চয়ই নাদ হইতে ভিন্ন। যে সাঁতার কাটে, সে নিজে যেমন সাঁতার হয় না; অথবা যে পুস্তক রচনা করে, সে নিজেই পুস্তক হয় না; এক্ষেত্রেও তেমনি "প্রাণ নাদ করে" বলায় বুঝা যায় যে, প্রাণ ও নাদ বস্তুতঃ অভিন্ন নহে। সন্তরণ এবং সন্তরণকারীর মধ্যে অথবা প্রণীত পুস্তক ও তাহার প্রণয়নকারীর মধ্যে যেমন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান, এক্ষেত্রেও তেমনি প্রাণ ও নাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিরাজমান।

প্রাণ ও নাদ

(৬) মহানির্ব্বাণতন্ত্র (জগন্মোহন তর্কালঙ্কার) পৃষ্ঠা ৬৯ এবং ৮০৬ দ্রষ্টব্য।

(৭) চিন্তয়া রহিতো রুদ্রো বাচো যন্মনসা সহ।
অপ্রাপ্য তং নিবর্ত্তন্তে বাচাস্ত্বেকাক্ষরেণ সঃ॥

—লিঙ্গপুরাণ, ১৭শ অধ্যায়।

(৮) স নাদেন বিহরতি; প্রাণো বৈ নাদস্তস্মাৎ প্রাণো নদন্ সর্ব্বমশ্নতীব।

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক (নাদলীলামৃত ৬৮ পৃষ্ঠায় ধৃত)।

সুতরাং উক্ত শ্রুতির প্রথম দিকে প্রাণ ও নাদের যে অভিন্নতার উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারা ব্যাবহারিক অভিন্নতার কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রণবের প্রশংসা

মৈত্রায়ণী-শ্রুতিতেও 'ওঁ' এই প্রণবকে আদিত্যরূপ, জ্যোতিঃরূপ এবং ব্রহ্মরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৯)। বস্তুতঃ এক্ষেত্রেও উল্লিখিত শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, আদিত্য, জ্যোতিঃ এবং ব্রহ্ম প্রত্যেকেই প্রণব-প্রতিপাদ্য।

নাদ ও ওঙ্কার

প্রপঞ্চসার নামক তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থে ওঙ্কার ও নাদের অভিন্নতা-প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কারণরূপ ওঙ্কার স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। উক্ত ওঙ্কারই নাদ, প্রাণ, জীব, ঘোষ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন (১০)।

জ্যোতিরূপ নাদ

এই জ্যোতিঃ রূপ নাদ কিভাবে অনুভব করা যায়, বৃহদারণ্যকের ৫ম অধ্যায় ৯ম ব্রাহ্মণে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—মানুষের দেহস্থিত যে অগ্নিদ্বারা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হয়, তাঁহারই নাম 'বৈশ্বানর'; কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধ করিলে যে শব্দ শ্রুত হয়, উহাই সেই অগ্নির শব্দ। মানুষের দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে তখন আর সে এই শব্দ শুনিতে পায় না (১১)।

এইরূপ শব্দই যে নাদ, স্কন্দপুরাণের একটি শ্লোক ( নাগরখণ্ড, ২৬২ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক ) হইতে তাহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। অতএব, উল্লিখিত শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে দেহে প্রাণ থাকিতেই নাদের শ্রবণ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাদ্বারাও প্রাণ এবং নাদের পার্থক্যই প্রকটিত হইতেছে।

---

(৯) যদ্ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতির্যজ্জ্যোতিঃ স আদিত্যঃ, স বা এষ ওমিত্যেতদাত্মা।

—মৈত্রায়ণী শ্রুতি ( নাদলীলামৃত ৬৮ পৃষ্ঠায় ধৃত )।

(১০) গতো যো বীজতামেব প্রাণিষেব ব্যবস্থিতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং প্রত্যমেতেন ব্যাপ্তং স্থাবর-জঙ্গমম্॥
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে॥—প্রপঞ্চসার ; ৪র্থ পটল।

(১১) অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে, যদিদমদ্যতে, তস্যৈব ঘোষো ভবতি, যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি।

—বৃহদারণ্যক। ৫ম অধ্যায় ; ৯ম ব্রাহ্মণ।

যদিও গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি প্রাণিগণের দেহে বৈশ্বানর রূপে অবস্থান করিয়া চতুর্ব্বিধ খাদ্য পরিপাক করিয়া থাকেন (১২); তথাপি ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মের অসংখ্য রূপের মধ্যে এই জীবদেহস্থিত বৈশ্বানরও একটি রূপ। এই বৈশ্বানর জীবদেহে যে অস্ফুট শব্দ করেন, সেই শব্দই নাদ।

গীতা

শ্রীমদ্ভাগবতে যে রাসলীলার বর্ণনা আছে, তাহাদ্বারাও বস্তুতঃ নাদলীলারই বর্ণনা করা হইয়াছে। রস্ ধাতুর অর্থ—'শব্দ করা'। তাহার উত্তর ভাবে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'রাস' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং রাস শব্দের অর্থ 'শব্দ'। রাসের লীলা বলিতে সূক্ষ্ম শব্দের বা নাদের লীলাকেই বুঝাইতেছে। সৎসঙ্গ-সম্প্রদায়ের গুরু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও তাঁহার "কথা প্রসঙ্গে" নামক গ্রন্থে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন (১৩)।

ভাগবত

অনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলিয়াছেন—প্রাণীর অভ্যন্তরস্থিত নাদলীলাই রাসলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু, আমার মনে হয়, ইহাদ্বারা মহাকাশে স্থিত যাবতীয় স্পন্দনই লক্ষিত হইয়াছে। গোপীগণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্পন্দনস্থানীয়; আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কেন্দ্রশক্তি। এই স্পন্দনের লীলা সর্ব্বত্রই প্রায় সমানভাবে চলিতেছে। স্পন্দন হইলেই ব্যক্ত বা অব্যক্ত একটি শব্দ হয়; এই শব্দই নাদব্রহ্মবাচ্য। শাস্ত্রকারেরা বলেন—এই নাদাত্মক স্পন্দনের ফলেই পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল স্পন্দন, পরমাণু এবং নাদই কল্পিত হইয়াছেন—গোপীরূপে।

শারদোৎফুল্ল রজনীকে এই নাদলীলার সময়রূপে নির্ব্বাচন করার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মে মায়াশক্তির আবির্ভাবের ফলেই এই নাদলীলার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অন্ধকার অজ্ঞানতার প্রতীক। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় যখন কোন স্পন্দন ছিল না, সেই সময়কে অন্ধকাররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। আর

---

(১২) অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ॥
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ —গীতা ১৫।১৪॥

(১৩) রাসলীলা মানে শব্দলীলা। আর সে শব্দ মানুষের আভ্যন্তরিক কোষ-স্পন্দনেরই—যা নাকি আপ্রাণ টান থেকে ভেতরে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই তাপে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়েই এমনতর হয়ে থাকে। —কথাপ্রসঙ্গে। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৪।

তাহা হইলে তাহার বিপরীত অবস্থা অবশ্যই আলোকময় হইবে। এই জ্ঞানের আলোককে কিছুতেই উগ্ররূপে কল্পনা করা চলে না; তাই ভাগবতের ঋষি কবি শারদোৎফুল্ল রাত্রিকে নাদলীলার উপযুক্ত সময়রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই রাত্রিশব্দ আবার বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে ( তাঃ রাত্রীঃ )। তাৎপর্য্য এই যে, এবংবিধ নাদলীলা সময়-বিশেষে সীমাবদ্ধ হয়। স্মরণাতীত কাল হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে এবং স্মরণাতীত কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের ১।১।৭ সূত্রে ধ্বনি অর্থে নাদশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (১৪) এবং পরবর্ত্তীকালের ব্যাখ্যা-কারগণও উল্লিখিত সূত্রস্থিত নাদশব্দের ধ্বনি অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন (১৫)।

মীমাংসা

মীমাংসক-শ্রেষ্ঠ কুমারিল ভট্টও স্ফোটবাদ-প্রসঙ্গে ধ্বনি অর্থেই নাদ শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। আচার্য্য কুমারিল স্পষ্ট ভাষায়ই নাদকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিয়াছেন (১৬)। অন্যান্য-মীমাংসকদের লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারাও নাদের শব্দব্যঞ্জকতাই স্বীকার করিতেন। মহর্ষি জৈমিনি "নাদবৃদ্ধিপরা" সূত্রে নাদের যে স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও নাদকে শব্দের ব্যঞ্জকই মনে করিতেন। উল্লিখিত সূত্রে মহর্ষি জৈমিনি শব্দের উচ্চ-নীচাদি অবস্থাকেই নাদ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ শব্দ-তরঙ্গের এই উচ্চ-নীচাদি অবস্থা (frequency range)ই যে শব্দ শ্রবণের হেতু, তাহা আধুনিক শব্দ(রেডিও)বিজ্ঞানবিদ্গণও যান্ত্রিক পরীক্ষাদ্বারা অবগত হইয়াছেন।

যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি নাদকে পদের অংশরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। বিভূতিপাদের ১৭শ সূত্রের ভাষ্যে টীকাকার ব্যাস পদকে 'নাদানুসংহার-বুদ্ধিনির্গ্রাহ্য' বলিয়া

যোগদর্শন

(১৪) নাদবৃদ্ধিপরা। —জৈমিনিসূত্র ১।১।৭ ॥

(১৫) উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণের বাহুল্যে শব্দের যে বৃদ্ধি অর্থাৎ আধিক্য হয়, তাহা শব্দের বৃদ্ধি নহে, কিন্তু নাদের অর্থাৎ ধ্বনিরই বৃদ্ধি।

—মীমাংসা-দর্শন ( ভূতনাথ সপ্ততীর্থ ); পৃষ্ঠা—৫৯ ॥

(১৬) তেন যৎ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লভ্যতে।
ব্যক্তিলভ্যস্তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্বৃথা ॥

—মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক; স্ফোটবাদ প্রকরণ; শ্লোক—২৬।

পতঞ্জলির উল্লিখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যাসভাষ্যের ঐ অংশের ব্যাখ্যায় আচার্য্য হরিহরানন্দ আরণ্য অ, আ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণকেই-নাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিও তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের কোন কোন শ্লোকে ধ্বনি অর্থে নাদ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং টীকাকার পুণ্যরাজ ঐ সকল শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, উক্ত শ্লোক-সমূহে ধ্বনি অর্থেই নাদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রহ্মকাণ্ডের ৪৮, ৮৫ এবং ১০৩ সংখ্যক শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে (১৭)।

ভর্ত্তৃহরি

আচার্য্য অভিনব গুপ্তও তাঁহার 'তন্ত্রালোক' নামক গ্রন্থে শব্দকে নাদাত্মক বলিয়া শব্দ হইতে নাদের অভিন্নতাই অঙ্গীকার করিয়াছেন (১৮)। বিন্দু, নাদ ইত্যাদির মধ্যে যে নাদের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত নাদ যে শব্দাত্মক নাদ হইতে ভিন্ন নহে, তাহাও তন্ত্রালোকের প্রথম আহ্নিক ৬৩ শ্লোক এবং উহার জয়রাজকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ হইতে জানা যায় (১৯)। উক্ত ৬৩ তম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে আচার্য্য শব্দের উল্লেখ করিয়া আবার দ্বিতীয়ার্দ্ধে নাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহাদ্বারা শব্দ হইতে নাদের ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। বিন্দুনাদাদিসংভিন্ন কথাটি যে তন্ত্রশাস্ত্রবর্ণিত ষড়্‌বস্তুস্বরূপ শিবের বৈশিষ্ট্যমাত্র প্রতিপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, টীকাকার জয়রথ স্পষ্টভাবেই ইহা বলিয়াছেন।

অভিনব গুপ্ত

জয়রাজ

---

(১৭) নাদস্য ক্রমজাতত্বান্ন পূর্ব্বো নাপরশ্চ সঃ।
অক্রমঃ ক্রমরূপেণ ভেদবানিব লক্ষ্যতে॥ —ব্রহ্মকাণ্ড; ৪৮ শ্লোক।
নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ।
আবৃত্তি-পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্য্যতে॥ —ঐ, ৮৫॥
যঃ সংযোগ-বিভাগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোটঃ, শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ॥ —ঐ, ১০৩॥

(১৮) যোঽসৌ নাদাত্মকঃ শব্দঃ সর্ব্বপ্রাণিষ্ববস্থিতঃ।
—তন্ত্রালোক; ৩য় আহ্নিক; ১১৩ শ্লোক।

(১৯) ভুবনং বিগ্রহো জ্যোতিঃ খং শব্দো মন্ত্র এব চ।
বিন্দুনাদাদিসংভিন্নঃ ষড়্‌বিধঃ শিব উচ্যতে॥
—ঐ, ১ম আহ্নিক; ৬৩ শ্লোক।
শব্দো নাদাত্মা।—ঐ, জয়রাজকৃত টীকা।

তন্ত্রশাস্ত্রেই নাদ সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা দেখা যায়। তবে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহে যেমন স্থূল শব্দ অর্থেও নাদশব্দের প্রয়োগ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রে প্রায়ই সেইরূপ দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে নাদ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সারদা-তিলকে বলা হইয়াছে যে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অখণ্ড পরমেশ্বর হইতে শক্তির সৃষ্টি হয়; অতঃপর উক্ত শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয় (২০)।

তন্ত্র

সারদা-তিলক

প্রপঞ্চসার নামক গ্রন্থের প্রথম পটলে বলা হইয়াছে—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হন। অতঃপর এই বিন্দু তিনভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিন্দুর এই তিনটি বিভাগ বিন্দু, নাদ ও বীজ নামে কথিত হয়। এই ভিদ্যমান বিন্দু হইতেই অব্যক্ত শব্দাত্মক ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে (২১)।

প্রপঞ্চসার

বিন্দুর উৎপত্তি সম্বন্ধে সারদা-তিলকে যাহা বলা হইয়াছে, প্রপঞ্চসারের কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে উক্ত উভয়গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব। সারদা-তিলকে যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনিই প্রকৃতি এবং তাঁহারই বিকৃত অবস্থা বিন্দু। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির প্রাক্কালে সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির মধ্যে বিকারের উদ্ভব হয়, এবং তাহা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী স্পন্দনাত্মক সূক্ষ্ম নাদের উৎপত্তি হইতে থাকে। এই বহিঃস্থিত সূক্ষ্ম নাদই অবশেষে জীবদেহের মূলাধারচক্রে আত্মপ্রকাশ

সামঞ্জস্য-সাধন

---

(২০) সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥ —সারদাতিলক ১।৭

(২১) সা তত্ত্বসংজ্ঞা চিন্মাত্রা জ্যোতিষঃ সন্নিধেস্তদা।
বিচিকীর্ষুর্ঘনীভূতা কচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্ ॥৪১॥
কালেন ভিদ্যমানস্তু স বিন্দুর্ভবতি ত্রিধা।
স্থূলসূক্ষ্মপরত্বেন তস্য ত্রৈবিধ্যমিষ্যতে ॥৪২॥
স বিন্দুনাদবীজত্বভেদেন চ নিগদ্যতে।
তদ্‌বিস্তারপ্রকারোঽয়ং যথা বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥৪৩॥
বিন্দোস্তস্মাদ্ ভিদ্যমানাদ্ রবোঽব্যক্তাত্মকো ভবেৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নৈঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে ॥৪৪॥—প্রপঞ্চসার; প্রথম পটল।

করেন। সারদা-তিলকে যে শক্তি হইতে নাদের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিন্দুরূপিণী শক্তি হইতে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অব্যক্ত নাদমালা; আর নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি বলিতে সারদাতিলককার বিন্দু শব্দদ্বারা জীবদেহস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, সারদাতিলকের উক্তির সঙ্গে প্রপঞ্চসারের উক্তির বস্তুতঃ বিরোধ নাই; কেবলমাত্র বক্তার উদ্দেশ্যই ভিন্ন।

কুব্জিকাতন্ত্র

কুব্জিকাতন্ত্রের প্রথম পটলে যে বিন্দু হইতে নাদ ও তাহা হইতে শক্তির উদ্ভবের কথা বলা হইয়াছে (আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদঃ, নাদাদ্ বিন্দু-সমুদ্ভবঃ), তাহাতেও শক্তি শব্দদ্বারা বিকৃতিপ্রাপ্তা প্রকৃতিকে, নাদশব্দদ্বারা দেহবহিঃস্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অব্যক্ত শব্দরাশিকে এবং বিন্দু শব্দদ্বারা দেহমধ্যস্থ কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকেই গ্রন্থকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

রাঘব-ভট্ট

সারদাতিলক (১।১১) বলিয়াছেন—পরবিন্দু ভিদ্যমান হইলে তাহা হইতে অব্যক্ত রবের (শব্দ বা নাদের) উদ্ভব হয়। ইহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য রাঘব ভট্ট স্পষ্ট ভাষায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরবিন্দু শব্দদ্বারা শক্তির বিকৃত অবস্থারূপ প্রথম বিন্দুর কথাই বলা হইয়াছে (২২)। বিন্দুর এই 'প্রথম' বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার মত। শক্তি বলিতে আচার্য্য রাঘব-ভট্ট প্রকৃতিকেই বুঝিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সারদাতিলকে বর্ণিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আমরা উপরে যে ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছি, এখানেও তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

ক্রিয়াসার

ক্রিয়াসার নামক গ্রন্থে যে, শিবাত্মক বিন্দু এবং শক্ত্যাত্মক বীজ এই উভয়ের যোগে নাদের সৃষ্টি হয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (২৩), তাহাতেও গ্রন্থকার বিন্দু শব্দদ্বারা পরবিন্দু বা আদি-স্পন্দনাত্মক প্রথম বিন্দুকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মহার্থ-মঞ্জরী

মহার্থ-মঞ্জরী নামক গ্রন্থের ৪২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহাত্মা মহেশ্বরানন্দ যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আদি স্পন্দনকেই তিনি বিন্দুরূপে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম স্তররূপে স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, এই বিন্দুতে

---

(২২) পরাদ্ বিন্দোরিত্যনেন শক্ত্যবস্থারূপো যঃ প্রথমো বিন্দুস্তস্মাদব্যক্তাত্মা বর্ণাদিবিশেষরহিতোঽখণ্ডো নাদমাত্রং রব উৎপন্নঃ।—পদার্থাদর্শ ১।১১ ॥

(২৩) বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ ॥ —ক্রিয়াসার।

যখন বুদ্ধিলাভেচ্ছারূপ শক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই এই বিন্দু ও শক্তির সংযোগের ফলে মনঃরূপ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি পরিস্পন্দ জন্মে। ইহারই ফলে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীতে নাদাত্মক সূক্ষ্ম শব্দ বা পরাবাকের আবির্ভাব ঘটে (২৪)। মহাত্মা মহেশ্বরানন্দ উল্লিখিত গ্রন্থের ১৪ শ শ্লোকে এবং উহার ব্যাখ্যায় আবার আদিস্পন্দনাত্মক বিন্দুরূপী শিব এবং শক্তির মধ্যে অভিন্নতাও কল্পনা করিয়াছেন। এই স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, শিবাত্মক বিন্দুর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অবস্থাই শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে (২৫)। সম্ভবতঃ 'কার্য্যকারণয়োরভেদঃ' ন্যায় অনুসারেই আচার্য্য এই কথা বলিয়াছেন।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বপ্রথম যে পরবিন্দুর উদ্ভব হয়, 'কার্য্যকারণয়োরভেদঃ' ন্যায় অনুসারে সারদাতিলকের রচয়িতা তাহাকে শিব (পরমেশ্বর) স্বরূপ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সারদা-তিলককার আরও বলিয়াছেন যে, বীজ শক্তিস্বরূপ এবং নাদ উভয়াত্মক (২৬)। আচার্য্য ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে সারদাতিলকের উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্লোকে শিবাত্মক শব্দদ্বারা চিন্ময়, শক্তিস্বরূপ কথাদ্বারা প্রকৃতিময় এবং উভয়াত্মক কথাটিদ্বারা 'শিবশক্তির সমবায়-স্বরূপ' এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হইতেছে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

নাদ হইতে যে দ্বিতীয় বিন্দুর উদ্ভব হয়, সারদাতিলক বলেন, তাহা তিনভাগে বিভক্ত; যথা—বিন্দু, নাদ ও বীজ (২৭)। প্রপঞ্চসার নামক গ্রন্থেও (১।৪৩) এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে—পরম বিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্তস্বরূপ অপর-প্রণব

---

(২৪) প্রমাত্রংশময়ঃ কশ্চিৎ আদ্যস্পন্দঃ, তদনু তস্যৈব উপরি প্রসরণোন্মুখ্যরূপা শক্তিঃ কাচিৎ, অথ তস্য প্রমাণস্ফুরণরূপঃ কশ্চিদিন্দ্রিয়-পরিস্পন্দঃ, ততশ্চ বস্তুব্যবস্থাপনাত্মিকা তত্র স্ফুরত্তা। —মহার্থমঞ্জরী, ৪২ তম শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(২৫) য উক্তস্বভাবঃ শিবঃ স এব শক্তিস্বভাবঃ কথিতঃ, তস্যৈব কিঞ্চিদুচ্ছূনতায়াং যা অবস্থা তস্যা শক্তিশব্দব্যপদেশ্য ইত্যর্থঃ। —মহার্থমঞ্জরী, ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(২৬) বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥—সারদাতিলক ১।৯॥

(২৭) পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥ —ঐ ১।৮॥

উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এই অপর-প্রণবই শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—এই অপর প্রণব কি? তন্ত্রাচার্য্যগণ এই অপর-প্রণবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাহার সাতটি অঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন;

সপ্তাঙ্গ-প্রণব

যথা—অ, উ, ম, ৺ (নাদ), • (বিন্দু),—(কলা), এবং — (কলাতীত)। প্রণব বলিতে ওঙ্কারকে বুঝায়; তবে কি 'ওঁ' এই বর্ণটির মধ্যেই উল্লিখিত ৭টি অঙ্গ বিদ্যমান? এই সংশয়ের উত্তর তন্ত্রাচার্য্য ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার তাঁহার মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যায় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'ওঁ' এই বর্ণটী প্রণব নহে, কিন্তু যিনি এই বর্ণের বাচ্য তিনিই অপর-প্রণব বা শব্দব্রহ্ম। তাঁহাতেই উল্লিখিত সপ্তাঙ্গ বিদ্যমান (২৮)।

অপর প্রণবের মধ্যে উল্লিখিত সপ্তাঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও এতদ্ব্যতিরিক্ত নাদ এবং বিন্দুর অস্তিত্বও তন্ত্রাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পঞ্চমোল্লাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এই কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন (২৯)। তাহা ছাড়া, ভূতশুদ্ধির বিধানেও অনুরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ রচিত "শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত" গ্রন্থের ভূমিকায় মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নাদের স্বরূপ, ক্রমভেদ এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। নাদের স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের যে একটি সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে বলিয়া বিভিন্ন

পরাবাক্ই পরনাদ

গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন, এবং বিভিন্ন গ্রন্থে যাহাকে পরাবাক্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই নাদ বা পরনাদ বলে। এই নাদ বস্তুতঃ চিদাত্মিকা শক্তি (৩০)। অব্যক্ত

---

(২৮) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র (জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত); পৃষ্ঠা—৬৯।

(২৯) কুণ্ডলিনী শক্তি যথাযথ স্থানে বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করিলে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে।

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; পাদটীকা; পৃষ্ঠা—১৯৩॥

পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদলপদ্ম ভেদ পূর্ব্বক যেমন উত্থিত হইতে থাকেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়।—ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা—১৯২।

(৩০) এই অবিভক্ত বর্ণ বা (পর) নাদ কিংবা (পর) জ্যোতিঃ বস্তুতঃ চিদাত্মিকা শক্তি। ইহাই 'পরা বাক্' পদবাচ্য। —শ্রীশ্রীনাদলীলামৃতের ভূমিকা; পৃষ্ঠা—১৸৴৹

ধ্বনিবিশেষই যে নাদ, তাহাও উল্লিখিত আচার্য্য স্পষ্টভাষায়ই বলিয়াছেন (৩১)।

প্রণব-সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ বিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্ম্মপ্রচারক স্বামী স্বরূপানন্দের উপদেশাবলী 'অখণ্ড-সংহিতা' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত গ্রন্থের নবম খণ্ডে নাদের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামিজীর উপদেশ নিবদ্ধ আছে। স্বামী স্বরূপানন্দও দেহাভ্যন্তরস্থ অব্যক্ত ধ্বনি বিশেষকেই নাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন (৩২)। পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমা—এই তিনটি অবস্থাই অব্যক্ত। তন্মধ্যে পরাবাক্ সূক্ষ্মবুদ্ধিরও অগম্য হওয়ায় উল্লিখিত আচার্য্যগণ যে অব্যক্ত

পশ্যন্তী মধ্যমা ও নাদ

ধ্বনিকে নাদ বলিয়াছেন, তাহা বাকের পশ্যন্তী অথবা মধ্যমা অবস্থাই হইবে। অতিসূক্ষ্ম পরাবাকের প্রতিপাদক বিশেষণযুক্ত পরনাদ শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়াও ইহাই প্রতীত হয়।

পরাবাগ্‌রূপিনী চিচ্ছক্তি সূক্ষ্মতমরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ইহার মধ্যে স্বরগত, মাত্রাগত কিংবা গুণগত কোন বিভাগ নাই—ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত। এই সূক্ষ্মতম নাদের উৎপত্তি, বিকার এবং বিনাশ অনুভবসিদ্ধ নহে বলিয়াই আচার্য্যগণ ইহাকে শব্দব্রহ্মনামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে যে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির কথা বলা হইয়াছে; তাঁহারই নামান্তর

কুল কুণ্ডলিনী

বিন্দু বা বিশুদ্ধ সত্ব। এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপ ধারণ করতঃ উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকেন। ইহা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং মহামনীষী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও স্পষ্ট ভাষায়ই এইরূপ বলিয়াছেন (৩৩)।

কোন কোন গ্রন্থে আবার পশ্যন্তী বাক্‌কেই নাদ নামে

যোগশিখা উপনিষৎ

অভিহিত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যোগশিখোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁহার নাদলীলামৃত গ্রন্থে

(৩১) এই নাদই অব্যক্ত ধ্বনি বা অচল অক্ষরমাত্র।—ঐ, পৃষ্ঠা—৬৶০

(৩২) মনে মনে 'ওম্' 'ওম্' উচ্চারণ করে যাও আর লক্ষ্য করতে থাক, এই 'ওম্' 'ওম্' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ধ্বনি নিজেকে প্রকাশ কচ্ছেন। কিছু দিন অভ্যাস করলেই একটা অনির্ব্বচনীয় নাদের স্ফুরণ টের পাবে।—অখণ্ডসংহিতা; ৯ম খণ্ড; পৃষ্ঠা—৩১।

(৩৩) কুণ্ডলিনী শব্দমাতৃকা; বিন্দু বা বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহার নামান্তর। মন ও বায়ুর উর্দ্ধমুখ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপ ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে বহিতে থাকে।
—নাদলীলামৃতের ভূমিকা; পৃষ্ঠা—৬৶০

যোগশিখোপনিষদের এইরূপ একটি উক্তি (৩৪) উদ্ধৃত করিয়া তাহারই সমর্থন করিয়াছেন (৩৫)।

বস্তুতঃ মধ্যমা এবং বৈখরী বাক্‌কেও নাদ বলা যাইতে পারে; কারণ নাদশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করিলে ইহাদিগকেও নাদ না বলিবার কোন কারণ নাই।

সোমানন্দ নাথ নামক বিখ্যাত তান্ত্রিক তাঁহার "শিবদৃষ্টি" নামক গ্রন্থে

শিবদৃষ্টি

শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে পশ্যন্তী বাক্ নামে অভিহিত করিয়া ইহাকেই শব্দব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (৩৬)। উক্ত পুস্তকের "বৃত্তি" নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে মহাত্মা উৎপলদেবও আচার্য্যের

উৎপল দেব

এবংবিধ অভিপ্রায়ই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আচার্য্য সোমানন্দ আবার এই পশ্যন্তী বাক্‌কেই পরা (শিবদৃষ্টি ২।২) ও মধ্যমা বাক্‌রূপে (শিবদৃষ্টি ২।৬) বর্ণনা করিয়া বৈখরী বাক্‌কেও ইহারই অবস্থান্তররূপে (শিবদৃষ্টি ২।৭) বর্ণনা করিয়াছেন।

পশ্যন্তী নামের কারণ সম্বন্ধে যোগশিখোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, যোগিগণ ইহার সাহায্যে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান অবগত হন বলিয়াই ইহাকে পশ্যন্তীবাক্ নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ যদিও বৈখরী বাকের সাহায্যেই জ্ঞানের আদান প্রদান হইয়া থাকে, তথাপি পরা প্রভৃতি সূক্ষ্মতর অবস্থা ব্যতিরেকে বৈখরীরূপ স্থূল অবস্থার উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় শব্দের প্রত্যেকটি অবস্থাকেই উল্লিখিত অর্থে পশ্যন্তী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যাঁহারা পশ্যন্তী বাক্‌কেই বিশ্বের কারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ব্যুৎপত্ত্যর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

## নাদের ক্রমবিভাগ

আগম-শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে নাদাত্মক সূক্ষ্ম শব্দকে বিশ্বের আদি কারণ-রূপে স্বীকার করিয়া তাহার মৌলিক একত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে; তবে

একত্ব

বিভিন্ন গ্রন্থে এই আদি-কারণের বিভিন্ন নাম দেখা যায়। কোথাও তিনি ব্রহ্মনামে, কোথাও আত্মা নামে কোথাও বা শিব, শিব-ভট্টারক বা ভৈরব নামে অভিহিত হইয়াছেন।

---

(৩৪) তাং পশ্যন্তীং বিদুর্বিশ্বং যয়া পশ্যন্তি যোগিনঃ।—যোগশিখোপনিষৎ।

(৩৫) পশ্যন্তী বাক্‌টি নাদরূপ।—নাদলীলামৃত; পৃষ্ঠা ২৯০॥

(৩৬) শিবদৃষ্টি; দ্বিতীয় আহ্নিক; শ্লোক ৪—৫॥

'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্' প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে তাঁহার দ্বৈবিধ্য, ত্রৈবিধ্য বা চাতুর্ব্বিধ্যেরও স্বীকৃতি দেখা যায়। একই নাদাত্মক ব্রহ্ম বা আত্মা কখনও প্রকাশিত হন, কখনও বা নিজেকে সঙ্কোচিত করিয়া রাখেন; এই কারণে আগমশাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রকাশও সঙ্কোচ ভেদে তাঁহার দ্বিবিধ অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন (৩৭)।

দ্বৈবিধ্য

আমাদের নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অস্ফুট শব্দ হয়, তাহাকেও আচার্য্যগণ নাদই বলিয়াছেন। নিঃশ্বাস বহির্গত হওয়ার সময়ে 'হ' বা 'হম্' এইরূপ একটি শব্দ হয়, এবং শ্বাস গ্রহণের সময়েও 'স' বা 'সঃ' এইরূপ একটি শব্দ হইয়া থাকে (৩৮)। এই দ্বিবিধ শব্দকেও নাদের দুইটি অবস্থা বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধাচার্য্যগণ বলেন—আমরা দিবারাত্রিতে যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করি, তাহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিলে, তাহাদের প্রত্যেকটি দ্বারা এক একবার নাদাত্মক পরব্রহ্মের নাম জপ হইতে পারে। এইভাবে নিঃশ্বাস্ প্রশ্বাসের সঙ্গে যে নামের জপ হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহাকে অজপা গায়ত্রী নামে অভিহিত করিয়াছেন (৩৯)।

অজপা গায়ত্রী

কি কারণে ইহাকে অজপা-গায়ত্রী বলা হইল, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার মত। গায়ত্রী-মন্ত্রের জপ যথাবিধি করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় বলিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত আছে। যাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা বা ইষ্ট মন্ত্রের জপ করেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের এমন এক অভ্যাস হইয়া যায় যে, ইচ্ছা না থাকিলেও এইরূপ অভ্যাসের ফলে প্রতিটি নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে এক একবার ব্রহ্মের বা ইষ্টদেবতার নাম তাঁহাদের নাসাপথে উচ্চারিত হইয়া

---

(৩৭) স চৈকো দ্বিরূপস্ত্রিময়শ্চতুরাত্মা সপ্তপঞ্চকস্বভাবঃ।—প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্; সূত্র—৭॥
প্রকাশরূপত্ব-সঙ্কোচাবভাসবত্ত্বাভ্যাং দ্বিরূপঃ। আণব-মায়ীয়-কার্ম্মমলাবৃতত্বাৎ ত্রিময়ঃ।
—ঐ ব্যাখ্যা।

(৩৮) হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।—নাদবিন্দূপনিষৎ। শ্লোক—৬২॥

(৩৯) হংস-হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
শতানি ষট্ দিবারাত্রং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা॥—নাদবিন্দূপনিষৎ। শ্লোক—৬৩—৬৪॥

যায়। এইভাবে প্রত্যহ ২১৬০০ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করার ফলে অতি সত্বর তাঁহারা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। গায়ত্রী বা অন্য মন্ত্র জপ করিতে যে আয়াসের আবশ্যক হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অভ্যাস বশতঃ ইষ্টমন্ত্র জপে সেইরূপ তো দূরের কথা, কোন আয়াসেরই আবশ্যক হয় না। বিনা চেষ্টায়, এমন কি ইচ্ছা-ব্যতিরেকেও এইভাবে নামের জপরূপ গায়ত্রী জপ হইয়া যায় বলিয়াই, এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসকে সিদ্ধাচার্য্যগণ অজপা-গায়ত্রী নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবিদ্যমানো জপো যস্যাং, সা (গায়ত্রী)—অজপা।

যাঁহারা শব্দকে শাব্দ-পরমাণুর সমষ্টি মনে করেন, তাঁহাদের মত স্বীকার করিলে, এই নাদকে আণব-মলাবৃত, মায়ামলাবৃত এবং কর্ম্মজ-মলাবৃত হিসাবে ত্রিবিধরূপেও কল্পনা করা যায় (৪০)। মলাবৃত বলিবার কারণ এই যে, আগমবেত্তাগণ একমাত্র শিব বা ব্রহ্মভিন্ন অবশিষ্ট সব কিছুকেই মল বা মোক্ষলাভের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়-সমূহ তাঁহাদের মতে মলাত্মক; অতএব, এই মলাত্মক ইন্দ্রিয়দ্বারা যে শাব্দ পরমাণুর উদ্ভব হয়, তাহাকেও তাঁহারা মলাবৃত বলিয়াই কল্পনা করিয়া থাকেন। নাদকেও তাঁহারা ব্রহ্ম বা শিবস্বরূপ মনে করেন; এই কারণে তাহাকে মল না বলিয়া তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাকে মলাবৃত বলিয়াছেন।

ত্রৈবিধ্য

নাদের অগ্রাহ্য অবস্থায় যখন আমরা তাহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না, তখনও ইন্দ্রিয়রূপ মলের অসামর্থ্যই নাদের প্রকাশাভাবের কারণ বলিয়া তখনও তাহাকে মলাবৃত বলা যাইতে পারে। তবে এই অবস্থায় তাহাকে আণব-মলাবৃত না বলিয়া মায়ামলাবৃত বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। মায়াশব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে আগমবেত্তারা বলিয়াছেন—প্রলয়কালে ইহার মধ্যে যাবতীয় পদার্থ বিলীন হইয়া থাকে এবং পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে ইহা হইতেই সব কিছুর প্রকাশ হয়—এই কারণে আদ্যা মাহেশ্বরী শক্তি মায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকেন (৪১)। আবার কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ বা বিভাগ অথবা অন্য

মায়ার ব্যুৎপত্তি

(৪০) পাদটীকা ৩৭ দ্রষ্টব্য।

(৪১) মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ ব্যক্তিং যাতীতি মায়া।

—ভট্টনারায়ণকৃত বৃত্তি ( মৃগেন্দ্রতন্ত্র। বিদ্যাপাদ, ২।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা )।

শক্তিরূপেণ কার্য্যাণি তল্লীনানি মহাক্ষয়ে।

দ্রব্যের সংযোগ কিংবা বিভাগের ফলেই শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপ সংযোগ বা বিভাগের অভাবেই শব্দের প্রকাশাভাব ঘটে। সংযোগ ও বিভাগ উভয়েই কর্ম্মবিশেষ; অতএব আচার্য্যগণ এইরূপ কর্ম্মজ মলদ্বারা আবৃত নাদাত্মক শব্দের একটি তৃতীয় অবস্থাও কল্পনা করিয়াছেন।

আগমবিদ্‌গণ বিন্দুর তিনটি পৃথক্ অবস্থারও বর্ণনা করিয়াছেন। মূলাধার হইতে অনাহত চক্র পর্য্যন্ত গমনকালে বিন্দুর প্রথম অবস্থা বিদ্যমান থাকে। অনাহত হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত গতিতে তাহার দ্বিতীয় অবস্থা এবং ভ্রূমধ্য হইতে ললাটমধ্যে গমনকালে তাঁহার তৃতীয় অবস্থায় পরিণতি ঘটে (৪২)। প্রথম অবস্থায় বা প্রথম কূটে তাহাকে বহ্নিকুণ্ডলিনী, দ্বিতীয় কূটে সূর্য্যকুণ্ডলিনী এবং তৃতীয় কূটে সোমকুণ্ডলিনী নামেও অভিহিত করা হয়। এই তিনটি অবস্থায়ও বিন্দুকে নাদ বলা হয়। পরা প্রভৃতি বাক্ হইতে পৃথগ্‌ভাবে ইহাকে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, উক্ত তিনটি অবস্থার এক একটিতে বিন্দু বা নাদের ধ্যান করিলে সাধক এক এক প্রকার ফল লাভ করিয়া থাকেন। প্রথম বিন্দুর সাধনায় সকল আশা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় বিন্দুর সাধনায় সর্ব্বসৌভাগ্যলাভ এবং তৃতীয় বিন্দুর সাধনায় সর্ব্বব্যাধির বিনাশ হইয়া থাকে। বরিবস্যারহস্য (৪৩) প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম বিন্দুর ধ্যান মূলাধারে অথবা অনাহত চক্রে করা চলে। দ্বিতীয় বিন্দুর ধ্যান ভ্রূমধ্যে এবং তৃতীয় বিন্দুর ধ্যান ললাটমধ্যে করিতে হয়।

ত্রিবিধ বিন্দু

তান্ত্রিক আচার্য্যগণ শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থার মধ্যেও বীজ, বিন্দু ও নাদ এই তিনটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। আচার্য্য নাগেশ ভট্ট তাঁহার 'মঞ্জূষা' নামক গ্রন্থে বীজ, বিন্দু ও নাদের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দকৃত 'আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ' নামক গ্রন্থেও আচার্য্য নাগেশের এই মত সমর্থিত হইয়াছে। মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহোদয়ও তাঁহার

বিকৃতৌ ব্যক্তিমায়াস্তি·······।। শ্রীসৌরভেয়গ্রন্থ ( ভট্টনারায়ণধৃত )।
তাসাং মাহেশ্বরী শক্তিঃ সর্ব্বানুগ্রাহিকা শিবা।
ধর্ম্মানুবর্ত্তনাদেব পাশ ইত্যভিধীয়তে।।—মৃগেন্দ্রতন্ত্র ; বিদ্যাপাদ ৭।১১ ॥

(৪২) প্রলয়াগ্নিনিভং প্রথমং মূলাধারাদনাহতং স্পৃশতি।
তস্মাদাজ্ঞাচক্রং দ্বিতীয়কূটং তু কোটিসূর্য্যাভম্ ।।
তস্মাল্ললাটমধ্যং তার্তীয়ং কোটিচন্দ্রাভম্ ।।—বরিবস্যারহস্যম্ ১।২০—২১ ॥

(৪৩) প্রথম অংশ ৩৬ তম শ্লোক এবং উহার ব্যাখ্যা।

নাদলীলামৃত নামক গ্রন্থে নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতের উল্লেখক্রমে উহা সমর্থন করিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যগণ পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়াছেন—

বিন্দুর তিন অংশ

বিন্দুর অচিদংশের নাম বীজ, চিদচিন্মিশ্র অংশের নাম নাদ এবং চিদংশের নাম বিন্দু (৪৪)। এই চিদংশ, অচিদংশ এবং চিদচিন্মিশ্র অংশ বলিতে আচার্য্যগণ কি বুঝিয়াছেন, তাহাও এইক্ষেত্রে আলোচনা করা আবশ্যক।

আচার্য্য নাগেশ তাঁহার মঞ্জুষাগ্রন্থে লিখিয়াছেন—সৃষ্টির আদিতে গুণাতীত পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁহার মধ্যে সিসৃক্ষারূপিণী মায়াশক্তির আবির্ভাব হয়। তাহার পরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে (৪৫)। এই বিন্দুর যে তিনটি অবস্থা কল্পিত হইয়াছে, নাগেশভট্টের লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাহাতে তিনি বীজরূপ অচিদংশকেই প্রথম স্তর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। নাদরূপ চিদচিন্মিশ্র অংশ দ্বিতীয়স্তরে এবং বিন্দুরূপ চিদংশ তৃতীয় স্তরে কল্পিত হইয়াছে। অচিৎ শব্দের অর্থ—অবিদ্যা। অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থে মায়াশক্তিই অবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণের উল্লিখিত লেখা হইতেও বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতেও সর্ব্বপ্রথম অবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং অতঃপর এই অবিদ্যা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইলে তাহা হইতে বিদ্যা ও অবিদ্যার সংমিশ্রণে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়; চিৎ বা বিদ্যা ইহারই পরিণত অবস্থা।

শাস্ত্রকারেরা আবার পরনাদ, অনাহত নাদ এবং নাদ এইরূপ তিনটি বিভিন্ন নামে নাদের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ও নাদলীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায়ই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। পরনাদের স্বরূপ-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—

"তিনি (পরমেশ্বর) অজড় বা চিদাত্মক বলিয়া নিজ স্বরূপের আমর্শন

(৪৪) তস্য বিন্দোরচিদংশো বীজং চিদচিন্মিশ্রোঽংশো নাদঃ, চিদংশো বিন্দুঃ।

—মঞ্জুষা (আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপধৃত)।

বিন্দুর অচিদংশের নাম বীজ, চিদচিন্মিশ্র অংশের নাম নাদ এবং চিদংশের নাম বিন্দু।

—নাদলীলামৃত (পৃষ্ঠা—১৭) ধৃত ॥

(৪৫) ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে।—নাদলীলামৃত (পৃষ্ঠা—১৭) ধৃত মঞ্জুষা।

সর্ব্বদাই তাঁহাতে হইতেছে। ... ... ...। এই আমর্শনের মূল যাহা, তাহারই নাম পরনাদ। 'পরা বাক্' রূপে ইহার স্বরূপ আগমশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।"—নাদলীলামৃতের ভূমিকা; পৃষ্ঠা—১২।

উল্লিখিত 'পরা বাক্' যে জীবের মূলাধার চক্রে অবস্থান করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনাদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি। দ্বিতীয় স্তরে যে অনাহত নাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার স্থান জীবের হৃদয়ে। ব্রহ্ম-বিন্দু উপনিষৎ বলেন—যতক্ষণ শব্দ মায়াদ্বারা আবৃত থাকে, ততক্ষণ হৃদয়পদ্মে অবস্থান করে। অন্ধকার দূর হইলে অনাহত নাদের দ্বারা প্রণব ঊর্দ্ধমুখ হওয়ার পর জ্যোতির আবির্ভাব হইলে সে একত্ব ( জ্যোতির সহিত ) লাভ করিয়া এককেই দর্শন করিয়া থাকে (৪৬)।

মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁহার নাদলীলামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত ব্রহ্মবিন্দু শ্রুতির উল্লেখক্রমে তাহার তাৎপর্য্যার্থও প্রদর্শন করিয়াছেন (৪৭)।

এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে—সমাহিতাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে ( অনাহত ) নাদ উৎপন্ন হইয়াছিল ( অভূৎ ) (৪৮)। শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকে যদিও 'অনাহত' এই বিশেষণটি নাদের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় নাই; তথাপি অন্যান্য শাস্ত্রবচনের সঙ্গে মিলাইয়া অর্থ করিলেই আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে, ভাগবতের ঋষি অনাহত-নাদ অর্থেই উল্লিখিত শ্লোকে নাদ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই অনাহত-নাদের স্বরূপপ্রদর্শন প্রসঙ্গে আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজও বলিয়াছেন—

"প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই উচ্চার। ... ... ...। এই প্রাণাত্মক উচ্চারে একটি অব্যক্ত ধ্বনি নিরন্তর স্ফুরিত হইতেছে। ইহাকে অনাহত নাদ বলে। ইহা প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে সর্ব্বদাই চলিতেছে।"

—নাদলীলামৃতের ভূমিকা। পৃষ্ঠা—৪।

তৃতীয় স্তরে যে নাদের কথা বলা হইয়াছে, সিদ্ধাচার্য্যগণ ইহার মধ্যে আবার নয়টি বিভিন্ন স্তর কল্পনা করিয়াছেন। নাদের এই নয়টি বিভিন্ন অবস্থা

---

(৪৬) শব্দো মায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্করে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেকমেবানুপশ্যতি ॥—ব্রহ্মবিন্দুশ্রুতি ১৫।৭ ॥

(৪৭) নাদলীলামৃত ৭ পৃষ্ঠা।

(৪৮) সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্ বিভাব্যতে ॥
—ভাগবত; ১২ স্কন্ধ, ৬ অঃ, ৩৭ শ্লোক।

নব নাদ নামে বিখ্যাত। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পরে লিখিব।

ধাতুগত অর্থদ্বারা যদি আমরা নাদ বলিতে শব্দকে বুঝি, তাহা হইলে এই নাদকে চারিভাগেও বিভক্ত করা যায়। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী ভেদে শব্দের যে চারিটি অবস্থার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহারাই শব্দাত্মক নাদের অবস্থা-চতুষ্টয়। এই চারিটি অবস্থার কথা যে অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত নাদবিন্দু উপনিষদেও প্রণবের মধ্যে চারিটি মুখ্য বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে যে, অকার প্রণবরূপ হংসের দক্ষিণ পক্ষ; উকার উত্তর পক্ষ, মকার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা ইহার মস্তক (৪৯)। ওঙ্কাররূপ প্রণবই নাদ; সুতরাং প্রণবের এই অঙ্গ-চতুষ্টয়ের দ্বারা নাদেরও চারিটি অঙ্গ বা বিভাগ কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আবার মহারাজাধিরাজ ভোজদেব তাঁহার সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কার-শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্যভেদে বাঙ্ময়ের যে চারিটি অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারাও শব্দাত্মক নাদের প্রকার-চতুষ্টয় স্বীকার করা যাইতে পারে।

চারি প্রকার

শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মত স্বীকার করিয়া যদি নাদের অবান্তর-বিভাগ কল্পনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে এই নাদকে শূন্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, পুর্য্যষ্টকস্বরূপ এবং শরীরস্বরূপ ভেদে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্' নামক গ্রন্থের ৭ম সূত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপ বলা হইয়াছে (৫০)।

সঙ্গীত-দামোদর নামক গ্রন্থে আবার নাদের পাঁচটি বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা—(১) অতিসূক্ষ্ম (২) সূক্ষ্ম (৩) পুষ্ট (৪) অপুষ্ট এবং (৫) কৃত্রিম। এই মতে অতিসূক্ষ্ম নাদ নাভিতে, সূক্ষ্মনাদ হৃদয়ে, পুষ্টনাদ গলে, অপুষ্ট শীর্ষদেশে এবং কৃত্রিম নাদ বদনে উৎপন্ন হয় (৫১)। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণেও নাদের এই পাঁচটি অবস্থা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত পুরাণের মধ্যম খণ্ডে ১৪ শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নারদকে

পাঁচ প্রকার

(৪৯) অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিবস্তথা॥—নাদবিন্দূপনিষৎ; ১ম শ্লোক।

(৫০) শূন্য-প্রাণ-পুর্য্যষ্টক শরীরস্বভাবত্বাৎ চতুরাত্মা।

(৫১) আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থি-স্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবক-প্রেরিতং সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।

বলিয়াছেন—মূলাধারে যে অগ্নি আছে, তাহা হইতে নাদ উৎপন্ন হয়। এই নাদ ক্রমে নাভিদেশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থান অতিক্রম করিয়া মস্তকে প্রস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা প্রথমে মূলাধারে উৎপন্ন হইয়া নাভিদেশে অতিসূক্ষ্ম, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, কণ্ঠে অব্যক্ত, মুখে কৃত্রিম এবং মস্তকে অব্যক্ত বা অজ্ঞান নাদ নামে কথিত হয় (৫২)।

নাদবিন্দূপনিষদের দীপিকা নাম্নী টীকায় আচার্য্য নারায়ণ প্রণবের পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—অ, উ, ম্, নাদ এবং বিন্দু (৫৩)। ইহাদ্বারাও প্রণবরূপ নাদের পাঁচটি বিভাগ অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

মহার্থমঞ্জরী নামক আগমশাস্ত্রীয় গ্রন্থে অন্যভাবে নাদের পঞ্চপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত পঞ্চপ্রকার নাদাত্মক বাকের নাম যথা—(১) ব্যোমবামেশ্বরী (২) খেচরী, (৩) দিক্‌চরী (৪) গোচরী এবং (৫) ভূচরী (৫৪)। ব্যোমবামেশ্বরী নামের কারণ সম্বন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ব্যোম-নামক ওঙ্কারাত্মক প্রণবের বিমর্শনে যে সকল বাম বা সুন্দর ভাবসমূহের উদয় হয়, তাহাদের সাধনে নাদাত্মক বাকের যে অবস্থাটি সর্ব্বাধিক সমর্থ তাহাকেই এই বিশেষগুণের জন্য ব্যোমবামেশ্বরী নামে অভিহিত করা হয় (৫৫)।

---

অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ ॥
পুষ্টং শীর্ষেঽপ্যপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ ॥

—সঙ্গীতদামোদর ( নাদলীলামৃত ৫৪ পৃষ্ঠায় ধৃত )।

(৫২) মূলাধারে বসেদগ্নিস্তস্মান্নাদোঽভিপদ্যতে।
পঞ্চ স্থানানি ভিত্ত্বাসৌ ব্যক্তো ভবতি মূর্দ্ধনি ॥
নাভৌ সূক্ষ্মোঽতি পূর্ব্বঃ স্যাৎ সূক্ষ্মো হৃদি বিশিষ্যতে।
কণ্ঠে ভবতি চাব্যক্তো মুখে কৃত্রিমতাং ব্রজেৎ ॥
মূর্দ্ধনি চ তথাব্যক্তো নাদ এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ; মধ্যমখণ্ড ; ১৪শ অধ্যায়।

(৫৩) প্রণবঃ পঞ্চধাকারোকারমৈর্ব্বিন্দুনাদযুক্ ।—দীপিকা।

(৫৪) পঞ্চৈব পঞ্চবাহপদব্যাং বাহাঃ পরমেশ্বরস্য স্ফুরণধারাঃ ; তাশ্চ পঞ্চ, ব্যোমবামেশ্বরী খেচরী দিক্‌চরী, গোচরী ভূচরীতি ভবন্তি।—৪২শ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(৫৫) তত্র ব্যোমাম্ ওমাত্মক-প্রণবরূপতাবিমর্শবৈশিষ্ট্যানুপ্রাণনার্থং বক্ষ্যমাণ-পঞ্চ-পর্বকাণাং বামধামানং প্রতি ঈশ্বরী সামর্থ্যশালিনীতি ব্যোমবামেশ্বরী।

—মহার্থমঞ্জরী, ৪২শ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্' নামক গ্রন্থে ব্যোমবামেশ্বরী না বলিয়া ইহাকে বামেশ্বরী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বামেশ্বরী নামের কারণ-সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই নাদরূপিণী ভগবতী চিতিশক্তি বিশ্ব বমন (সৃষ্টি) করেন এবং সংসারের প্রতি বামাচার (বৈরাগ্য) সৃষ্টি করিয়া থাকেন—এই দ্বিবিধ কারণে ইহাকে বামেশ্বরী নামে অভিহিত করা হয় (১২শ সূত্রের ব্যাখ্যা)।

খেচরী নামের কারণ সম্বন্ধে মহাত্মা অভিনব গুপ্ত পরাত্রিংশিকার বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—খ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম; ব্রহ্মে অভিন্নরূপে থাকিয়া বিচরণ করেন বলিয়া নাদাত্মক বাকের এই অবস্থাকে খেচরী নাম দেওয়া হইয়াছে (১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা)।

অপর তিনটি নামের কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ মহার্থমঞ্জরী গ্রন্থে ৪২ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। তথায় বলা হইয়াছে—দিক্ শব্দের অর্থ 'অন্তঃকরণ'। উহাতে বিচরণ করেন বলিয়া এই বাকের নাম দিক্‌চরী। গো শব্দের অর্থ বহিরিন্দ্রিয়; তাহাতে বিচরণ করার ফলে ইহার নাম হইয়াছে গোচরী। ভূমি শব্দের অর্থ—বিষয় সমূহ; তাহাতে বিচরণ করেন বলিয়া এই বাক্ ভূচরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ছয় প্রকার

সারদাতিলক প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে অ, উ, ম্, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ ও বিন্দুভেদে ওঙ্কাররূপ প্রণবের ৬টি অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রণবই যে নাদ, ইহা সিদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং প্রণবরূপ নাদের এই ৬টি অংশদ্বারাও তাহার ৬টি বিভাগ কল্পনা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন তন্ত্রে প্রণব বা অপর প্রণবের মধ্যে ৭টী অঙ্গেরও উল্লেখ দেখা যায়। তন্ত্রাচার্য্য ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার তাঁহার সম্পাদিত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের পাদটীকায় (৫৬) উক্ত সাতটি অঙ্গ প্রদর্শন

সাত প্রকার

করিয়াছেন। উপরে যে পাঁচটি অঙ্গের কথা বলিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে কলা ও কলাতীত নামক অঙ্গদ্বয় যোগ করিয়াই উল্লিখিত সপ্তাঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রণবের মধ্যে এইরূপ সপ্তাঙ্গ কল্পনা কি অভিপ্রায়ে করা হইয়াছে, তাহাও

---

(৫৬) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; পৃষ্ঠা—৬৮॥

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। অ, উ, ম্ বর্ণত্রয় যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক। ৺(নাদ) অহঙ্কার তত্ত্ব-রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। •( বিন্দু ) অবিকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার,—( কলা ) বুদ্ধিতত্ত্ব, এবং—( কলাতীত ) গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। অতএব, উল্লিখিত ৭টী অবস্থাদ্বারা যিনি বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মই প্রণবপদের বাচ্য। পাতঞ্জল যোগসূত্রে এবং লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে প্রণবের বাচকতাই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

'পাণিনীয়-শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণসমূহের ৮টী পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণস্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু এই আটটী স্থানের প্রত্যেকটী হইতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ উচ্চারিত হয়। বর্ণগুলি শব্দাত্মক; সুতরাং তাঁহাদিগকে নাদও বলা যাইতে পারে। অতএব, এই উচ্চারণ-স্থানের বিভিন্নতা-অনুসারে বর্ণাত্মক নাদগুলিকে ৮ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

আট প্রকার

সিদ্ধাচার্য্যগণ নয়টী যোগভূমির উল্লেখ করিয়াছেন। এই নয়টী যোগভূমি নাদের নয়টী-ভিন্ন ভিন্ন অবস্থারূপে বিবেচিত হইয়া থাকে; এই কারণে ইহারা নব নাদ নামে বিখ্যাত। মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 'নাদলীলামৃত' গ্রন্থের ভূমিকায় এই নব নাদ বা নয়টী যোগভূমির পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত নয়টী যোগভূমি যে কেবল স্থূলনাদের মধ্যেই আছে, এমন নহে; সূক্ষ্মনাদের মধ্যেও এই নয়টী বিভাগ বর্ত্তমান (৫৭)।

নয় প্রকার

আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ এই নয়টি যোগভূমির যে বর্ণনা নাদলীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাণীর মূলাধার চক্রে কুল-কুণ্ডলিনীরূপে নাদ যখন অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, তখন তাহাকে বিন্দু বলা হয়; এই বিন্দুই নাদের প্রথম অবস্থা বা প্রথম যোগভূমি। দ্বিতীয় যোগভূমি অর্দ্ধচন্দ্র নামে বিখ্যাত।

নাদের তৃতীয় অবস্থা বা তৃতীয় যোগভূমির নাম নিরোধিকা বা রোধিনী। চতুর্থ যোগভূমিটী নাদ নামে অভিহিত হয়। পঞ্চম যোগভূমির নাম নাদান্ত এবং ষষ্ঠটীর নাম শক্তিস্থান। এই শক্তিস্থান ঊর্দ্ধকুণ্ডলী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। সপ্তম যোগভূমিকে ব্যাপিনী এবং অষ্টম যোগভূমিকে সমনা

[৫৭] নাদলীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকা; পৃষ্ঠা ১৸/০ দ্রষ্টব্য।

বলা হয়। এই সমনাকেই পরা শক্তি বলা হইয়া থাকে। নবম যোগভূমিটী উন্মনা নামে বিখ্যাত।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ স্পষ্ট ভাষায়ই লিখিয়াছেন—এই উন্মনাতেই নাদরূপী শব্দব্রহ্মের শেষ; ইহাই পরম শূন্য এবং নব নাদের মধ্যে এইটী নবম ভূমি (৫৮)।

এই নয়টি যোগভূমিতে নাদের যে নয়টি অবস্থা সাধকগণ কর্ত্তৃক উপলব্ধ হয়, তাহাদের সমষ্টিকেই সাধারণতঃ নাদ বলা হইয়া থাকে। বরিবস্যা-রহস্যম্ নামক গ্রন্থে আচার্য্য ভাস্কর রায় স্পষ্টভাষায়ই এই কথা বলিয়াছেন (৫৯)।

উল্লিখিত বিন্দু প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টি কত মাত্রা পরিমিত তাহাও 'বরিবস্যারহস্যম্' প্রভৃতি গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে (৬০)। আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও নাদলীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় নব নাদের প্রত্যেকটির মাত্রা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিন্দুর মাত্রা ১/২। অর্দ্ধচন্দ্রের মাত্রা ১/৪। নিরোধিকা ১/৮। নাদ ১/১৬। নাদান্ত ১/৩২। শক্তিস্থান ১/৬৪। ব্যাপিনী ১/১২৮। সমনা ১/২৫৬ এবং উন্মনা ১/৫১২। সমুদয় মাত্রা যোগ করিলে ৫১১/৫১২ হয়; অর্থাৎ একটি পূর্ণমাত্রা হইতে ১/৫১২ বাকী থাকে। ভারতীয় সিদ্ধাচার্য্যগণের এই অতিসূক্ষ্ম অনুভূতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি।

দশ প্রকার

নাদলীলামৃত গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় ১০ প্রকার নাদ প্রদর্শন করা হইয়াছে; যথা—(১) চিণি (২) চিঞ্চিণী (৩) ঘণ্টা (৪) শঙ্খ (৫) তন্ত্রী (৬) তাল (৭) বেণু (৮) মৃদঙ্গ (৯) ভেরী, এবং (১০) মেঘ। উল্লিখিত ১০টি নাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্য্য সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ লিখিয়াছেন—

"প্রথমে চিণি শব্দে গাত্র চিন্ চিন্ করে, দ্বিতীয় চিঞ্চিণী নাদে গা ভাঙ্গা হয় (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), তৃতীয় ঘণ্টানাদে তাপযুক্ত হয় (ঘাম হয়), চতুর্থ শঙ্খনাদে মস্তক কম্পিত হয়, পঞ্চম তন্ত্রীনাদে তালু হইতে জলক্ষরণ হয়, ষষ্ঠ করতালের নাদে তালুক্ষরিত অমৃত পান হয়, সপ্তম বেণুনাদে গোপনীয় বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, অষ্টম মৃদঙ্গনাদে পরাবাক্ শ্রুতিগোচর হয়, নবম

---

(৫৮) নাদ লীলামৃতের ভূমিকা; পৃষ্ঠা ২৶০ ॥

(৫৯) বিন্দ্বাদীনাং নবানাং তু সমষ্টির্নাদ উচ্যতে।—বরিবস্যারহস্যম্ ১।১৩ ॥

(৬০) সংহত্যৈকলবোনো মাত্রাকালোঽস্য নাদস্য।—বরিবস্যারহস্যম্ ১।১৭ ॥

ভেরীনাদে অগোচর দেহ জ্যোতির্ম্ময় এবং চক্ষু অমল হয়। দশম মেঘনাদে পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে (৬১)।”

নাদবিন্দূপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে আবার প্রণবের মধ্যে দ্বাদশটি মাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত উপনিষদে প্রথমতঃ প্রণবের মধ্যে তিনটি পূর্ণ এবং একটি অর্দ্ধমাত্রারূপে চারিটী মুখ্য বিভাগ প্রদর্শন করার পর বলা হইয়াছে যে, উল্লিখিত চারিটি মাত্রার প্রত্যেকটি আবার তিনভাগে বিভক্ত। ফলে প্রণবের মধ্যে মোট ১২টি মাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে (৬২)। উল্লিখিত ১২টি মাত্রার প্রত্যেকটির এক একটি নাম এবং ইহাদের বিশেষ প্রভাবের কথাও উক্ত উপনিষদে বর্ণিত আছে।

বারো প্রকার

নাদলীলামৃত নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত দ্বাদশটি মাত্রা স্বীকার করিয়া ইহাদের প্রত্যেকের নাম এবং [illegible]হাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নাদলীলামৃত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

“ইহার ঘোষিণী, বিদ্যা, পতঙ্গিনী, বায়ুবেগিণী, নামধেয়া, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, শাঙ্করী, মহতী, ধৃতি, নারী, পরা এবং ব্রাহ্মী—এই দ্বাদশটি মাত্রা।

সাধকের প্রাণ প্রথম মাত্রার সহিত বিনির্গত হইলে তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম রাজা হন। এইরূপ দ্বিতীয়ে মাহাত্ম্যবান্ যক্ষ, তৃতীয়ে বিদ্যাধর, চতুর্থীতে গন্ধর্ব্ব, পঞ্চমী মাত্রায় সোমলোকে দেবগণের সাহায্যে পূজালাভ, ষষ্ঠীতে ইন্দ্রসাযুজ্য, সপ্তমীতে বৈষ্ণবপদ, অষ্টমীতে রুদ্রসামীপ্যলাভ, নবমীতে মহর্লোক, দশমীতে জনলোক, একাদশীতে তপোলোক এবং দ্বাদশী মাত্রায় দেহত্যাগ হইলে শাশ্বত ব্রহ্মলাভ হয়।”—নাদলীলামৃত, পৃষ্ঠা—৮৫—৮৬॥

মহাত্মা ভাস্কর রায় বরিবস্যা-রহস্য নামক গ্রন্থে অন্যভাবে নাদের ১২টি অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই মতে পূর্ব্বোক্ত বিন্দু প্রভৃতি ৯টি যোগ-ভূমির সহিত ব্যোম, অগ্নি এবং বামলোচনা নামক শক্তিত্রয়ের মিলনে এই

(৬১) নাদলীলামৃত; পৃষ্ঠা—৭৭॥

(৬২) আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা।
ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা॥
পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্ব্বুধাঃ।
কলাত্রয়ানন্দা বাপি তাসাং মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা॥—নাদবিন্দূপনিষৎ; শ্লোক—৬—৮॥

দ্বাদশ অংশ গঠিত হয় (৬৩)। ভাস্কর রায়ের মতে ব্যোম শব্দে হকার, অগ্নিশব্দে রকার এবং বামলোচনা শব্দে ঈকারকে বুঝা যায় (৬৪)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উল্লিখিত দ্বাদশ মাত্রাবিশিষ্ট নাদটি ওঙ্কারাত্মক না হইয়া হ্রীঙ্কারাত্মক হইয়া যাইতেছে। নাদবিন্দু উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে কিন্তু ওঙ্কারাত্মক নাদের মধ্যেই দ্বাদশ অংশ বা মাত্রা স্বীকৃত হইয়াছে।

## নাদ নিত্য না অনিত্য

নাদ নিত্য কি না, এই সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার উক্তি দেখা যায়। বিভিন্ন বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম কোন শব্দেরই বাস্তব নিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই, বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। শব্দকে যে সকল স্থলে শব্দ বা প্রণবরূপে উল্লেখ করিয়া তাহার বাস্তব অনিত্যতা অথবা ব্যাবহারিক নিত্যতা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কেবলমাত্র সেই সকল উক্তিরই আলোচনা করিয়াছি। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নাদ শব্দদ্বারা সূক্ষ্ম শব্দের উল্লেখ করিয়া তাহারও নিত্যতা বা অনিত্যতা সম্বন্ধে বিবিধ উক্তি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা ঐ সকল উক্তির দিঙ্মাত্র আলোচনা করিব। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নাদকে শব্দব্রহ্ম নামেও অভিহিত করা হইয়াছে; সুতরাং 'শব্দব্রহ্ম' শব্দদ্বারা যে সকল স্থলে নাদের উল্লেখ আছে, তাহারও দিঙ্মাত্র আমরা প্রদর্শন করিব।

যোগশিখোপনিষৎ (৬৫) লয়যোগ সংহিতা (৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থে নাদকে অব্যয় ব্রহ্ম রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদেও

---

(৬৩) হৃল্লেখায়াঃ স্বরূপস্তু ব্যোমাগ্নির্বামলোচনা।
বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্ররোধিন্যো নাদ-নাদান্ত-শক্তয়ঃ ।।
ব্যাপিকা সমনোন্মন্য ইতি দ্বাদশ-সংহতিঃ ।।—বরিবস্যারহস্যম্ ১।১২—১৩ ।।

(৬৪) ব্যোম হকারঃ কেবলো ন তকারবিশিষ্টঃ। অগ্নী রেফস্তাদৃশঃ। বামলোচনেকারঃ।
—বরিবস্যারহস্য ১।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(৬৫) অক্ষরং পরমো নাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।
—যোগশিখোপনিষৎ (নাদলীলামৃত ১৫৪ পৃষ্ঠায় ধৃত)।

(৬৬) নাদ এব মহদ্‌ব্রহ্ম পরমাত্মা পরঃ পুমান্।
—লয়যোগসংহিতা (নাদলীলামৃত ১৯৭ পৃষ্ঠায় ধৃত)।

প্রণব, নাদ বা সূক্ষ্মশব্দ অক্ষর ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছেন। কোন কোন পুরাণেও (৬৭) অব্যয় ব্রহ্মরূপে নাদ বা সূক্ষ্মশব্দের বর্ণনা দেখা যায়।

লিঙ্গপুরাণে তো পরিষ্কার ভাষায়ই বলা হইয়াছে—নাদরূপ ব্রহ্ম আদি-মধ্যান্ত-রহিত এবং আনন্দেরও কারণ (৬৮)। সিদ্ধযোগ প্রভৃতি কোন কোন সাধন-বিষয়ক গ্রন্থে সূক্ষ্ম-শব্দাত্মক পরব্রহ্ম-বাচক ওঙ্কারকেই নাদ নামে অভিহিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম বলিতে অর্থ-প্রতিপাদন-সমর্থ শব্দ বা স্ফোটাত্মক শব্দকে বুঝায়, আর নাদ বলিতে বুঝায় পরব্রহ্মের বাচক ওঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শব্দকে (৬৯)।

আগমশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে আবার হ্রীং ( বা হ্রীঁ ) রূপ বীজমন্ত্রকেও নাদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বরিবস্যা-রহস্য (প্রথম অংশ, ১২শ এবং ৩৬ তম শ্লোক) প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সকল গ্রন্থে হ্রীঙ্কারকে নাদ বলা হইয়াছে, তাহাতে নাদকে ব্রহ্মস্বরূপ না বলিয়া শিবস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ বা ভৈরবস্বরূপ বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ওঁ বা হ্রীং (বা হ্রীঁ) যে মন্ত্রের সাহায্যেই সাধনা করা হউক না কেন, সাধকের প্রবল নিষ্ঠা ও মুমুক্ষা থাকিলে তিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন—ইহাই আমরা বুঝিতেছি। সাধক ওঁ বা হ্রীং (বা হ্রীঁ) যে মন্ত্রেই সাধন করুন না কেন, উহার সূক্ষ্মতম নাদাত্মক-অবস্থা হইতেই তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে সাধন-সংক্রান্ত অন্যান্য উপদেশ সদ্‌গুরুর মুখ হইতে শ্রোতব্য; কারণ, তাহা অধিকারীভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

বিভিন্ন শাস্ত্রে যে শব্দের কেবলমাত্র ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। নাদ সূক্ষ্মশব্দ হইতে অভিন্ন বলিয়া

---

(৬৭) কর্ণং পিধায় মর্ত্ত্যস্য নাদরূপং বিচিন্ততঃ।
তদেব প্রণবস্যাগ্রং তদেব ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥
—স্কন্দপুরাণ; নাগরখণ্ড; ২৬২ অঃ, ১৭ শ্লোক।

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২১॥

(৬৮) পাদটীকা—৩।

(৬৯) চতুর্থ অধ্যায়; পাদটীকা—১২।

নাদের নিত্যতা-সম্বন্ধীয় উল্লিখিত শাস্ত্রবচনগুলিকেও আমরা ব্যাবহারিক-নিত্যতা-বিষয়ক বলিয়াই মনে করি।

লিঙ্গপুরাণে যে নাদকে আদিমধ্যান্তরহিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, নাদের সূক্ষ্মতমত্বহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার আদি, মধ্য এবং অন্ত নির্ণয় সম্ভব নহে। নাদকে আনন্দেরও কারণ বলার অভিপ্রায় এই যে, কোন ব্যক্তির উচ্চারিত একটী মধুর শব্দ বা গান ইত্যাদি শুনিয়া যখন আমরা আনন্দ অনুভব করি, তখন ঐ নাদাত্মক শব্দ বা শব্দসমষ্টিই আমাদের তাদৃশ আনন্দের উৎপাদক হইয়া থাকে।

প্রণব, ওঙ্কার বা নাদের যিনি মূল প্রতিপাদ্য, সেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরব্রহ্মই কেবল নিত্য; অবশিষ্ট সব কিছুই অনিত্য। এই কারণেই অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে নাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধেও বিবিধ বর্ণনা দেখা যায়। সারদাতিলক নামক তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রথম পটলে বলা হইয়াছে—স্বষ্টির আদিতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে শক্তির উদ্ভব হইয়া অতঃপর এই শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হইয়াছিল;(৭০) আবার কুব্জিকা তন্ত্রের প্রথম পটলে উক্ত হইয়াছে—প্রথমে বিন্দু ছিল; তাহা হইতে নাদ এবং নাদ হইতে শক্তির উৎপত্তি হয় (৭১)। যোগশিখোপনিষদে একটি উপমাদ্বারা নাদের উৎপত্তি-ধর্ম্মকতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে—"প্রাণীর মূলাধার-চক্রে বিন্দুরূপিণী শক্তি বিরাজ করেন। সূক্ষ্মবীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উদ্গম হয়, উল্লিখিত সূক্ষ্ম বিন্দুরূপিণী শক্তি হইতেও তেমনি নাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে (৭২)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু গ্রন্থেও শব্দের উৎপত্তি-ধর্ম্মকতার স্বীকৃতি দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জাবালদর্শনোপনিষৎ (৭৩) কাশীখণ্ড (৭৪) গোরক্ষসংহিতা

---

(৭০) পাদটীকা—২০।

(৭১) আসীদ্ বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিসমুদ্ভবঃ। —কুব্জিকাতন্ত্র; প্রথম পটল।

(৭২) মূলাধারগতা শক্তিঃ স্বাধারা বিন্দুরূপিণী।
তস্যামুৎপদ্যতে নাদঃ সূক্ষ্মবীজাদিবাঙ্কুরঃ॥ —যোগশিখোপনিষৎ।

(৭৩) ব্রহ্মরন্ধ্রং গতে বায়ৌ নাদশ্চোৎপদ্যতেঽনঘ।
—জাবালদর্শনোপনিষৎ। ৬ষ্ঠ খণ্ড; ৩৬ শ্লোক।

(৭৪) নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়ীশোধনাৎ।
—কাশীখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ ৪১ অঃ, ৮৯ শ্লোক।

(৭৫) যোগবিদ্যা-শ্রুতি (৭৬), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (৭৭), শ্রীমদ্ভাগবত (৭৮) প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহর্ষি জৈমিনিও মীমাংসা-দর্শনের ১।১।৭ সূত্রে নাদের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিয়াছেন। যাহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে, তাহার আদি অন্তও অবশ্যই স্বীকার্য্য। জ্ঞানপ্রদীপ নামক গ্রন্থেও নাদের নিবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে (৭৯)। যাহার নিবৃত্তি আছে, তাহার প্রবৃত্তিও অবশ্যই থাকিবে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দ দুইটি যথাক্রমে উৎপত্তি এবং বিনাশেরই বাচক। সুতরাং জ্ঞানপ্রদীপকারও বস্তুতঃ শব্দের অনিত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পাদটীকায় মহাত্মা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নাদের উৎপত্তির যে শাস্ত্রসম্মত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমান অধ্যায়ের ২৯ সংখ্যক পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি।

সঙ্গীত-দামোদর নামক গ্রন্থেও যে প্রাণবায়ুর ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছার ফলে নাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত গ্রন্থে অন্য এক স্থানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, প্রাণ এবং অগ্নিসংযোগে নাদের উৎপত্তি হয় (৮০)। শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধানেও নাদের উৎপত্তিসূচক শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত দেখা যায় (৮১)।

---

(৭৫) গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নাদঃ সঞ্জায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ॥

—গোরক্ষ-সংহিতা ( নাদলীলামৃত ১৮২ পৃষ্ঠায় ধৃত )।

(৭৬) ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্নায়াং মৃণালান্তরসূত্রবৎ।
নাদোৎপত্তিস্তনেনৈব শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা॥

—যোগবিদ্যাশ্রুতি ( নাদলীলামৃত ১৮২ পৃষ্ঠায় ধৃত )।

(৭৭) মূলাধারে বসেদগ্নিস্তস্মান্নাদোঽভিপদ্যতে। —বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ; মধ্যমখণ্ড ১৪।২০॥

(৭৮) সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্ বিভাব্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ; স্কঃ ১২, অঃ ৬, শ্লোক—৩৭॥

(৭৯ যতক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী মহামায়া সহস্রারস্থিত পরমশিবে বা পরমাত্মায় লয়প্রাপ্তা অর্থাৎ একীভূতা না হইয়া যান, ততক্ষণ সাধকের সেই নাদ বা অনাহত ধ্বনির নিবৃত্তি হইবে না।

—জ্ঞানপ্রদীপ ১ম ভাগ, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

(৮০) নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥

—জীবতত্ত্ববিবেক ( নাদলীলামৃত ৫৪ পৃষ্ঠায় ধৃত )।

(৮১) বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে।—শব্দকল্পদ্রুম।

নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যেরা যে নাদকে বিন্দুর একটি অংশরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিত্যবস্তু অন্য কাহারও অংশ হইতে পারে না; সুতরাং ইহাদ্বারাও নাদের অনিত্যতাই সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত নাদের মধ্যে যে বিভিন্ন বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কথাও উপরে বলিয়াছি। নিত্য বস্তুর মধ্যে এইরূপ কোন বিভাগ থাকা সম্ভব নহে। মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ যে নাদলীলামৃত গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় শব্দের নিত্যত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাই উল্লিখিত আচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া আমরা মনে করি। অন্যথা অসংখ্য শাস্ত্রবচনের সঙ্গে তাঁহার বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

উক্ত মহাত্মা উল্লিখিত গ্রন্থেরই অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন—"শব্দব্রহ্ম হইতেই সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ইহাদের সকলেরই কারণ সূক্ষ্ম নাদব্রহ্ম" (৮২)। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি-বাক্যের আলোচনা কালে শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-সূচক শ্রুতিটিকে আমরা যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এখানেও সেইভাবে ব্যাখ্যা করিলেই আর শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে কোন বিরোধ থাকিবে না। যতদিন মানুষ চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিকে ঐ সকল নামে অভিহিত করে নাই, ততদিন চন্দ্র-সূর্য্যাদি নামে তাহাদের উৎপত্তি হয় নাই—ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায় বলিয়া আমরা মনে করি। এইরূপ শব্দ চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্ঞানের উৎপাদকই বটে। মেঘান্ধকার রজনীতে রুদ্ধকক্ষে লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিয়াও যদি কেহ সূর্য্য বা চন্দ্র শব্দ শুনিতে পায়, তাহা হইলেও তখনই তাহার অন্তরে সূর্য্য বা চন্দ্রের একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠে। দেহমধ্যে জাত সূক্ষ্ম নাদই যে শব্দরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাও আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই যুক্তিতে নাদকে শব্দ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সব কিছুর কারণ বলিলে বিশেষ অন্যায় হয় না।

মহামতি কৃষ্ণমাচার্য্য 'স্ফোটবাদ' গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে যে তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও নাদের উৎপত্তি-ধর্ম্মকতাই স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—ঈশ্বর বা নির্গুণ-ব্রহ্মরূপ নিত্যপদার্থ হইতে প্রথমে মায়াশক্তি বা সগুণ ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। অতঃপর এই মায়াশক্তি হইতে বিন্দুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বিন্দু হইতেই পরনাদ বা শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি

(৮২) নাদলীলামৃত; পৃষ্ঠা—৭০॥

হয়। অতঃপর এই পরনাদ হইতে যথাক্রমে পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মহাত্মা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথও যে বস্তুতঃ নাদ ও ব্রহ্মের পার্থক্য স্বীকার করেন, নাদলীলামৃত গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত তাঁহার একটি উক্তি হইতে আমরা ইহা স্পষ্টই জানিতে পারি। উল্লিখিত স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"কর্ণদ্বয় অঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলে যে রথনির্ঘোষ, বৃষভ-নিনাদ সদৃশ বা প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের স্থায় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহাই ঐ জ্যোতির সাক্ষাৎ শ্রবণের উপায় (৮৩)।

এক্ষেত্রে জ্যোতিঃ শব্দটী ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, নাদ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়। ব্রহ্ম এবং তাঁহার সাক্ষাৎকারের উপায় নিশ্চয়ই এক বস্তু নহে। সুতরাং যে সকল স্থলে নাদকে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে "কার্য্য-কারণয়োরভেদঃ" স্থায় অনুসারেই কার্য্য নাদকে কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ নাদ ও ব্রহ্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ব্রহ্ম যেমন বাক্য ও মনের অগোচর ( অবাঙ্মনসগোচর ), নাদ সেইরূপ নহে। কর্ণদ্বয় বন্ধ করিলে আমরা দেহমধ্যস্থিত নাদ শুনিতে পাই; সুতরাং ইহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া জীবদেহের উৎপত্তি-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহমধ্যস্থিত নাদেরও উৎপত্তি-বিনাশ ঘটে বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। নাদের অল্পাধিক্য হয় বলিয়া মহর্ষি জৈমিনিও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মের এইরূপ অল্পাধিক্য হওয়া মোটেই সম্ভব নহে। অন্যান্য যুক্তির সাহায্যে বিচার করিলেও আমরা নাদ এবং ব্রহ্মের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখিতে পাই।

## নাদের অবস্থিতি স্থল

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যেমন নাদ অনবরত লীলা করিয়া বেড়াইতেছেন, তেমনি প্রাণীর দেহাভ্যন্তরেও তাঁহার বিচিত্র লীলা নিয়ত বিদ্যমান। সিদ্ধ যোগিগণ সাধনাবলে প্রাণিদেহে নাদের এইরূপ বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ

(৮৩) নাদলীলামৃত; পৃষ্ঠা—৬৯।

করতঃ বিভিন্ন গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। জীবদেহের বহিঃস্থিত নাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই বিরাজমান বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সর্ব্বদা উপলব্ধ হয় না। জীবদেহের অভ্যন্তরস্থিত নাদও তেমনি দেহের সর্ব্বাংশে অনুভূত হয় না। দেহাভ্যন্তরস্থ একটি বিশিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হইয়া এই নাদ দেহের উপরিভাগেই চলাচল করিয়া থাকেন। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামে শব্দের চারিটি অবস্থার কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। ঐ চারিটি অবস্থার বর্ণনাকালে শব্দের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—জীবদেহস্থিত মূলাধার চক্রে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করেন। ইহারই আর এক নাম বিন্দু। এই বিন্দু বা কুল-কুণ্ডলিনী-শক্তিতেই নাদের উদ্ভব হয়। যোগশিখোপনিষৎ নামক গ্রন্থে বীজ ও অঙ্কুরের দৃষ্টান্তদ্বারা এইসকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বটবৃক্ষ প্রভৃতির বীজ অতি সূক্ষ্ম। তাহা হইতেই প্রথমে সূক্ষ্ম অঙ্কুরের উদ্‌গম হয়, এবং ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া থাকে। নাদের বেলাও তেমনি। অতিসূক্ষ্ম কুণ্ডলিনী-শক্তিতে অতিসূক্ষ্ম নাদের উদ্ভব হয় এবং এই নাদ ক্রমশঃ স্থূল ও স্থূলতর হইয়া ক্রমশঃ মহানাদে বা ভীষণ গর্জ্জনে পরিণত হইয়া থাকে। এক্ষণে কুণ্ডলিনী-শক্তির অবস্থিতি-স্থল নির্ণয় করিতে পারিলেই আমরা নাদের উৎপত্তিস্থল জানিতে পারিব। প্রায় সমুদয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থেই জীবদেহস্থিত মূলাধার চক্রকে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির অবস্থিতি-স্থলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত 'মূলাধার' শব্দটি এখানে মুখ্যার্থে অথবা গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক।

কুলকুণ্ডলিনী

সঙ্গীত-রত্নাকর নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—গুহ্যদেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী চারিটি দল-বিশিষ্ট মূলাধার নামক চক্রে কুল-কুণ্ডলিনী নাম্নী ব্রহ্মশক্তি বিরাজ করেন (৮৪)। সারদা-তিলক নামক তন্ত্রেও ( প্রথম পটল, ৫৩ শ্লোক ) বলা হইয়াছে যে, প্রাণিগণের আধারে ( মূলাধারে ) বিদ্যুদাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির স্ফুরণ (আবির্ভাব) হয়।

---

(৮৪) গুদলিঙ্গান্তরে চক্রমাধারাখ্যং চতুর্দ্দলম্।
অস্তি কুণ্ডলিনী ব্রহ্মশক্তিরাধারপঙ্কজে ॥
—সঙ্গীতরত্নাকর ( আনন্দাশ্রম ) ১।২।১১৯-১২০ ॥

উক্ত তন্ত্রের পদার্থাদর্শ নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থে মহাত্মা রাঘবভট্ট জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত আধার শব্দটি মূলাধার-চক্র অর্থেই ব্যবহৃত। লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দল চক্রটি অবস্থিত (৮৫)। মূলাধার পদ্মের মুখ নিম্নদিকে (৮৬), কিন্তু স্বাধিষ্ঠান পদ্মের মুখ ঊর্দ্ধদিকে। অতএব, মূলাধার পদ্মের মূল এবং স্বাধিষ্ঠান পদ্মের মূল পরস্পরের অতি নিকটে।

আলোচনা

লিঙ্গমূলে যদি স্বাধিষ্ঠান পদ্মের মুখ থাকে, তাহা হইলে এই পদ্মের নিম্নাংশ দুই অঙ্গুলি নিম্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। ঠিক এইভাবে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের নিম্নাংশ হইতে মূলাধার পদ্মের ঊর্দ্ধাংশেরও আরম্ভ ধরিলে এই উভয়ের সংযোগ-স্থলটিকে দেহমধ্য বলিয়া অভিহিত করা চলে। এই দেহমধ্যেই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির নিম্নাংশ অবস্থিত এবং সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা সর্পাকৃতি এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির মুখটি লিঙ্গমূল আচ্ছাদন করিয়া বিরাজিত—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা প্রসুপ্ত-ভুজগাকৃতি এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি যে স্বকীয় বদনদ্বারা লিঙ্গচ্ছিদ্র আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন, ইহা নির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থেও পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে (৮৭)।

এতদ্ব্যতীত 'কুল-কুণ্ডলিনী' নামটি দেখিয়াও মনে হয়, ইহার অবস্থিতি-স্থল লিঙ্গমূলে হওয়াই স্বাভাবিক! যিনি কুল অর্থাৎ বংশরক্ষার হেতুভূতা, তাঁহার অবস্থিতি-স্থল গুহ্যদেশ না হইয়া লিঙ্গমূল হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা মৎপ্রণীত "নিত্যপূজা-কল্পদ্রুম" গ্রন্থের পাদটীকায় ( ৮৮ ) করিয়াছি; সুতরাং এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, মূলাধার চক্রকে কুলকুণ্ডলিনীর অবস্থিতি-স্থল হিসাবে যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথায় মূলাধার শব্দটি গৌণার্থে প্রযুক্ত। মূলাধারের মূলদেশ (ঊর্দ্ধভাগ) এবং স্বাধিষ্ঠানেরও মূলদেশ হইতেই কুলকুণ্ডলিনীর অবস্থান আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার

---

(৮৫) স্বাধিষ্ঠানং লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলং চক্রমস্ত তু।—সঙ্গীতরত্নাকর ১।২।১২১॥

(৮৬) অধোবক্ত্রং হি তৎপদ্মং ধরামধ্যে চতুর্দ্দলম্।—নির্ব্বাণতন্ত্র।

(৮৭) লিঙ্গচ্ছিদ্রং স্ববক্ত্রেণ সমাচ্ছাদ্য সদা স্থিতা।—নির্ব্বাণতন্ত্র ( প্রাণতোষণী ধৃত )।

(৮৮) নিত্যপূজা-কল্পদ্রুম ; পৃষ্ঠা—১৯ ২৪॥

সমুদয় দেহটি স্বাধিষ্ঠান-চক্রেই অবস্থিত। সুতরাং উল্লিখিত উভয় পদ্মের সংযোগস্থলরূপ দেহমধ্যেই পরা-বাক্ বা পরা-নাদেরও আবির্ভাব হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যোগশিখোপনিষদে অন্যত্র বলা হইয়াছে—বিন্দু বা নাদ ভ্রূমধ্যে অবস্থান করেন (৮৯)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও নাদলীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ভ্রূমধ্যে কিঞ্চিৎ উপরদিকে ললাটে বিন্দুর স্থান (ভূমিকা; পৃষ্ঠা—১৮৵৹)।" উক্ত মহাত্মা অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন—"ভ্রূমধ্য-স্থানই চিত্তের কেন্দ্রবিন্দু (ভূমিকা; পৃষ্ঠা—১৷৴৹)।" নাদ এবং বিন্দু যে অভিন্ন তাহাও যোগশিখোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়, ৭২তম শ্লোকে স্বীকৃত হইয়াছে (৯০)।

মূলাধার চক্রস্থিত কুলকুণ্ডলিনীতে নাদাত্মক বিন্দুর আবির্ভাব হয় বলিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূলাধার চক্রের স্থান যে গুহ্যদেশের কিঞ্চিৎ উপরে, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম অবস্থিত। অতএব বিন্দুর স্থাননির্দ্দেশে আপাততঃ বিরোধ দেখা যাইতেছে। ইহার সমাধান সম্ভব কি না দেখা যাক্।

আগমবিদ্‌গণ যে বিন্দুর তিনটি স্তরে তিনভাগে তাহার সাধনা করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভ্রূমধ্যে কিঞ্চিৎ উপরদিকে ললাটে যে বিন্দুর সাধনা করা হয়, তান্ত্রিক সাধকগণ ইহাকে তৃতীয় বিন্দু নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন (৯১)। এই তৃতীয় বিন্দুতে যখন সূক্ষ্মতম নাদাত্মক বিন্দুর ধারণা করা সম্ভব হয়, তখনই সাধক প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হইতে পারেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিন্দুর সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্যই যোগশিখোপনিষৎ প্রভৃতি কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে বিশেষ ভাবে উক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিন্দুর উল্লেখ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত তিনটি স্তরের মধ্যে কোন্ স্তরের বিন্দুতে ধারণা করিলে সাধক কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন, বরিবস্যা-রহস্যম্ নামক

---

(৮৯) ভ্রূমধ্যনিলয়ো বিন্দুঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।—যোগশিখা উপ ৫।৩৪ ॥
নাদরূপা পরা শক্তির্ললাটস্থ তু মধ্যমে।—ঐ ৬।৪৮ ॥

(৯০) যো বৈ নাদঃ স বৈ বিন্দুস্তদ্বৈ চিত্তং প্রকীর্ত্তিতম্।—ঐ ৬।৭২ ॥

(৯১) তার্তীয়বিন্দো ললাটস্থানে।
—বরিবস্যারহস্যম্ প্রথম অংশ, ৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

গ্রন্থে সিদ্ধাচার্য্য ভাস্কররায় পরিষ্কার ভাষায়ই তাহা বলিয়াছেন। আচার্য্য ভাস্কর রায়ের লেখা দেখিয়া বুঝা যায়, তাঁহার মতে, প্রথম কূটে অর্থাৎ হৃদয়স্থ অনাহত-চক্রে ধারণা করিলে, তাহার ফলে সাধক উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম-পদার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব হইতেও শ্রেষ্ঠ (৯২)। দ্বিতীয় কূটে, অর্থাৎ ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞা চক্রে ধারণা করিলে সাধকের জ্ঞান ও ধারণাশক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়, এবং তখন তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম-পদার্থ চিদানন্দময় (৯৩)। অতঃপর তৃতীয় কূটে অর্থাৎ ললাটমধ্যে ধারণা করিলে পর তখনই সাধক পূর্ণ-ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন (৯৪)।

নাদসাধনার প্রথম স্তরে সাধক স্বীয় হৃদয়স্থ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে স্থির প্রদীপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠমাত্র-প্রমাণ ওঙ্কার-স্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান করিবেন (৯৫)। এইরূপ ধ্যানের ফলে যখন তিনি উন্নততর ধারণাশক্তিলাভে সমর্থ হইবেন, তখনই ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিন্দুতে জ্ঞানাত্মক দীপপ্রভাসদৃশ ব্রহ্মের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাই সিদ্ধাচার্য্যগণের সাধারণ অভিমত। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কোন কোন সাধক আবার কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার মনে করেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার মতে হৃদয়, ভ্রূমধ্য, ললাট ইহাদের যে কোন একটিস্থানে প্রণবরূপ নাদের ধ্যান করিলেই সাধক ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইতে পারেন। জ্ঞানাত্মক প্রদীপাকৃতি প্রভা কেবল ললাট-দেশেই উপলব্ধ হয় না; কোন কোন সাধক হৃদয়মধ্যেও তাঁহার দর্শন লাভ (জ্ঞাননেত্রের সাহায্যে) করিতে পারেন বলিয়া যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মনে করেন (৯৬)।

অন্যান্য গ্রন্থে আবার অন্যবিধ উক্তিও দৃষ্ট হয়। 'বরাহ শ্রুতি'তে নাভি-চক্রকে নাদের আধাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৯৭)। 'সঙ্গীত-দামোদর'

---

(৯২) বিধিবিষ্ণুগিরিশৈরীড্যং ব্রহ্মেতি প্রথমকূটার্থঃ।—বরিবস্যারহস্যম্ ২।১৩৬॥

(৯৩) তেনাত্যমিতানন্দং চিদ্ ব্রহ্মেতি দ্বিতীয়কূটার্থঃ।—ঐ ২।১৩৯॥

(৯৪) সকলকলাভিঃ সহিতং সকলং ব্রহ্ম তু তৃতীয়কূটার্থঃ।—ঐ ২।১৪০॥

(৯৫) হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে স্থিরদীপনিভাকৃতিম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্॥—ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।

(৯৬) ললাটমধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু।
শক্তিং সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেকদৃষ্ট্যা॥
—যোগি যাজ্ঞবল্ক্য (নাদলীলামৃত ১৪২ পৃষ্ঠায় ধৃত)

(৯৭) পটমধ্যং তু যৎ স্থানং নাভিচক্রং তদুচ্যতে।

নামক গ্রন্থেও বস্তুতঃ নাভিচক্র হইতেই নাদোৎপত্তির উল্লেখ দেখা যায় (৯৮)।

বিশ্বসার তন্ত্রে বলা হইয়াছে—শব্দব্রহ্ম অনাহত-চক্রে অবস্থান করেন; এবং এই অনাহত-চক্র সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত (৯৯)। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধেও (৬।৩৭) বলা হইয়াছে যে, হৃদয়স্থিত আকাশ হইতে নাদের উৎপত্তি হইয়াছিল (হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদঃ)।

জাবালদর্শনোপনিষদে বলা হইয়াছে—দেহস্থ বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিলে নাদ উৎপন্ন হয় (১০০)। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও নাদলীলামৃত গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কালাগ্নি মূলাধারে অবস্থিত। তাহা হইতে নাদ প্রবর্ত্তিত হয়।"

উপরে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রের এবং বিভিন্ন মহাত্মার যে সকল উক্তির কথা বলিলাম, তাহাতে আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, এবং প্রত্যেকটি উক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ঐ সকল উক্তির মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। বর্ত্তমানে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যে নাদের উৎপত্তিস্থল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এবং এই সম্বন্ধীয় শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির স্বাভাবিক অবস্থিতি-স্থল যে লিঙ্গমূলের কিঞ্চিৎ নীচে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিতে যখন নাদ অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, তখনই সে 'পরা-নাদ' বা সূক্ষ্মতম নাদরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নাভিস্থিত মণিপুর-চক্রে এই নাদের দ্বিতীয় অবস্থাটির উৎপত্তি হয়। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরাবাক্‌রূপে নাদের যে সূক্ষ্ম-

---

নাদাধারা সমাখ্যাতা জ্বলন্তী নাদরূপিণী।—বরাহশ্রুতি ৫।২৯।

(৯৮) পাদটীকা—৫১।

(৯৯) শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
অনাহতং মহাচক্রং হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুষু।
—বিশ্বসারতন্ত্র (নাদলীলামৃত ৪৪ পৃষ্ঠায় ধৃত)

(১০০) পাদটীকা—৭৩॥

তম অবস্থার এবং নাভিতে পশ্যন্তী নামে তাহার যে সূক্ষ্মতর অবস্থার উদ্ভব হয়, এই দুইটি অবস্থাই সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। কেবলমাত্র যোগিগণই ধ্যানবলে এই দুইটি অবস্থার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। শব্দব্রহ্মবাদের আলোচনাকালে আমরা এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি।

নাদের যে সূক্ষ্ম অবস্থাটি সাধারণ মানুষও চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন, তাহা নাদ বা শব্দের তৃতীয় অবস্থা। ইহার নাম মধ্যমা-বাক্। মধ্যমা বাক্‌টি জীবের হৃদয়ে অনাহত চক্রে-সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করেন।

নাভিস্থিত সূক্ষ্মতর পশ্যন্তী বাক্‌টিকে সাধারণ যোগীরাও ধ্যানবলে অবগত হইতে পারেন এবং নাভিচক্র অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইলে ইহা অপেক্ষাকৃত স্থূলত্ব লাভ করতঃ সাধারণ লোকের ও বোধগম্য অবস্থায় পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। এই কারণে, কোন কোন আচার্য্য নাভিচক্রকে বা নাভিচক্রের ঊর্দ্ধস্থিত স্থানটিকেই নাদের উৎপত্তি-স্থলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে অবস্থানকারী নাদটিকে সাধারণ লোকেরাও উপলব্ধি করিতে পারেন বলিয়া অনেকে আবার এই অনাহত চক্রকেই নাদের উৎপত্তিস্থলরূপে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচনসমূহে বা আচার্য্যগণের উক্তিগুলিতে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই; কেবলমাত্র বিভিন্ন উক্তিপ্রয়োগের উদ্দেশ্যগুলিই ভিন্ন।

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামক শব্দ বা নাদের অবস্থা-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই (১ম অধ্যায়ে) করা হইয়াছে।

## স্ফোট ও নাদের পার্থক্য

স্ফোট এবং নাদ উভয়েই যে শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ, উপরের আলোচনা হইতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। যদিও ইহারা উভয়েই শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ, তথাপি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান। বর্ত্তমানে আমরা স্ফোট এবং নাদের এই পার্থক্যটুকুই প্রদর্শন করিব। স্ফোটবাদের আলোচনাকালে আমরা জানিতে পারিয়াছি, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে মধ্যমা-বাক্ চালিত মধ্যমানাদই স্ফোটনামে অভিহিত হয় (মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে)। অর্থাৎ মধ্যমানাদরূপী স্ফোটাত্মক শব্দ স্ফোটাত্মক অর্থের প্রকাশক। সুতরাং মধ্যমানাদ নামক নাদের একটি

বিশেষ অবস্থাই স্ফোট নামে পরিচিত হইয়া থাকে। এই মধ্যমানাদকে কি কারণে স্ফোটাত্মক শব্দের কারণ বলা চলে না, স্ফোটবাদের আলোচনা-কালে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

কোন কোন আচার্য্য যদিও মধ্যমা এবং বৈখরী এতদুভয়ের সংযোগে স্ফোটাত্মক শব্দ প্রকাশিত হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করতঃ প্রথমোচ্চারিত শব্দটিকেই স্ফোটনামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি পরা বা পশ্যন্তী নাদকে কেহই স্ফোট বলেন নাই। বৈখরী বাক্‌দ্বারা ব্যক্ত পরশ্রবণ-গোচর শব্দের স্ফোটত্বও স্ফোটবাদিগণের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

অপরপক্ষে, নাদের স্বরূপ আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি সকলেই নাদপদবাচ্য। পরানাদ পরাবাকের সাহায্যে কেবলমাত্র যোগিগণের গোচরীভূত হয়। এইরূপে পশ্যন্তীনাদও পশ্যন্তী বাকের সাহায্যে কেবলমাত্র যেগিগণেরই গোচরীভূত হইতে পারে। পরা এবং পশ্যন্তী নাদের মধ্যে অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য না থাকায় তাহাদের স্ফোটসংজ্ঞা হয় না।

এতদ্ব্যতীত স্ফোটের স্বরূপ-নির্ণয়ে আচার্য্যগণ যেভাবে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, নাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে সেইরূপ মতভেদ দেখা যায় না। বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থ-প্রতিপাদন-সমর্থ শব্দের স্ফোটত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অন্যদের মতে আবার অর্থই স্ফোট। কেহ কেহ বলেন—স্ফোটাত্মক শব্দ কেবলমাত্র হৃদয়ে বিরাজ করে। অন্যেরা আবার তাহাকে বক্তার স্বকর্ণে উপলভ্য মনে করেন। কাহারও মতে প্রথমোচ্চারিত শব্দই স্ফোট। অন্যদের মতে আবার ইহা বক্তার বুদ্ধিস্থ। কেহ কেহ স্ফোটকে ধ্বনির কারণ মনে করেন; আবার অন্যদের মতে ধ্বনিই স্ফোটের কারণ। স্ফোটবাদের আলোচনাকালে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

যদিও মূলাধার চক্রে উৎপন্ন সূক্ষ্মতম (পরা) নাদই ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব লাভ করিয়া উর্দ্ধদিকে উঠিতে উঠিতে হৃদয়ে পৌছিলে, তাহাই স্ফোট সংজ্ঞা লাভ করে বলিয়া কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, তথাপি হৃদয়ে পৌছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে তাহার স্ফোটসংজ্ঞা হয় না, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে নাদের নাভি প্রভৃতি পাঁচটি স্থান অতিক্রমের কথা স্পষ্টভাষায় বলা হইয়াছে, স্ফোটের উৎপত্তি-ব্যাপারে কেহই এইরূপ নাভ্যাদি-স্থান-পঞ্চকের কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে যে কোন মতেই হউক, নাদ যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখনই অথবা তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই সে স্ফোটত্ব লাভ করিয়া থাকে, একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

নাদের স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য্যগণ নবনাদ প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, স্ফোটের বিভাগ সেইভাবে নির্ণীত হয় না। নাদের অবান্তর-বিভাগ হইতে স্ফোটের অবান্তর-বিভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে করা হইয়া থাকে। স্ফোটের বিভাগে যেমন বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট প্রভৃতি বিভাগ রহিয়াছে, নাদের বেলা এইরূপ বর্ণনাদ, পদনাদ, বাক্যনাদ প্রভৃতি বিভাগ-কল্পনা কেহই করেন নাই। সম্প্রতি যদি কেহ নাদের এই প্রকার বিভাগ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার এতাদৃশ উক্তি উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায়ই বিবেচিত হইবে। আবার নাদের মধ্যে যেমন শঙ্খনাদ প্রভৃতি বিভাগ রহিয়াছে, স্ফোটের এইরূপ বিভাগ করিতে গেলেও লোকে পাগলই বলিবে। এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, স্ফোট ও নাদ এক বস্তু নহে। তবে নাদের একটি বিশেষ অবস্থাকে স্ফোটরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

## আলোচনা

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি যে বাক্যপদীয়ের একটি শ্লোকে নাদ, ধ্বনি ও শব্দ এই তিনটি শব্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ।
আবৃত্তি-পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবতিষ্ঠতে॥"

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কোন শব্দের শ্রবণ বা উচ্চারণের দ্বারা যে বুদ্ধি পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে নাদসমূহদ্বারা শব্দের বীজ উপ্ত হয়। অতঃপর, অন্ত্য ধ্বনির সহিত অবস্থিত শব্দ তাদৃশ বুদ্ধিতে অবস্থান করে (নিজ অর্থের বোধ জন্মায়)।

টীকাকার পুণ্যরাজ, তাঁহার ব্যাখ্যায় ভর্ত্তৃহরির উল্লিখিত শ্লোকের

অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন (১০১)। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভর্তৃহরি উক্ত শ্লোকে ধ্বনির অংশ-বিশেষ অর্থে নাদ-শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন এবং নিরর্থক শব্দ অর্থে ধ্বনি ও সার্থক শব্দ অর্থে শব্দ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—

রাম, লতিকা, নবনীত প্রভৃতি এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়ে আমরা উক্ত শব্দগুলির এক একটি অংশ-ক্রমে তাহাদের উচ্চারণ করিয়া থাকি। সমগ্র 'রাম' শব্দটি কেহই এক সঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারে না। প্রথমে র, তারপর আ এবং অতঃপর ম্ এর উচ্চারণ হইয়া সর্ব্বশেষে অ এর উচ্চারণদ্বারা রাম শব্দটির উচ্চারণ পূর্ণতা লাভ করে। লতিকা, নবনীত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণও এই নিয়মেই হয়। এক্ষেত্রে র্, আ, ম্, অ প্রভৃতি এক একটি বর্ণের উচ্চারণ সমগ্র রাম শব্দের উচ্চারণের এক একটি অংশমাত্র। এই অংশগুলিই নাদ নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। পাতঞ্জল-যোগদর্শনের (বিভূতিপাদ, ১৭ সূত্র) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ব্যাস পদের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—"পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্"। এই 'নাদানুসংহার' শব্দটিকে বুঝাইবার সময় মহাত্মা হরিহরানন্দ আরণ্য অ, আ প্রভৃতি পদান্তর্গত ধ্বনিকেই নাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রাম শব্দের উচ্চারণে র্ এর সঙ্গে আ এর, ম্ এর সঙ্গে অ এর এবং রা এর সঙ্গে ম্ এর উচ্চারণের অব্যবহিত-পারম্পর্য্য-জনিত একটি সংযোগ থাকে। এই সংযোগও আবার প্রতি দুই বর্ণের ব্যবধানে অবস্থিত। উচ্চারণ সংযোগেই এই ব্যবধান তিরোহিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত উচ্চারণ-সংযোগগুলিও নাদপদবাচ্য।

এইরূপে কয়েকটি নাদের সংযোগে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও অর্থ প্রতিপাদন করে, কখনও বা করে না। অর্থ প্রতিপাদনহীন ধ্বনিটিকে আচার্য্য ধ্বনিশব্দদ্বারা এবং সার্থক ধ্বনিকে শব্দ শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

মনে করুন, একজন লোক গাড়ীতে বসিয়া নবনীত শব্দটি উচ্চারণ

(১০১ নাদৈধ্বর্নিভির্বীজং ব্যক্তপরিচ্ছেদানুগুণসংস্কারঃ ততশ্চান্ত্যো ধ্বনিঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সংস্কার-সহকৃতায়ামাবৃত্তিলাভ-প্রাপ্তযোগ্যতা-পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দস্বরূপং সন্নিবেশয়তি।

—পুণ্যরাজটীকা ; ব্রহ্মকাণ্ড, ৮৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

করিল। ঐ গাড়ীতে কতকগুলি দেশী এবং কতকগুলি বিদেশী লোক আছেন। দেশী লোকদের মধ্যেও কতকগুলি নিরেট মূর্খ। নবনীত একটি সংস্কৃত শব্দ, এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তৎসম শব্দ হিসাবে তাহার ব্যবহার আছে। কিন্তু বহু অশিক্ষিত দেশীয় লোকও এই শব্দটির অর্থ জানে না। বিদেশী লোকগণের তো জানিবার কথাই নয়। কেবলমাত্র শিক্ষিত ভারতীয় লোকেরাই এই শব্দটির অর্থ জানেন। সুতরাং গাড়ীতে উচ্চারিত নবনীত শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি লোকের মনে তাহার অর্থের জ্ঞান জন্মাইবে এবং বাকী কতকগুলি লোকের অন্তরে কোন জ্ঞানই জন্মাইবে না। আচার্য্যের মতে, যাহাদের অন্তরে উক্ত নবনীত শব্দ কোনরূপ অর্থবোধ জন্মাইবে না, তাহাদের কাছে উহা ধ্বনিমাত্র, এবং যাহাদের কাছে অর্থবোধ জন্মাইবে, তাহাদের কাছে উহা শব্দ। এই কারণেই আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি শ্লোকে বলিয়াছেন—পুনঃ পুনঃ শব্দবিশেষ শ্রবণের দ্বারা যাহাদের অন্তরে তাহার অর্থ উপলব্ধির সামর্থ্য জন্মিয়াছে, তাহাদের বুদ্ধিতেই (আবৃত্তি-পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ) শব্দ নিজ অর্থ স্থাপন করিয়া থাকে; অর্থাৎ তাদৃশ লোকই সার্থক শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মকাণ্ডের ৪৮ তম শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি স্পষ্টই বলিয়াছেন—নাদ ক্রমজাত; সুতরাং তাহাকে ধ্বনি বা শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা চলে না। আবার নাদগুলির সমষ্টিই ধ্বনি বা শব্দরূপে পরিণত হয়; অতএব নাদকে শব্দ বা ধ্বনি হইতে ভিন্নও বলা যায় না (নাদস্য ক্রমজাতত্বান্ন পূর্ব্বো নাপরশ্চ সঃ)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণের মতে ধ্বনি বা শব্দের অংশবিশেষই নাদ নামে পরিচিত।

'শব্দের স্বরূপ' প্রকরণে আমরা দেখাইয়াছি যে, অনেকের মতে সার্থক শব্দগুলিই শব্দপদবাচ্য এবং নিরর্থক শব্দগুলিই ধ্বনিনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাঁহার তন্ত্রালোক নামক গ্রন্থে 'শব্দ সমুদয় প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করে' এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কেবলমাত্র প্রাণিকর্ত্তৃক উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকেই তিনি নাদাত্মক শব্দ নামে অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন। যদিও প্রাণিগণের উচ্চারিত ধ্বনিগুলির মধ্যেও বহু নিরর্থক শব্দ দেখা যায়, তথাপি ইহাদের দ্বারা কোন না কোন ভাব ব্যক্ত হয় বলিয়া হয় তো আচার্য্য মনে করিয়াছেন। অথবা এমনও মনে করা যাইতে

পারে যে, প্রাণিগণের উচ্চারিত অধিকাংশ শব্দেরই সার্থকতা হেতু 'প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তি' এই ন্যায় অনুসারে সার্থক শব্দগুলিকে বুঝাইবার জন্যই আচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বলেন—আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনবরত যে অস্ফুট ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই নাদপদবাচ্য। দেহসৃষ্টির পূর্ব্বে এই নাদাত্মক শব্দ দেহে থাকে না; কিন্তু সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপে ইহা আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। দেহসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই সূক্ষ্ম শব্দতন্মাত্রের একাংশ দেহে আশ্রয়লাভ করতঃ অপেক্ষাকৃত স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে তখন আর দেহে এই নাদ অবস্থান করে না; এই কারণে অনেকে ইহাকেই প্রাণ নামে অভিহিত করিতে চাহেন। শিক্ষাসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে যে শব্দের বায়ু-স্বরূপতা স্বীকার করা হইয়াছে তাহাও সম্ভবতঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফল। অর্থাৎ, জীবদেহে যখন আর নাদ থাকে না, তখনই আমরা বলি, তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে—অতএব, এই নাদই প্রাণবায়ু; ইহাই শিক্ষাসূত্রকার প্রভৃতির অভিপ্রায়। ইহাদের এই যুক্তি যে ঠিক নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীবদেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহারই ফলে তাহার চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় বিকল হয়। হৃৎপিণ্ড ও দেহস্থ অন্যান্য যন্ত্রের যে ক্রিয়ার ফলে পূর্ব্বে নাদের উৎপত্তি হইত, ঐ সকল যন্ত্র বিকল হওয়ার ফলেই তখন আর নাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মহত্তত্ত্বকেই নাদ বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্ম বুদ্ধিতন্মাত্রে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। এই বুদ্ধিতন্মাত্রকেই সারদা-তিলক প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম বুদ্ধিতন্মাত্র যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তিনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। আমাদের অন্তরে যেমন বুদ্ধি আছে, পরমাত্মার অন্তরেও তেমনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতন্মাত্র বিরাজমান। আমাদের বুদ্ধি যেমন শব্দের শ্রবণ, উচ্চারণ প্রভৃতির হেতু হয়, উক্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্বও তেমনি সূক্ষ্ম শব্দতন্মাত্রের হেতু হইয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধি এবং পরমাত্মার অন্তঃস্থিত বুদ্ধিতন্মাত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বুদ্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; কিন্তু বুদ্ধিতন্মাত্রের উপর পরমাত্মার সর্ব্বপ্রকার

কর্তৃত্ব বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত, আমাদের অন্তঃস্থিত বুদ্ধিকে আমরা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু বুদ্ধিতন্মাত্রকে পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন।

এইরূপে সিদ্ধাচার্য্যগণ সূক্ষ্মতম শব্দতন্মাত্রকে এবং আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থিত শব্দের সূক্ষ্মরূপকে নাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রবণগোচর ধ্বনিগুলি নাদাত্মক সূক্ষ্ম শব্দেরই স্থূল প্রকাশ বলিয়া অভিধানে এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাহাদিগকেই আবার ধ্বনি বা শব্দ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

উপরে আমরা ভর্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণের যে সকল উক্তির আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীত হইতেছে যে, নাদ বলিতে উল্লিখিত আচার্য্যগণ শব্দের অংশবিশেষকেই বুঝিয়াছেন, অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণে প্রত্যেকটি বর্ণের যে পৃথক উচ্চারণ হয় তাহা, এবং দুই বর্ণের উচ্চারণের সংযোজক ধ্বনি-বিশেষ এই উভয়কেই তাঁহারা নাদ নামে গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিরর্থক শব্দকেই তাঁহারা ধ্বনি এবং সার্থক শব্দকেই শব্দ নামে অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন। আমরাও এই বিষয়ে উল্লিখিত আচার্য্য-গণের সহিত একমতই বটে। দেহাভ্যন্তরস্থ বা আকাশে স্থিত অব্যক্ত সূক্ষ্ম শব্দকে যাঁহারা নাদ নামে অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না; কারণ ঐরূপ সূক্ষ্ম শব্দের শ্রবণগোচরতা না থাকায় আমাদের বিবেচনায় তাহাকে নাদ বলা অযৌক্তিক।

শিবমস্তু